শনি

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

বাংলাবুক.অর্গ

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: অনুবাদকের

পুনর্মুদ্রণ: ২০১৬

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ইসমাইল আরমান

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুন ঢাকা ১০০০

২২৮

ucial

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

SHE
By: Sir Henry Rider Haggard
Bengali Translation
By: Neaz Morshed

অনুবাদ

শী

হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড

রূপান্তর ■ নিয়াজ মোরশেদ

সেবা প্রকাশনী
৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-3233-0

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

লেখক পরিচিতি

ইংল্যাণ্ডের নরফোকে জন্মগ্রহণ করেন স্যর হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড, ১৮৫৬ সালের ২২শে জুন তারিখে। দশ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন অষ্টম। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে ভাল কোনও স্কুল-কলেজে পড়ার সৌভাগ্য হয়নি তাঁর। মাত্র উনিশ বছর বয়সে নেটাল সরকারের চাকরি নিয়ে চলে যান দক্ষিণ আফ্রিকায়। ছ'বছর ওখানে কাটিয়ে আবার ফিরে আসেন ইংল্যাণ্ডে, আইনশাস্ত্রে লেখাপড়া শুরু করেন, পাশাপাশি মনোনিবেশ করেন লেখালেখিতে। ফলে পৃথিবী পায় ইতিহাসের সবচেয়ে বিখ্যাত লেখকদের একজনকে। একের পর এক চমকপ্রদ কাহিনি তিনি উপহার দিতে থাকেন পাঠকদের জন্য। চাকরিসূত্রে আফ্রিকা মহাদেশ সম্পর্কে প্রচুর জ্ঞান লাভ করেন হ্যাগার্ড, সেসব অভিজ্ঞতাই ছিল তাঁর বইগুলোর প্রধান উপজীব্য।

হ্যাগার্ডের বিখ্যাত বইগুলোর মধ্যে *কিং সলোমন'স্ মাইনস্*, *শী*, *রিটার্ন অভ শী*, *অ্যালান কোয়াটারমেইন*, এবং *দ্য পিপল অভ দ্য মিস্ট* অন্যতম। টগবগে উত্তেজনায় ভরা বইগুলো পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠার উপায় থাকে না। ভাইয়ের সঙ্গে বাজি ধরেছিলেন হ্যাগার্ড—*ট্রেজার আইল্যাণ্ড*-এর চেয়ে রোমাঞ্চকর বই লেখার ক্ষমতা তাঁর আছে, এবং *কিং সলোমন'স্ মাইনস্* লিখে সত্যিই প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সেটা। বইটি প্রকাশ পাবার পর রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে আছে *মণ্টেজুমা'স্ ডটার*, *মর্নিং স্টার*, *পার্ল মেইডেন*, *দ্য ব্রেদ্‌রেন*, *অ্যালান অ্যাণ্ড দ্য হোলি ফ্লাওয়ার*, ইত্যাদি।

নানা সময় নানা রকম পেশায় জড়িত ছিলেন হেনরি রাইডার হ্যাগার্ড, রাজনীতির প্রতি ছিল তাঁর বিশেষ ঝোঁক। ১৯১২ সালে স্যর উপাধি পান। ১৯২৫ সালের ১৪ মে পরলোকগমন করেন এই কালজয়ী সাহিত্যিক।

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

শুরুর আগে

প্রথমেই পাঠকদের একটা কথা বলে নিতে চাই, যে অবিশ্বাস্য ইতিহাস আপনাদের শোনাতে যাচ্ছি, তার লেখক আমি নই—আমি সম্পাদক মাত্র। কি করে আমি জানতে পারলাম এ ইতিহাস, তা যদি না বলি, খচ খচ করতে থাকবে আমার মনের ভেতর-বুঝি পাঠকরা প্রতারক ভাবলেন আমাকে।

কয়েক বছর আগের কথা। কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়--ধরুন কেমব্রিজে (আসল নামটা গোপন রাখছি) নিজের কিছু কাজ উপলক্ষে এক বন্ধুর বাসায় কিছুদিন থাকতে হয়েছিলো। সে সময় একদিন বন্ধুর সাথে হাঁটছি রাস্তা দিয়ে। এমন সময় দেখি, দুজন লোক হাত ধরাধরি করে আসছে। এরকম তো কত লোকই যায় আসে, কিন্তু ওদের কথা বিশেষ ভাবে আমার মনে গেঁথে গেল। কারণ ওদের একজন অসম্ভব সুপুরুষ। নির্দ্বিধায় বলতে পারি, জীবনে অমন সুপুরুষ আমি কখনো দেখিনি, সম্ভবত আর দেখবোও না। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া। খুনো মর্দা হরিণের মাঝে যেমন দেখা যায়, অনেকটা তেমন অদ্ভুত এক শক্তি আর মহিমার আভাস তার চোখে-মুখে। অপূর্ব সুন্দর চেহারা, নিখুঁত-নিভাঁজ মুখের ত্বক। হেঁটে যাওয়া এক মেয়েকে যখন টুপি খুলে অভিবাদন জানালো, দেখলাম, ছোট ছোট কোঁকড়া সোনালি চুলে ছাওয়া তার মাথা।

'কি চেহারা, দেখেছো!' বন্ধুকে বললাম আমি। সাক্ষাৎ অ্যাপোলোর মূর্তি, যেন প্রাণ পেয়ে নেমে এসেছে মর্তে!'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো বন্ধু। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে সুপুরুষ ব্যক্তি, স্বভাব চরিত্রও সেরকম। সবাই ওকে "গ্রীক দেবতা" বলে। আর অন্যজনের দিকে তাকাও, ও হলো ভিনসির (দেবতার নাম এটা) অভিভাবক—দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে পণ্ডিত, চলন্ত বিশ্বকোষ বলতে পারো, কিন্তু চেহারা দেখ--ঠিক উল্টো।'

সত্যিই তাই, ভিনসি যেমন সুপুরুষ এই লোকটা ঠিক তেমন কদাকার। বছর চল্লিশেক হবে বয়েস। ছোট ছোট পাগুলো বাইরের দিকে বাঁকানো ধনুকের মতো, চাপা বুক, শরীরের তুলনায় অস্বাভাবিক লম্বা হাত। কালো চুল লোকটার মাথায়, কুতকুতে চোখ, কপালেও চুল গজিয়েছে তার, আর গাল ভর্তি ঝাড়ি উঠে গেছে চুল পর্যন্ত। একমাত্র গরিলার সাথেই তুলনা করা যেতে পারে এ চেহারার। বন্ধুকে বললাম, 'লোকটার সাথে পরিচিত হতে চাই আমি।'

'ঠিক আছে,' জবাব দিলো বন্ধু, 'আমি চিনি ভিনসিকে, এক্ষুণি আলাপ করিয়ে

BanglaBook.org

দোবো তোমার সাথে।'

আলাপ হলো। কিছুদিন আগে আফ্রিকায় এক অভিযান শেষে ফিরেছি আমি। সে সম্পর্কে কথা বললাম কয়েক মিনিট। এমন সময় মোটাসোটা এক মহিলা এগিয়ে এলো আমাদের দিকে, সঙ্গে সুন্দরী একটা মেয়ে। সম্ভবত আগে থেকেই ওদের সাথে পরিচয় আছে ভিনসির, কারণ ওদের দেখেই ও এগিয়ে গেল আলাপ করার জন্যে। আর বয়স্ক লোকটার মুখের ভাব বদলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ইতিমধ্যে তার নাম জেনে ফেলেছি—হলি। আচমকা আলাপ থামিয়ে দিলো সে। আমার দিকে তাকিয়ে সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে হেঁটে চলে গেল ত্রস্ত ভঙ্গিতে। বন্ধু জানালো বেশির ভাগ মানুষ পাগলা কুকুরকে যতখানি ভয় পায় ঐ লোকটা মেয়ে মানুষকেও ঠিক ততখানিই ভয় পায়।

যা হোক, সেদিন রাতেই আমি কেম্‌ব্রিজ থেকে চলে এলাম। এবং ঐ-ই আমার শেষ দেখা ভিনসি এবং হলির সাথে। প্রায় ভুলতে বসেছিলাম ওদের কথা, এমন সময় মাসখানেক আগে একটা চিঠি আর দুটো প্যাকেট এসে হাজির আমার ঠিকানায়। চিঠিটা খুলে দেখলাম, লেখকের নাম 'হোরেস হলি'। তাতে লেখাঃ

--কলেজ, কেম্‌ব্রিজ, মে, ১৮—

প্রীতিভাজনেষু,

'এ চিঠি পেয়ে সম্ভবত আপনি আশ্চর্য হবেন। এত কম সময়ের জন্যে আমাদের আলাপ হয়েছিলো যে, আমার কথা আপনার মনে না থাকাই স্বাভাবিক। সুতরাং আগে পরিচয়টা দিয়ে নেয়াই বোধহয় ভালো। বেশ ক'বছর আগে আমি এবং আমার পালিত পুত্র লিও ভিনসির সাথে আপনার আলাপ হয়েছিল, কেম্‌ব্রিজের এক পথে। এবার আশা করি চিনতে পেরেছেন।

'ভূমিকা দীর্ঘ না করে কাজের কথায় আসি। সম্প্রতি মধ্য-আফ্রিকায় এক অভিযানের বর্ণনা দিয়ে লেখা আপনার একটা বই পড়লাম। খুব কৌতূহল নিয়েই পড়লাম। আমার ধারণা, ওতে আপনি যা যা বলেছেন তা আংশিকভাবে সত্যি আর আংশিক আপনি কল্পনার রং চড়িয়ে রচনা করেছেন। যা হোক, আপনার ঐ বইটা পড়ার পরই আমার মাথায় বুদ্ধিটা আসে। আমার অভিজ্ঞতা আমি লিখে ফেলার সিদ্ধান্ত নেই (এই চিঠির সাথে পাণ্ডুলিপিটা পাঠাচ্ছি আপনার কাছে)। আমি এবং আমার পালিত পুত্র লিও ভিনসি সম্প্রতি এক অভিযানে আফ্রিকা গিয়েছিলাম। ঐ সময় আমাদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা আপনার বইয়ের বর্ণনার চেয়ে অনেক অনেক বেশি চমকপ্রদ। সত্যি কথা বলতে কি, জিনিসটা আপনার কাছে পাঠাতে আমি সঙ্কোচ বোধ করছি—পাছে আপনি অবিশ্বাস করেন আমার গল্পটা। এই ভয়েই আমি—বলা ভালো আমার,

BanglaBook.org

সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমাদের জীবনকালে আমাদের এ অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করবো না। কিন্তু কদিন আগে এমন একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যে, আমার মত না বদলে পারলাম না। পাণ্ডুলিপিটা পড়া শেষ হলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, আবার আমরা রওনা হচ্ছি। এবার মধ্য এশিয়ার দিকে। এবার হয়তো আরো বেশি দিন দেশের বাইরে থাকতে হবে, হয়তো কোনোদিনই ফিরে আসা হবে না। সুতরাং যে অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করেছি দুনিয়ার মানুষকে তার ভাগ দেবো না কেন? জানি, মানুষ অবিশ্বাস করতে পারে, গালগল্প মনে করতে পারে, তবু ঘটনাটা প্রকাশ করা দায়িত্ব মনে হয়েছে আমাদের কাছে। লিও আর আমি অনেক আলোচনার পর পাণ্ডুলিপিটা আপনার কাছেই পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনার হাতে পুরো কর্তৃত্ব থাকছে, যোগ্য মনে হলে এটা প্রকাশ করবেন, অযোগ্য মনে হলে করবেন না। কেবল একটা অনুরোধ, আমাদের আসল নামগুলো গোপন রাখবেন।

'বিশেষ আর কি? সত্যিই বলছি, যা যা ঘটেছিলো শুধুমাত্র তা-ই লিখেছি পাণ্ডুলিপিতে, কোনো ঘটনাই বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জিত করিনি। "সে" সম্পর্কে বলতে পারি, যা লিখেছি তার চেয়ে বেশি কিছু আমরা জানতে পারিনি। কে সে? কোর-এর গুহায় কোত্থেকে, কিভাবে সে এসেছিলো, কি তার ধর্ম? কিছুই আমরা জানতে পারিনি, সম্ভবত পারবোও না কোনোদিন।

'কাজটা নেবেন আপনি? আপনার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। বিনিময়ে, আমাদের ধারণা, চমকপ্রদ এক ইতিহাস পৃথিবীর সামনে উপস্থিত করার গৌরব আপনি অর্জন করবেন। দয়া করে পাণ্ডুলিপিটা পড়বেন, এবং আপনার সিদ্ধান্ত জানাবেন।

'বিশ্বাস করুন, আপনার একান্ত বিশ্বস্ত,

'এল. হোরেস হলি*।'

'পুনশ্চঃ পাণ্ডুলিপিটা প্রকাশ করার পর যদি মুনাফা হয়, সে টাকা দিয়ে আপনার যা ইচ্ছে তাই করতে পারবেন। আর যদি ক্ষতি হয়, আমার আইনজ্ঞ—মেসার্স জিওফ্রে অ্যাণ্ড জর্ডান-এর প্রতি নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছি, ওরা পুষিয়ে দেবে। যতদিন না আমরা দাবি করছি ততদিন পোড়ামাটির ফলক, গোলমোহর এবং পার্চমেন্টগুলো আপনার কাছেই থাকবে।

-এল. এইচ. এইচ.।'

চিঠিটা পড়ে বেশ অবাক হলাম। কিন্তু পাণ্ডুলিপিটা যখন শেষ করলাম তখন শুধু অবাক বললে ভুল হবে, রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার ধারণা, পাঠকরাও

* লেখকের অনুরোধে আসল নাম বদলে দেয়া হয়েছে।—সম্পাদক।

BanglaBook.org

হবেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওটা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিলাম, এবং সেকথা লিখে জানালাম মিস্টার হলিকে। জবাব এলো এক সপ্তাহ পর। তবে মিস্টার হলির কাছ থেকে নয়, তাঁর আইনজ্ঞদের কাছ থেকে। তাঁরা জানালেন, তাঁদের মক্কেল এবং মিস্টার লিও ভিনসি ইতিমধ্যে রওনা হয়ে গেছেন তিব্বতের পথে।

এ-ই আমার বক্তব্য, বাকিটা পাঠকরা বিচার করবেন। গৌণ দু-একটা বিষয়ে সামান্য পরিবর্তন ছাড়া পাণ্ডুলিপিটার সম্পূর্ণই তুলে দিলাম আপনাদের জন্যে। আয়শা এবং কোর-এর গুহাগুলোর রহস্য উন্মোচনের দায়িত্ব থাকলো আপনাদেরই ওপর।

--সম্পাদক।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

এক

প্রত্যেকেরই জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা আমরা কোনো দিনই ভুলতে পারি না। তেমন একটা ঘটনার কথাই আমি বলতে যাচ্ছি। আমার মনের পর্দায় এখনো এমন উজ্জ্বল হয়ে আছে, মনে হয় মাত্র কালই বুঝি ঘটেছিলো ঘটনাটা।

প্রায় বিশ বছর আগের এক রাত। আমি, লুডউইগ হোরেস হলি, আমার কেম্‌ব্রিজের বাসায় বসে জটিল একটা গাণিতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছি। সেই সন্ধ্যায় শুরু করেছি, এখন মাঝরাত, কিন্তু কিছুতেই বের করতে পারছি না সমাধানটা। শেষমেষ বিরক্ত হয়ে বই খাতা সব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়লাম। ম্যান্টেলপিসের ওপর থেকে পাইপটা নিয়ে তামাক ভরলাম। ম্যান্টেলপিসের ওপর মোমবাতি জ্বলছে, পেছনে লম্বা সরু একটা আয়না। মোমবাতির আগুনে পাইপ ধরাতে গিয়ে চোখ পড়লো আয়নায়। নিজের চেহারাটা দেখতে পেলাম পরিষ্কার।

'জীবনে যদি কিছু করতে হয়,' নিজেকে শোনানোর জন্যেই যেন বললাম আমি। 'মাথার ভেতরটা দিয়েই করতে হবে। বাইরেটা দিয়ে যে কিছু সম্ভব নয় তা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো?'

অনেকের কাছেই হয়তো দুর্বোধ্য লাগবে, হঠাৎ এমন একটা মন্তব্য কেন? আমার চেহারার কথা বলছি। দেখতে যেমনই হোক, বাইশ বছর বয়েসে বেশির ভাগ লোকের চেহারায় আর কিছু না হোক যৌবনের দীপ্তি অন্তত থাকে। কিন্তু আমার বেলায় এ জিনিসটাও অনুপস্থিত। আমাকে কুৎসিত বললেও কম বলা হয়—বেঁটে, মোটা, প্রায় বিকৃত চাপা বুক; লম্বা মোটা মোটা দুটো হাত; চোখগুলো কুতকুতে, ধূসর; বিশ্রী মোটা এক জোড়া ভুরু।

প্রায় সিকি শতাব্দী আগে এমন ছিলো আমার চেহারা, দুঃখের বিষয় সামান্য কিছু পরিবর্তন ছাড়া এখনও তেমনই আছে। চেহারার দিক দিয়ে প্রকৃতি আমাকে বঞ্চিত করেছে সন্দেহ নেই, তবে পুষিয়ে দিয়েছে অন্য দিক দিয়ে। লোহার মতো শক্ত আমার শরীর, অস্বাভাবিক শক্তি পেশীগুলোয়। মগজের শক্তিটাও, বলা যায়, একটু অসাধারণ। ফলে আমার কোনো বন্ধু নেই—না একজনও আছে। কোনো মেয়ে স্বেচ্ছায় কখনো আমার ছায়া মাড়ায় না। এই গত সপ্তাহেই শুনেছি, আড়ালে একটা মেয়ে আমাকে বলেছিলো, 'রাক্ষস'। আমি যে শুনে ফেলেছি সে টের পায়নি। পেলে হয়তো বলতো না।

BanglaBook.org

একবার হঠাৎ করেই আমার সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলো একটা মেয়ে। ব্যাপারটা টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি পারলে জান দিয়ে ফেলি ওর জন্যে। এমন সময় আমার টাকার উৎসটা গেল বন্ধ হয়ে। মেয়েটারও আর চেহারা দেখি না। অনেকদিন পর ওকে খুঁজে বের করে কাকুতি মিনতি করলাম। জীবনে ঐ প্রথম এবং ঐ-শেষ কোনো মেয়েকে কাকুতি মিনতি করা। বললাম যেন আমাকে প্রত্যাখ্যান না করে। কিছুই বললো না সে, আয়নার সামনে নিয়ে গেল আমাকে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললো, 'দেখ, আমি যদি বিউটি হই, তুমি কে?'

তখন আমার বয়স মাত্র বিশ।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের কুৎসিত মুখটা দেখছি আর এই সব আবোল তাবোল ভাবছি, হঠাৎ একটা শব্দ হলো দরজায়। বাস্তবে ফিরে এলাম আমি। কান খাড়া করলাম। আবার শব্দ। কেউ দরজা ধাক্কাচ্ছে। রাত প্রায় বারোটা। এত রাতে কে আসতে পারে? কলেজে একজনই আমার বন্ধু, সম্ভবত পৃথিবীতেও—ও-ই কি?

একটা কাশির শব্দ শোনা গেল বাইরে। তাড়াতাড়ি এগোলাম দরজা খোলার জন্যে—কাশিটা পরিচিত।

লম্বা এক লোক ত্রস্ত পায়ে ঢুকলো ঘরে। বছর তিরিশেক হবে বয়েস, অসম্ভব সুন্দর পুরুষালি চেহারা। ডান হাতে ভারি একটা লোহার বাক্স। ওজনে নুয়ে পড়েছে সে। সিন্দুকের মত বাক্সটা কোনো রকমে টেবিলের ওপর রেখেই কাশতে শুরু করলো লোকটা। প্রচণ্ড কাশি। কাশতে কাশতে লাল হয়ে গেল তার মুখ। অবশেষে একটা চেয়ারে বসে থু করে একদলা রক্ত ফেললো মেঝেতে।

একটা গেলাসে খানিকটা হুইস্কি ঢেলে এগিয়ে দিলাম। ওটুকু খেয়ে একটু যেন ভালো বোধ করতে লাগলো সে। তারপর চোখ-মুখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো, 'এই ঠাণ্ডায় এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন? জানো ঠাণ্ডায় শ্বাস নেয়া আর মরে যাওয়া একই কথা আমার জন্যে!'

'আমি কি করে জানবো তুমি এসেছো?' বললাম আমি। 'এত রাতে কেউ আসে কারো কাছে?'

'হ্যাঁ, সম্ভবত তোমার কাছে এ-ই আমার শেষ আসা,' অনেক কষ্টে একটু হাসার চেষ্টা করলো সে। 'আমি শেষ, হলি, আমি শেষ। মনে হয় না কালকের দিন পর্যন্ত টিকবো।'

'পাগল! বসো তো আমি ডাক্তার ডেকে আনছি।'

হাত নেড়ে আমাকে নিষেধ করলো সে। 'আমি বুঝতে পারছি আমার অবস্থা।

BanglaBook.org

ডাক্তার ডেকে লাভ হবে না। আমি ডাক্তারি পড়েছি, ভালোই জানি, কোনো ডাক্তারই আর কিছু করতে পারবে না। আমার শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। তার চেয়ে যা বলছি মন দিয়ে শোনো—হয়তো দ্বিতীয়বার শোনার জন্যে জীবিত পাবে না আমাকে। দু'বছর ধরে আমরা বন্ধু। বলো তো, আমার সম্পর্কে কতটুকু জানো তুমি?'

'জানিঃ তুমি ধনী, সাধারণত যে বয়েসে সবাই কলেজ থেকে বেরিয়ে যায় সেই বয়েসে তুমি কলেজে ভর্তি হয়েছো। তুমি বিবাহিত, তোমার স্ত্রী মারা গেছেন তা-ও জানি। আর জানি; তুমি আমার সবচেয়ে ভালো এবং সম্ভবত একমাত্র বন্ধু।'

'আমার একটা ছেলে আছে তা জানো?'

'না তো!'

'পাঁচ বছর বয়েস। ওর মায়ের বিনিময়ে ওকে পেয়েছি, সেজন্যে কোনোদিনই ওর দিকে তাকানোর ইচ্ছে হয়নি আমার। হলি, ছেলেটার ভার আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই।'

চেয়ার ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম আমি। 'আমাকে!'

'হ্যাঁ, তোমাকে। গত দু'বছর ধরে খামোকা আমি তোমার সঙ্গে মিশেছি ভাবো? কিছুদিন ধরেই বুঝতে পারছিলাম, আমার দিন শেষ। তখন থেকে খোঁজ করতে থাকি এমন একটা লোক যার জিম্মায় রেখে যেতে পারবো আমার ছেলেকে আর এটাকে,' লোহার সিন্দুকটায় টোকা দিলো সে। 'তুমিই সেই লোক, হলি। অনেক ঝড়জল সওয়া প্রাচীন বৃক্ষের মতো শক্ত তুমি, জানি পারবে তুমি ছেলেটাকে মানুষ করে তুলতে। শোনো, আমার মৃত্যুর পর, দুনিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন বংশগুলোর একটার একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে বেঁচে রইবে ছেলেটা।

'আমার পঁয়ষট্টি কি ছেষট্টিতম পূর্বপুরুষ ছিলেন দেবতা আইসিসের মিসরীয় পুরোহিতদের একজন। তুমি হয়তো হেসে উড়িয়ে দেবে, কিন্তু আমি বলছি একদিন নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হবে একথা। তাঁর নাম ক্যালিক্রেটিস। গ্রিসীয় বংশোদ্ভূত হয়েও মিসরীয়দের পুরোহিত হয়েছিলেন তিনি। ঊনত্রিশতম রাজবংশের এক মেনডেসিয়ান ফারাও হাক হোর গ্রীক ভাড়াটে সৈন্যদের নিয়ে এক বাহিনী গঠন করেছিলেন। এই বাহিনীরই সৈনিক ছিলেন তাঁর বাবা। হেরোডোটাস যে ক্যালিক্রেটিসের কথা উল্লেখ করেছেন, আমার বিশ্বাস তিনি আমার পূর্বপুরুষ ক্যালিক্রেটিসের দাদা অথবা পরদাদা। ফারাও পরিবারের এক রাজকন্যা এই পুরোহিত ক্যালিক্রেটিসের প্রেমে পড়েন। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৯ অব্দের দিকে, ফারাওদের চূড়ান্ত পতনের সময় মিসর থেকে পালিয়ে গেলেন ক্যালিক্রেটিস। কৌমার্যের ব্রত ভঙ্গ করে সঙ্গে নিয়ে গেলেন সেই রাজকন্যাকে।

BanglaBook.org

জলপথে পালাচ্ছিলেন তাঁরা। পথে জাহাজডুবি হলো। কোনো মতে তীরে উঠলেন দুজন। দলের বাকিরা মারা পড়ে।—জায়গাটা আফ্রিকা উপকূলে, সম্ভবত আজকের ডেলাগোয়া উপসাগরের উত্তরে কোথাও।

'প্রচণ্ড কষ্ট সহ্য করে তাঁরা জীবন ধারণ করতে লাগলেন সেখানে। অবশেষে সেখানকার এক জংলী জাতির দোর্দণ্ড প্রতাপ রানীর অনুগ্রহ লাভ করলেন। জাতিটা জংলী হলেও তাদের রানী অদ্ভুত সুন্দরী এক শ্বেতাঙ্গিনী। কোনো কারণে—কারণটা আমি জানতে পারিনি, বেঁচে থাকলে এই বাক্সের জিনিসগুলো থেকে তোমরা হয়তো জানবে—সেই শ্বেতাঙ্গিনী রানী খুন করে আমার পূর্বপুরুষ ক্যালিক্রেটিসকে। তাঁর স্ত্রী, কিভাবে জানি না, শিশু পুত্রকে নিয়ে পালিয়ে চলে গেলেন এথেন্সে। ছেলের নাম রাখলেন টিসিসথেনেস, অর্থাৎ শক্তিমান প্রতিশোধগ্রহণকারী।

'পাঁচশো বা তার কিছু বেশি বছর পর পরিবারটা চলে আসে রোমে—কি পরিস্থিতিতে, কেন, কিছুই জানা যায়নি। এখানেও ওঁরা পাঁচ শতাব্দী বা তার কিছু বেশি সময় বসবাস করেন। তারপর ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে শার্লেমেন যখন লোম্বার্ডি দখল করলেন, ওঁরা চলে এলেন লোম্বার্ডিতে। পরিবারের কর্তা খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন সম্রাটের সাথে। অবশেষে তাঁরা আলপ্‌স পর্বতমালা পেরিয়ে ব্রিটানিতে এসে স্থিত হলেন। আট পুরুষ পরে তাঁর (পরিবারকর্তার) এক বংশধর চলে গেলেন ইংল্যাণ্ডে। এডওয়ার্ড দ্য কনফেসরের আমল সেটা। উইলিয়াম দ্য কনকোয়ারের সময় খুবই ক্ষমতাশালী আর সম্মানিত লোক হয়ে উঠলেন তিনি (সেই বংশধর)।

'সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত পূর্বপুরুষদের পরিচয় নিখুঁতভাবে জানি আমি। যাহোক, উইলিয়াম দ্য কনকোয়ারারের আমলে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছিলেন যিনি, তাঁর বংশধরদের কেউই খুব একটা নাম করতে পারেননি। তাই বলে ভেবো না, সবাই খুব নিচু ধরনের পেশা বেছে নিয়েছিলেন। কখনো তাঁরা সৈনিক হিসেবে কাজ করেছেন, কখনো সওদাগর—মোট কথা মাঝামাঝি একটা অবস্থানে থেকেছেন সব সময়। দ্বিতীয় চার্লসের সময় থেকে এই শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত শুধু সওদাগরীই ছিলো তাঁদের পেশা।

'১৭৯০-এর দিকে আমার দাদা মদ চোলাইয়ের ব্যবসা করে বেশ মোটা অঙ্কের সম্পদের মালিক হয়ে যান। ১৮২১ সালে তিনি মারা গেলে আমার বাবা উত্তরাধিকারসূত্রে মালিক হলেন তাঁর সম্পত্তির। ঐ বিশাল সম্পত্তির বেশির ভাগই বাজে খরচ করে উড়িয়ে দিলেন বাবা। দশ বছর আগে মারা গেছেন তিনি। আমার জন্যে রেখে গেছেন বছরে দু'হাজার পাউণ্ড আয়ের সম্পত্তি।

হাতে নগদ টাকা আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি বেরিয়ে পড়লাম অভিযানে। এটার

সঙ্গে সম্পর্ক ছিলো সেই অভিযানের,' লোহার বাক্সটার দিকে ইশারা করলো সে। 'শোচনীয়ভাবে শেষ হলো আমার সেই অভিযান। কোনো মতে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলাম আমি। ফেরার পথে দক্ষিণ ইউরোপ ভ্রমণ করলাম, শেষে পৌঁছুলাম এথেন্সে। ওখানে পরিচয় হলো আমার প্রিয়তমা স্ত্রীর সাথে। আমার গ্রীক পূর্বপুরুষদের ঢংয়ে যদি নাম দেয়া হতো, তাহলে হয়তো ওর নাম হতো "অপরূপা"। ওকে বিয়ে করলাম আমি। এক বছর পর আমার এক ছেলেকে জন্ম দিতে গিয়ে মারা গেল ও।'

কিছুক্ষণের জন্যে থামলো সে। মাথাটা ঝুলে পড়লো হাতের ওপর। একটু পরে আবার শুরু করলো—

'বিয়ে আমাকে সরিয়ে দিলো আমার কাজ থেকে। এখন ইচ্ছে করলেও আর তাতে ঢুকতে পারবো না আমি। আমার সময় শেষ, হলি—আমার সময় শেষ! আমি যে দায়িত্ব তোমাকে দিতে যাচ্ছি তা যদি নাও, একদিন সব জানতে পারবে তুমি।

'স্ত্রীর মৃত্যুর পর মন শক্ত করে আরেকবার চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত আমি নিয়েছিলাম। কিন্তু আমার প্রথম অভিযানের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলাম, পুব দেশীয় কথ্য ভাষা, বিশেষ করে আরবী বলায় দক্ষ না হলে লাভ হবে না। এ ভাষা শেখার জন্যেই এখানে এসেছিলাম আমি। এখানে আসার কিছু দিনের ভেতরেই আমার এই রোগটা দেখা দেয়। এখন তো শেষ অবস্থায় এসে পড়েছি।' কথাটার ওপর জোর দেয়ার জন্যেই যেন তীব্র কাশির দমকে কুঁকড়ে গেল সে।

আমি আর একটু হুইস্কি দিলাম তাকে। খেয়ে আবার একটু সুস্থ বোধ করতে লাগলো সে। বলে চললো—

'লিও মানে আমার ছেলেকে কখনো দেখিনি আমি। জন্মের পর যখন ছোট্ট এতটুকুন ছিল তখন দেখেছি, তারপর আর না। দেখার ইচ্ছেই হয়নি কখনো। তবে শুনেছি, এখন নাকি খুব চটপটে হয়েছে, সুন্দরও।' পকেট থেকে আমার নাম লেখা একটা চিঠি বের করলো সে। আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'এতে আমি লিখে দিয়েছি, কি পাঠক্রম অনুসরণ করবে ছেলেটাকে লেখাপড়া করানোর সময়। একটু অদ্ভুত মনে হবে, কিন্তু উপায় নেই, ওভাবেই গড়ে উঠতে হবে ওকে। সে-কারণেই অপরিচিত কারো ওপর ওর ভার দেয়া যাবে না। হলি, তুমি নেবে এই দায়িত্ব?'

'কি দায়িত্ব, সেটা আগে জানতে হবে আমাকে,' বললাম আমি।

'আমার ছেলে লিওর দায়িত্ব। ওর বয়স পঁচিশ না হওয়া পর্যন্ত তোমার কাছে থাকবে—একটা কথা মনে রাখবে, কখনো স্কুলে পাঠাবে না ওকে। যেদিন ওর বয়স পঁচিশ পূর্ণ হবে সেদিনই শেষ হবে তোমার অভিভাবকত্ব। তারপর এই চাবিগুলো

BanglaBook.org

দিয়ে,' টেবিলের ওপর রাখলো সে চাবি ক'টা। 'ঐ লোহার বাক্সটা খুলবে। ওকে পড়তে দেবে ভেতরের জিনিসগুলো। পড়া শেষ হলে ওকে জিজ্ঞেস করবে, রহস্য অনুসন্ধানে যেতে চায় কিনা। কোনোরকম বাধ্যবাধকতা নেই; ওর ইচ্ছে হলে যাবে, না হলে যাবে না।

'এবার শোনো শর্তগুলো। আমার বর্তমান আয় বছরে দু'হাজার দুশো। যদি আমার ছেলের অভিভাবকত্ব নাও তাহলে আমার উইল অনুযায়ী ওর অর্ধেকটা তুমি পেতে থাকবে সারা জীবন। বছরে এক হাজার তোমার পারিশ্রমিক—আগেই বলেছি ওকে স্কুলে পাঠাতে পারবে না, সুতরাং ছেলেটাকে মানুষ করতে হলে জীবন দিয়ে খাটতে হবে তোমাকে। আর একশো হচ্ছে ছেলেটার ভরণপোষণের খরচ। বাকি অর্ধেক লিওর বয়স পঁচিশ না হওয়া পর্যন্ত জমা হতে থাকবে। যে রহস্যের কথা বললাম তা সমাধানের জন্যে যদি ও বেরোতে চায়, তখন যেন মোটা অঙ্কের একটা টাকা থাকে হাতে।'

'ধরো দায়িত্ব শেষ হওয়ার আগেই আমি মারা গেলাম, তখন?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'চ্যান্সারি ওর অভিভাবক হবে। তোমাকে শুধু একটা উইল করে যেতে হবে। যেন এই বাক্সটার মালিক হয় লিও। শোনো, হলি, আমাকে ফিরিয়ে দিও না। বিশ্বাস করো, তুমি ছাড়া আর কেউ পারবে না এ দায়িত্ব নিতে।'

আগ্রহী চোখে আমার দিকে তাকালো সে। আমি এখনো ইতস্তত করছি, দায়িত্বটা এত অদ্ভুত!

'আমার মুখ চেয়ে দায়িত্বটা নাও, হলি। আমাদের বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করো, তাছাড়া, আমার শরীরের যা অবস্থা আর কোনো ব্যবস্থা করার সময় আমি পাবো না।'

'ঠিক আছে,' অবশেষে আমি বললাম, 'আমি করবো, তবে এতে যা লিখেছো তা যদি আমার মনঃপূত হয় তবেই।' একটু আগে যে খামটা ও দিয়েছে সেটা দেখলাম।

'আহ্, বাঁচালে, হলি। কি বলে তোমাকে ধন্যবাদ দেবো, জানি না। নিশ্চিন্ত থাকো, তোমার মনঃপূত হবে না এমন কোনো কথাই ওতে নেই। কথা দাও, বাবার স্নেহে মানুষ করবে ছেলেটাকে, আর ঐ চিঠিতে আমি যেভাবে যেভাবে বলেছি সেভাবে ওকে শিক্ষা দেবে।'

'বেশ, কথা দিলাম।'

'এবার তাহলে যাই আমি, হলি, বাক্সটা রইলো এখানে। খামের ভেতর পাবে উইল। ছেলেটাকে আনিয়ে নিও। উইলটা দেখালেই ওরা দিয়ে দেবে তোমার কাছে। তোমার সততা সম্পর্কে আমার কোনো সন্দেহ নেই, হলি, তবু বলছি, যদি

BanglaBook.org

বিশ্বাসঘাতকতা করো, আমার আত্মা সারাজীবন তোমাকে তাড়া করে ফিরবে।'

কিছু বললাম না আমি। —আসলে বলতে পারলাম না।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সে। মোমবাতিটা তুলে নিয়ে আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকালো। মুখটা এক কালে সুন্দর ছিলো, কিন্তু অসুখ সেটাকে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে।

'পোকার খাদ্য,' বললো সে। 'ভাবতে পারো, কয়েক ঘন্টার ভেতর ঠাণ্ডা শক্ত হয়ে যাবে আমার এই শরীর—বেড়ানো শেষ, খেল খতম। বেঁচে থাকার যে যন্ত্রণা তার তুলনায় কতটুকু দাম জীবনের? অন্তত আমার ক্ষেত্রে তো শূন্য! আশা করি আমার ছেলের বেলায় তা হবে না, যদি ওর সাহস আর বিশ্বাস থাকে। বিদায় বন্ধু!' বলেই আচমকা আমাকে জড়িয়ে ধরলো সে। কপালে একটা চুমু খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো যাওয়ার জন্যে।

'শোনো, ভিনসি, তুমি যদি এতই অসুস্থ, একটু বসো, আমি ডাক্তার নিয়ে আসি।'

'না-না, হলি। ডাক্তার ডাকার কোনো দরকার নেই। ডাক্তার আমার মরণ ঠেকাতে পারবে না। বিষ খাওয়া ইঁদুরের মতো আমি মরবো। আমি চাই না, সে সময় কেউ থাকুক আমার কাছে।'

'না-না, ভিনসি, আমি বিশ্বাস করি না···।'

হাসলো সে। একটা মাত্র কথা উচ্চারণ করলো, 'মনে রেখো তোমার দায়িত্ব!' তারপর চলে গেল।

আর আমি, আস্তে আস্তে বসে পড়লাম একটা চেয়ারে—ভিনসিকে ঠেকানোর কথা মনেও পড়লো না। বসে বসে চোখ ডলতে লাগলাম, যেন নিশ্চিত হতে চাইছি, সত্যিই জেগে আছি না স্বপ্ন দেখছি। স্বপ্ন যে দেখছি না তা বুঝতে অসুবিধা হলো না। তখন মনে হলো, নিশ্চয়ই মাতাল অবস্থায় ছিলো ভিনসি। ও যা বলে গেল বা করে গেল, কোনো স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে তা বলা বা করা অসম্ভব। অনেকগুলো প্রশ্ন জাগলো আমার মনে, এক এক করে সেগুলোর উত্তর খুঁজতে লাগলাম। পাঁচ বছর বয়েসের একটা ছেলে আছে অথচ তাকে বাচ্চা বয়েসে ছাড়া কখনো দেখেনি, সম্ভব? না। এত নিখুঁত ভাবে কেউ তার মৃত্যুর কথা আগে থাকতে বলে দিতে পারে? না। খ্রীষ্ট-জন্মের তিনশো বছর আগের পূর্বপুরুষের পরিচয় জানা বা এমন আচমকা একমাত্র ছেলের অভিভাবকত্ব আর নিজের সম্পত্তির অর্ধেক কোনো কলেজ বন্ধুকে দিয়ে দেয়া সম্ভব কারো পক্ষে? অবশ্যই না। তাহলে? হয় পাগল হয়ে গেছে, নয়তো মাতাল অবস্থায় ছিলো ভিনসি। তা-ই যদি

BanglaBook.org

হয়, লোহার বাক্সটায় কি আছে?

মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না। পাগল হওয়ার অবস্থা আমারও। শেষে বিরক্ত হয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে।

ঘুম ভাঙলো সকাল আটটায়। শুনলাম কে যেন ডাকছে আমার নাম ধরে। উঠে গিয়ে দেখি, জন। কলেজে নানা কাজে আমাকে আর ভিনসিকে সাহায্য করে ছেলেটা।

'কি ব্যাপার, জন, কি হয়েছে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'এমন চেচাচ্ছো, ভূত দেখেছো নাকি?'

'আরো খারাপ,স্যার,' জবাব দিলো সে। 'লাশ! রোজকার মতো আজও মিস্টার ভিনসিকে ডাকতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, ঠাণ্ডা, শক্ত, মরে পড়ে আছেন!'

দুই

হতভাগ্য ভিনসির মৃত্যুতে বেশ একটা আলোড়ন হলো কলেজে। তবে তার মৃত্যুর কারণ অনুসন্ধানের কোনো তোড়জোড় হলো না। কারণ সবাই জানতো, ও অসুস্থ, তাছাড়া ডাক্তারও রায় দিলেন, মৃত্যুটা স্বাভাবিক, আগের দিন রাতে ওর সাথে আমার যে আলাপ হয়েছিলো, সে সম্পর্কে আমি কোনো উচ্চবাচ্য করলাম না। শুধু বললাম, প্রায়ই যেমন আসতো সেদিনও তেমন ও এসেছিলো আমার কাছে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন এক আইনজীবী এলেন লণ্ডন থেকে। ভিনসির শব যাত্রায় অংশ নিলেন ভদ্রলোক। তারপর চলে গেলেন। যাওয়ার আগে ওর ঘর থেকে নিয়ে গেলেন উত্তরাধিকার সংক্রান্ত কাগজগুলো। নিশ্চয়ই ভিনসি উকিলকে আগেই জানিয়েছিলো কোথায় পাওয়া যাবে ওগুলো। লোহার বাক্সটা রইলো আমার কাছে।

পরের এক সপ্তাহ আর এ নিয়ে ভাবনা-চিন্তার সুযোগ পেলাম না আমি। ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হলো ফেলোশীপের পরীক্ষা নিয়ে। অবশেষে শেষ হলো পরীক্ষা। ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফিরে ডুবে গেলাম একটা আরাম কেদারায়। মনটা বেশ খুশি খুশি, ভালোই হয়েছে পরীক্ষা।

আর সব চিন্তা বিদায় হয়েছে। মস্তিষ্কটা ফাঁকা। এই সুযোগে আবার গুঁড়ি মেরে এগিয়ে এলো ভিনসি, তার ছেলে, তার সম্পত্তি, তার রহস্যময় আচরণ। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভেবে দেখলাম আবার। মনে হলো, একটাই সিদ্ধান্ত টানা যায়, আত্মহত্যা করেছে ভিনসি। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের সমাধান আমার জানা নেই। লোহার সিন্দুকটা খুলতে পারলে হয়তো জানা যেতো। কিন্তু তা সম্ভব নয়। ভিনসির কাছে প্রতিজ্ঞা

BanglaBook.org

করেছি--ওর ছেলের বয়স পঁচিশ হওয়ার আগে খোলা হবে না ওটা।

বসে বসে ভাবছি এসব, এমন সময় দরজায় শব্দ। বড়, পেট মোটা, নীল একটা খাম দিয়ে গেল ডাক-পিয়ন। দেখেই বুঝলাম উকিলের চিঠি, আর নিঃসন্দেহে ভিনসির দেয়া দায়িত্বের সাথে এর সম্পর্ক আছে। চিঠিটা পড়লাম। ভিনসি তার সম্পত্তি আর ছেলের দায়িত্ব নেয়া সম্পর্কে যা যা বলেছিলো প্রায় তা-ই বলেছেন আইনজীবী দুজন। অতিরিক্ত যা বলেছেন তা হলো, নাবালক লিও ভিনসির স্বার্থ ঠিকমতো রক্ষা হচ্ছে কিনা তা তদারকির জন্যে ভিনসির উইলের ব্যাপারটা কোর্ট অভ চ্যান্সারিকে জানিয়েছেন তাঁরা। বাচ্চাটাকে কবে, কোথায় কিভাবে হস্তান্তর করবেন তা জানতে চেয়েছেন সবশেষে।

চিঠির নিচে স্বাক্ষর রয়েছে, 'জিওফ্রে অ্যাণ্ড জর্ডান'।

চিঠি রেখে এবার উইলের অনুলিপিটা তুলে নিলাম। সহজ ভাষায় পরিষ্কার করে লেখা। আমার সাথে শেষ সাক্ষাতের সময় উইল সম্পর্কে ভিনসি যা যা বলেছিলো হুবহু তাই। তার মানে সত্যিই ছেলেটার দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে! হঠাৎ মনে পড়লো লোহার সিন্দুকের সঙ্গে যে চিঠিটা রেখে গেছিলো ও সেটার কথা। তাড়াতাড়ি নিয়ে এসে খুললাম চিঠিটা। প্রথমে লেখা লিওর পঁচিশতম জন্মদিনে সিন্দুকটা খোলার নির্দেশ। তারপর লিখেছে কি কি পদ্ধতি এবং শিক্ষাক্রম অনুসরণ করতে হবে ছেলেটার শিক্ষার ব্যাপারেঃ গ্রীক, উচ্চতর গণিত এবং আরবী যেন অবশ্যই পড়ানো হয় সে সম্পর্কে রয়েছে স্পষ্ট নির্দেশ। সবশেষে পুনশ্চ দিয়ে লিখেছে, পঁচিশ বছর বয়স হওয়ার আগেই যদি ছেলেটা মারা যায়, যদিও ওর বিশ্বাস তেমন কিছু ঘটবে না, আমিই খুলবো সিন্দুকটা এবং যে সব তথ্য পাবো, নিজেকে যোগ্য মনে করলে সে অনুযায়ী বের হবো রহস্য অনুসন্ধানে আর অযোগ্য মনে করলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ভেতরের জিনিসগুলো। কোনো পরিস্থিতিতেই অপরিচিত কারো কাছে দেয়া চলবে না ওসব।

চিঠিটা পড়ার পর আপত্তি করার মতো কিছু খুঁজে পেলাম না আমি। মেসার্স জিওফ্রে অ্যাণ্ড জর্ডানকে লিখে দিলাম, 'দায়িত্ব গ্রহণ করছি। আশা করি, দিন দশেকের ভেতর আমি লিও ভিনসির অভিভাবকত্ব নিতে পারবো।'

চিঠিটা পাঠিয়ে দিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে গেলাম আমি। আসল কথা পুরোটা চেপে গিয়ে কেবল ভিনসির অনুরোধে তার ছেলের অভিভাবকত্ব নেয়ার কথাটুকু জানালাম। কলেজের ফেলো থাকা অবস্থায় ছেলেটাকে যেন আমার কাছে রাখতে পারি তার অনুমতি চাইলাম। প্রথমে তো কিছুতেই রাজি হবে না কর্তৃপক্ষ। অনেক পীড়াপীড়ির পর রাজি হলো, তবে এক শর্তে, কলেজের ঘর ছেড়ে দিতে হবে আমাকে,

BanglaBook.org

নিজের থাকার ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে।

ভালো কথা। একটু কষ্ট হলেও কলেজের কাছাকাছিই একটা বাসা খুঁজে বের করে ফেলতে পারলাম। এবার ছেলেটার দেখাশোনার জন্যে একজন লোক ঠিক করতে হবে। একটা ব্যাপার ভেবে রেখেছি প্রথমেই, কোনো মহিলাকে খবরদারী করতে দেবো না লিওর ওপর। আমার জন্যে যদি বিন্দুমাত্রও ভালোবাসা জন্মায় ওর মনে তাতে কিছুতেই ভাগ বসাতে দেবো না কোনো মেয়েকে। তাছাড়া বাচ্চাটার যা বয়েস তাতে মেয়েমানুষের সাহায্য ছাড়াই ও চলতে পারবে। বেশ খোঁজাখুঁজি করে গোলমুখো এক যুবককে ঠিক করে ফেললাম। নাম জব। এক শিকারীর আস্তাবলে সাহায্যকারীর কাজ করতো। পাঁচ বছরের একটা বাচ্চার দেখাশোনা করতে হবে শুনে বেশ খুশি মনেই ও চলে এলো আমার সঙ্গে। এরপর সিন্দুকটা নিয়ে লণ্ডন গেলাম। ব্যাঙ্কে জমা রাখলাম ওটা। তারপর শিশুর স্বাস্থ্য ও পরিচর্যা বিষয়ক কয়েকটা বই কিনে ফিরে এলাম বাসায়। বইগুলো প্রথমে নিজে পড়লাম, তারপর জোরে জোরে পড়ে শোনালাম জবকে। তারপর অপেক্ষা লিওর জন্যে।

অবশেষে এলো লিও। বয়স্ক এক মহিলা দিয়ে গেল তাকে।

কি সুন্দর ছেলেটা! এমন নিখুঁত সুন্দর শিশু এর আগে কখনো দেখিনি আমি। চোখ দুটো ধূসর, চওড়া কপাল, মুখটা এই বাচ্চা বয়সেই খোদাই করা মূর্তির মতো কাটা কাটা। সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিসটা, সম্ভবত, ওর চুল। নিখাদ সোনার মতো রং। কোঁকড়া। ঘন হয়ে লেপ্টে আছে সুগঠিত মাথার সাথে।

সঙ্গের মহিলা যখন চলে গেল, সামান্য কাঁদলো ও। কখনো আমি ভুলতে পারবো না সে দৃশ্য। দাঁড়িয়ে আছে ও, জানালা দিয়ে রোদ এসে পড়েছে ওর সোনালি চুলে, একটা হাত মুঠো পাকিয়ে ডলছে একটা চোখ, অন্য চোখে চেয়ে আছে আমাদের দিকে। চেয়ারে বসে আছি আমি, একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে অপেক্ষা করছি, কখন আসবে আমার কোলে। অন্যদিকে জব, ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে নানা ধরনের ছেলেভোলানো শব্দ করে চলেছে। কয়েক মিনিট চললো এরকম, তারপর হঠাৎ দু'হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার দিকে ছুটে এলো ছেলেটা।

'তুমি ভালো,' বললো ও। 'দেখতে পচা, কিন্তু ভালো।'

বুকের ভেতর জড়িয়ে ধরলাম লিওকে।

দশ মিনিট পর দেখা গেল, মাখন লাগানো বিরাট এক টুকরো রুটি পরম তৃপ্তির সাথে খাচ্ছে ও। রুটিতে জ্যাম মাখিয়ে দিতে চাইলো জব। কড়া চোখে ওর দিকে তাকালাম আমি, স্মরণ করিয়ে দিলাম, মাখনের সঙ্গে জ্যাম কঠোর ভাবে নিষেধ করা

BanglaBook.org

হয়েছে বই-এ।

অল্পদিনের ভেতর সারা কলেজের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠলো লিও। আমার সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেছে ওর। যত দিন যাচ্ছে ততই আমরা আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছি। আমি ওকে যতটা আদর করি খুব কম ছেলেই বাবার কাছ থেকে ততটা আদর পায়, আর ও আমাকে যতটা ভালোবাসে খুব কম বাবাই তা পেয়েছে ছেলের কাছ থেকে। পৃথিবীটাকে আজকাল খুব সুন্দর মনে হয় আমার।

দিনগুলো কেমন দ্রুত চলে যাচ্ছে। ছোট্ট লিও শৈশব পেরিয়ে কৈশোরে পা দিলো। তারপর যৌবনে। বয়স যত বাড়ছে ওর শরীরের এবং মনের সৌন্দর্যও যেন ততই বাড়ছে।

ওর বয়স যখন পনেরো, কলেজের সবাই ওকে ডাকতে লাগলো বিউটি বলে আর আমার নাম দিলো বিস্ট। আমরা দু'জন এক সাথে বেরোলেই আড়ালে ওরা বলাবলি করে, 'ঐ দেখ, বিউটি অ্যাণ্ড দ্য বিস্ট যাচ্ছে।'

এক লোক একদিন একটু জোরেই বলে ফেললো কথাটা। শুনতে পেলো লিও। চোখের পলক ফেলার আগেই দেখলাম, ছুটে গেল ও। টুঁটি টিপে ধরলো ওর দ্বিগুণ আকারের লোকটার। মজা দেখার জন্যে কিছু দেখতে পাইনি, এমন ভঙ্গি করে এগিয়ে গেলাম আমি। একটু পরে পেছন ফিরে দেখি, লোকটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে ফিরে আসছে লিও।

আরো কয়েকটা বছর কেটে গেল। এখন কলেজের নিন্দুকেরা আড়ালে আমাকে ডাকে চ্যারণ (গ্রীক পুরাণে বর্ণিত মৃত্যু নদীর খেয়া নৌকার মাঝি) আর লিওকে গ্রীক দেবতা! এবার দারুণ একটা নাম দিয়েছে ওরা। লিওর দিকে তাকালে মনে হয়, সত্যিই সাক্ষাৎ অ্যাপোলো যেন নেমে এসেছে মর্তের মাটিতে।

এ তো গেল চেহারার কথা, জ্ঞান বুদ্ধির দিক থেকেও লিও চমৎকার! ওর বাবার নির্দেশ মতো ওকে শিক্ষা দিচ্ছি আমি। গ্রীক এবং আরবীতে আশাতীত দক্ষতা দেখাচ্ছে ও। আরবী ভাষাটা ওকে ঠিকমতো শেখানোর জন্যে আমাকেও শিখতে হয়েছে। পাঁচ বছরের ভেতর দেখলাম, আমার চেয়ে তো বটেই, যে অধ্যাপক আমাদের দু'জনকেই শিখিয়েছেন তাঁর চেয়ে কোনো অংশে খারাপ জানে না ও ভাষাটা।

শিকার সব সময়ই আমাকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করে। আমার অপ্রতিরোধ্য আবেগের প্রকাশ যেন আমি ঘটাতে পারি এর ভেতর দিয়ে। লিওর মাঝেও আমি সঞ্চারিত করেছি এই আবেগটা। প্রতি শরতে আমরা কোথাও না কোথাও চলে যাই। হয় মাছ ধরতে, নয়তো শিকার করতে। কখনো স্কটল্যাণ্ডে, কখনো নরওয়েতে রাশিয়ায়ও

BanglaBook.org

গিয়েছি একবার। বন্দুকে আমার হাতের টিপ খুব ভালো, কিন্তু আজকাল দেখছি আমাকেও হারিয়ে দিচ্ছে লিও।

লিওর বয়স যখন আঠারো, ওকে কলেজে ভর্তি করে দিলাম। একুশ বছর বয়সে ও ডিগ্রি নিয়ে বেরোলো—সম্মানজনক একটা ডিগ্রি, যদিও খুব উঁচু কিছু নয়। এই সময় আমি প্রথম বারের মতো ওকে ওর ইতিহাস শোনালাম। সামনে যে রহস্য উন্মোচন করতে হবে তা-ও বললাম। খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলো লিও। আমি বললাম, পঁচিশ বছর বয়েস হওয়ার আগে কৌতূহল মেটানোর কোনো উপায় নেই, কেননা ওর বাবা সেরকমই নির্দেশ দিয়ে গেছে।

ওকে নিয়ে একটাই মাত্র ঝামেলা আমার—কোনো মেয়ে পরিচিত হওয়া মাত্র প্রেমে পড়ে যায় ওর। তবে আমার ভাগ্য ভালো, খুবই বুদ্ধিমান ছেলে লিও, প্রেমের প্রতিটা ফাঁদই সাফল্যের সঙ্গে কেটে বেরিয়ে আসে ও।

এভাবে পেরিয়ে গেল বাকি দিন ক'টা। পঁচিশ বছর পূর্ণ হলো লিওর।

তিন

লিওর পঁচিশতম জন্মদিনের আগের দিন আমরা দু'জনেই লণ্ডন গেলাম। সেই রহস্যময় সিন্দুকটা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে সন্ধ্যার দিকে ফিরে এলাম কেমব্রিজে।

সারারাত ঘুমোতে পারলাম না আমরা। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরে হাজির হলো লিও। পরনে এখনো রাতের পোশাক। ওর ইচ্ছা, এখনি খোলা হোক সিন্দুকটা।

'বিশ বছর না খোলা অবস্থায় আছে,' বললাম আমি। 'আর কিছুক্ষণ থাকলে খুব একটা অসুবিধা হবে না। নাশতা সেরেই ওটা খুলবো আমরা।'

ঠিক ন'টায়—একটু অস্বাভাবিক রকম কাঁটায় কাঁটায় ন'টায় আমরা নাশতা সারলাম। উত্তেজনায় টগবগ করছে আমাদের ভেতরটা। এমন কি জবের ভেতরেও সংক্রামিত হয়েছে উত্তেজনা। আমরা কেউই ঠিক স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। লিওর চায়ে চিনির বদলে এক টুকরো বেকন দিয়ে দিলাম আমি। আমার অত্যন্ত দামী একটা চায়ের কাপের হাতল ভেঙে ফেললো জব। সব মিলিয়ে অস্থির একটা অবস্থা।

অবশেষে, এঁটো বাসন পেয়ালা সরানো হলো টেবিল থেকে। আমার অনুরোধে জব সিন্দুকটা এনে রাখলো টেবিলের ওপর। তারপর ভাব দেখালো যেন চলে যাচ্ছে ঘর

BanglaBook.org

ছেড়ে, সিন্দুক বা তার ভেতরের জিনিসপত্র সম্পর্কে কোনো উৎসাহ নেই ওর।

'একটু দাঁড়াও, জব,' বললাম আমি। 'লিওর আপত্তি না থাকলে নিরপেক্ষ একজন সাক্ষী রাখতে চাই। তবে একটা কথা, আমাদের দু'জনের অনুমতি ছাড়া মুখ খুলতে পারবে না।'

'নিশ্চয়ই, হোরেস কাকা,' বললো লিও—কাকা ডাকতেই আমি শিখিয়েছি ওকে।

'দরজা বন্ধ করে দাও, জব,' বললাম আমি। 'আর টুকটাক জিনিস রাখার যে বাক্সটা আছে, ওটা নিয়ে এসো।'

নির্দেশ পালন করলো জব। তিনসি অর্থাৎ লিওর বাবা মৃত্যুর রাতে যে চাবিগুলো দিয়ে গিয়েছিলো সেগুলো বের করলাম বাক্স থেকে। মোট তিনটে। সবচেয়ে বড় চাবিটা তুলনামূলকভাবে আধুনিক, দ্বিতীয়টা অতি প্রাচীন আর তৃতীয়টা—কি বলবো, কোনো কিছুর সাথে সাদৃশ্য নেই এর। রূপোর তৈরি নিরেট একটা টুকরোর মতো। টুকরাটার সঙ্গে আড়াআড়িভাবে লাগানো সরু একটা দণ্ড। হাতলের কাজ করে দণ্ডটা। শেষ মাথায় ছোট ছোট কয়েকটা খাঁজ। মোট কথা, চাবির চেহারা যে এমন হতে পারে তা আমাদের ধারণায় ছিলো না।

'তৈরি তোমরা?' বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞরা মাইন ফাটানোর আগে যেমন জিজ্ঞেস করে তেমন জিজ্ঞেস করলাম আমি।

কেউ কোনো জবাব দিলো না। বড় চাবিটা তুলে নিলাম। উত্তেজনায় মৃদু মৃদু কাঁপছে আমার হাত। খাঁজগুলোয় তেল মাখিয়ে ধীরে ধীরে তালায় ঢোকালাম চাবি। মোচড় দিতেই খুলে গেল তালা। একটু ঝুঁকে এলো লিও। দুহাতে সর্বশক্তিতে টেনে ওঠালো সিন্দুকের ভারি ডালাটা। কব্জাগুলোয় মরচে পড়ে গেছে বলে শক্তি লাগলো বেশ। ডালাটা উঠে যেতেই দেখলাম ভেতরে আরেকটা বাক্স, ধুলোয় ছেয়ে আছে। কোনোরকম কষ্ট ছাড়াই সিন্দুকের ভেতর থেকে বের করে আনলাম সেটা।

আবলুস কাঠের বাক্স—অন্তত দেখে তাই মনে হলো আমার। প্রতিটা কোনা লোহার পাত দিয়ে মোড়া। কালের করাল গ্রাসে ক্ষয়ে গেছে জায়গায় জায়গায়।

'এবার এটা,' দ্বিতীয় চাবিটা ঢোকাতে ঢোকাতে বিড় বিড় করলাম আমি।

নিঃশ্বাস বন্ধ করে সামনে ঝুঁকলো লিও আর জব। ঘোরালাম চাবি। আমিই খুললাম এই বাক্সের ডালা। পরমুহূর্তে বিস্ময়ের একটা ধ্বনি বেরোলো আমার গলা দিয়ে। বাক্সটার ভেতর আরেকটা বাক্স। রূপোর। অত্যন্ত চমৎকার সূক্ষ্ম কারুকাজ করা।

বাক্সটা বের করে রাখলাম টেবিলের ওপর। অদ্ভুতদর্শন রূপোর চাবিটা এবার

BanglaBook.org

ঢুকালাম। এদিকে ওদিকে নানা ভাবে ঘুরিয়ে চাপ দিয়ে যেতে লাগলাম। ক্লিক করে এক সময় খুলে গেল তালাটা। আপনা আপনি খাড়া হয়ে গেল বাক্সের ডালা। বাদামী রঙের ফালি ফালি জিনিসে বাক্সটার কানা পর্যন্ত ঠাসা। দেখতে অনেকটা কাগজের মতো কিন্তু কাগজ নয়, নরম কোনো উদ্ভিদের আঁশ সম্ভবত। সাবধানে ওগুলো বের করে আনলাম। ওপর দিক থেকে প্রায় তিন ইঞ্চি খালি হয়ে গেল বাক্স। আধুনিক চেহারার সাধারণ একটা খাম চোখে পড়লো। ওপরে আমার প্রয়াত বন্ধু ভিনসির হাতে লেখাঃ

'আমার পুত্র লিওর প্রতি।'

চিঠিটা লিওর হাতে দিলাম। খামটার দিকে এক পলক তাকিয়েই সেটা টেবিলে নামিয়ে রাখলো ও। তারপর এমন একটা ভঙ্গি করলো, আমার বুঝতে অসুবিধে হলো না, বাক্সের অন্যান্য জিনিস দেখতেই বেশি আগ্রহী ও।

এরপর যে জিনিসটা আমি বের করলাম, সেটা একটা পার্চমেন্ট, সাবধানে পাকিয়ে রাখা। পাক খুলে দেখলাম, এটাও ভিনসির হাতে লেখা। ওপরে শিরোনামঃ 'পোড়ামাটির ফলক–এর ওপর প্রাচীন গ্রীক অক্ষরে লেখা বক্তব্যের অনুবাদ।' চিঠির পাশে নামিয়ে রাখলাম ওটা। তারপর বেরোলো আরেকটা পার্চমেন্ট; অনেক প্রাচীন, আগেরটার মতোই পাকিয়ে রাখা। জায়গায় জায়গায় হলুদ হয়ে গেছে। অত্যন্ত সাবধানে এটা খুললাম আমি। মনে হলো একই মূল গ্রীকের অনুবাদ এটাও। তবে ইংরেজিতে নয়, প্রাচীন ল্যাটিন অক্ষরে। লেখার ধরন ইত্যাদি দেখে মনে হলো, জিনিসটা সম্ভবত ষোল শতকের প্রথম দিককার।

এটার ঠিক নিচেই পেলাম শক্ত এবং ভারি একটা জিনিস, হলদে রঙের লিনেনে জড়ানো। আলগোছে উঠিয়ে আনতেই দেখলাম আরেক প্রস্থ সেই আঁশ আঁশ জিনিসের ওপর বসানো ছিলো ওটা। ধীরে ধীরে, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে জড়ানো লিনেনটা খুলে আনতেই বেশ বড় নোংরা–হলুদ রঙের একটা পোড়া মাটির ফলক বেরোলো। দেখেই বুঝলাম খুব প্রাচীন জিনিস। এক কালে সম্ভবত মাঝারি আকৃতির সাধারণ কোনো পাত্রের অংশ ছিলো। লম্বায় হবে সাড়ে দশ ইঞ্চি, চওড়ায় সাত, এবং প্রায় সিকি ইঞ্চির মতো পুরু। উত্তল দিকটায় খুদে খুদে প্রাচীন গ্রীক অক্ষরে কি যেন লেখা। জায়গায় জায়গায় অস্পষ্ট হয়ে গেছে অক্ষরগুলো। লম্বালম্বি একটা দাগ দেখতে পেলাম ফলকটায়— বোধহয় ভেঙে গিয়েছিলো কখনো, পরে সংযোজক কোনো পদার্থ দিয়ে জোড়া দেয়া হয়েছে। ভেতরের দিকটাতেও অসংখ্য লেখা। কিন্তু এগুলো ভীষণ এলোমেলো আর অদ্ভুত। স্পষ্টতই বোঝা যায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের হাতে লেখা। ভাষাও বিভিন্ন।

BanglaBook.org

আর কিছু?' উত্তেজিত গলায় ফিসফিস করে উঠলো লিও।

রূপোর বাক্সটার ভেতর হাতড়ালাম আমি। ছোট্ট একটা লিনেনের থলে পেলাম এবার। থলের ভেতর থেকে বেরোলো হাতির দাঁতের ওপর আঁকা খুবই সুন্দর একটা মিনিয়েচার (ছোট্ট ছবি), আর একটা ছোট্ট চকলেট রঙের গোলমোহর সীলের ওপর আঁকা কয়েকটা চিহ্নঃ

যার অর্থ, এ পর্যন্ত আমরা যতদূর উদ্ধার করতে পেরেছিঃ 'সুটেন সি রা,' অনুবাদ করলে দাঁড়ায় 'রা অর্থাৎ সূর্যের রাজোচিত পুত্র'। মিনিয়েচারের ছবিটা লিওর মায়ের। অপূর্ব সুন্দরী এক মহিলা। উল্টোপিঠে ভিনসির হাতে লেখা, 'আমার প্রিয়তমা স্ত্রী।'

'ব্যস, আর কিছু নেই,' বললাম আমি।

'বেশ,' মিনিয়েচারটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললো লিও, এতক্ষণ গভীর মমতার সঙ্গে মায়ের ছবিটা দেখছিলো ও। 'এবার তাহলে বাবার চিঠিটা পড়া যাক।'

খামের সীলমোহর ভেঙে চিঠিটা বের করলো ও। জোরে জোরে পড়তে শুরু করলোঃ

'প্রিয় পুত্র লিও,—এ চিঠি যখন খুলবে, যদি ততদিন বেঁচে থাকো, পরিপূর্ণ যুবক হয়ে উঠবে তুমি। আর আমি, অনেক দিন আগে মরে যাওয়া বিস্মৃত এক মানুষ। তবু এটা পড়ার সময় মনে রাখবে, আমি ছিলাম, আমার সমস্ত অস্তিত্ব নিয়ে আমি ছিলাম, হয়তো এখনো আছি, এই কাগজ কলমের যোগসূত্রের মাঝ দিয়ে মরণ সাগরের এপার থেকে বাড়িয়ে দিচ্ছি হাত, কবরের নৈঃশব্দ পেরিয়ে আমার স্বর পৌঁছুচ্ছে তোমার কাছে। যদিও আমি মৃত, আমার কোনো স্মৃতিই আর অবশিষ্ট নেই তোমার মনে, তবু এই মুহূর্তে—যখন তুমি পড়ছো এটা, আমি আছি তোমার সাথে। তোমার জন্মের পর সামান্য সময়ের জন্যে একবার তোমাকে দেখেছিলাম। ব্যস ঐটুকুই, আর কখনো তোমাকে আমি দেখিনি। ক্ষমা কোরো আমাকে। এমন একজনের প্রাণের বিনিময়ে তুমি প্রাণ পেয়েছিলে যাকে আমি আমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছিলাম। এখনো সেই তিক্ত স্মৃতি আমি ভুলতে পারিনি। বেঁচে থাকলে হয়তো পারতাম, কিন্তু আমার নিয়তি তার বিপক্ষে। অসহ্য শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। তোমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই এর ইতি টানবো আমি। সেটা যদি ভুল হয়, ঈশ্বর যেন আমাকে ক্ষমা করেন। কিছুতেই আর এক বছরের বেশি বাঁচা চলবে না আমার।'

BanglaBook.org

'যা ভেবেছিলাম!' বললাম আমি, 'আত্মহত্যা করেছিলো ও!'

জবাব দিলো না লিও। পড়তে লাগলো, 'নিজের সম্পর্কে অনেক কথা বললাম, এবার আসল কথায় আসা যাক। আমার বন্ধু হলি (ও যদি রাজি হয়, ওর ওপরই তোমাকে মানুষ করার ভার দিয়ে যাবো বলে ঠিক করেছি) ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই তোমাকে জানিয়েছে তোমার বংশের অসাধারণ প্রাচীনত্বের কথা। এই বাক্সে যেসব জিনিস আছে তাতেও তার সপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ পাবে। আমার বাবা তাঁর মৃত্যুশয্যায় আমাকে দিয়ে যান বাক্সটা। সেই মুহূর্ত থেকেই ব্যাপারটা শেকড় ছড়াতে শুরু করে আমার মনের ভেতর! আমার বয়স যখন মাত্র উনিশ, তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, পোড়ামাটির ফলকে লেখা উপাখ্যানের সত্যতা যাচাই করবো। এলিজাবেথের আমলে আমাদের এক হতভাগ্য পূর্বপুরুষও সে চেষ্টা করেছিলেন, শোচনীয় পরিণতি হয়েছিলো তাঁর। আমাকেও একই পরিণতি বরণ করতে হয়েছিলো। তবে আমার সৌভাগ্য, আমি ফিরে আসতে পেরেছিলাম এবং নিজের চোখে সব দেখে ফিরেছিলাম। আফ্রিকা উপকূলে, এখনো মানুষের পা পড়েনি এমন এক জায়গায়, জাম্বেসি নদী যেখানে সাগরে পড়েছে তার কিছু উত্তরে একটা অন্তরীপ আছে। তার শেষ প্রান্তে নিগ্রোর মাথার মতো দেখতে একটা চূড়া উঠে গেছে ওপর দিকে, লেখায় যেমন বর্ণনা আছে তেমন। ওখানে আমি নেমেছিলাম। স্থানীয় এক লোকের সাথে দেখা হয় আমার—কিছু একটা অপরাধ করেছিলো লোকটা ফলে নিজের মানুষজন তাকে বিতাড়িত করে। সে আমাকে জানায়, ডাঙার ভেতর দিকে অনেক দূরে বিরাট বিরাট পাহাড় আছে, পেয়ালার মত চেহারা। অসংখ্য গুহা সেগুলোতে। বিস্তীর্ণ জলাভূমি ঘিরে রেখেছে পুরো অঞ্চলটাকে। আমি আরো জানতে পারি, আরবীর এক উপভাষায় কথা বলে তারা। অদ্ভুত সুন্দরী এক শ্বেতাঙ্গিনী তাদের শাসন করে। কালে ভদ্রে কখনো সে দেখা দেয় তাদের সামনে। জীবিত বা মৃত সব কিছুর ওপর নাকি তার ক্ষমতা রয়েছে। দুদিন পরে আমি জানতে পারি, ঐ লোকটা মারা গেছে। জলাভূমি পেরোনোর সময় সংক্রামক জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলো। এই সময় খাবার এবং পানির তীব্র অভাবে পড়ি আমি, অদ্ভুত এক অসুখের লক্ষণও দেখা দেয়। কোনো রকমে আমি আমার ডাউ-এ (এক মাস্তুলঅলা এক ধরনের জাহাজ) ফিরে আসতে পেরেছিলাম। সে সময় আমার অবস্থা রীতিমতো বিধ্বস্ত।

'এরপর বেঁচে থাকার জন্যে কি দুঃসাহসিক কাণ্ড করতে হয়েছিলো আমাকে তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। মাদাগাস্কার উপকূলে বিধ্বস্ত হয় আমার ডাউ। কয়েক মাস পর এক ইংলিশ জাহাজ আমাকে উদ্ধার করে এডেন-এ নিয়ে আসে। সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডের পথে রওনা হই আমি। তখনো আমি সিদ্ধান্তে অটল, উপযুক্ত প্রস্তুতি নিতে যে কয়দিন

BanglaBook.org

লাগে অপেক্ষা করবো, তারপর আবার ফিরে যাবো সেখানে, রহস্যের শেষ দেখে ছাড়বো। ফেরার পথে গ্রীসে থামলাম। ওখানে পরিচয় হলো তোমার মায়ের সাথে। তাঁকে বিয়ে করলাম আমি। ওখানেই জন্ম হলো তোমার, এবং তোমাকে পৃথিবীর আলো দেখাতে গিয়ে মারা গেলেন তোমার মা। তারপর সেই অন্তিম অসুখে পড়লাম আমি, মরার জন্যে ফিরে এলাম দেশে। তখনও আমি আশা ছাড়িনি, যে রহস্য শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সযত্নে সংরক্ষণ করেছে আমার পূর্বপুরুষেরা সে রহস্য উন্মোচনের জন্যে আবার আফ্রিকা উপকূলে যাওয়ার আশা নিয়ে লেগে গেলাম আরবীর সেই বিশেষ উপভাষা শিখতে। কিন্তু লাভ হলো না, দ্রুত ভেঙে পড়লো আমার শরীর। এখানেই শেষ আমার কাহিনী।

কিন্তু তোমার জন্যে এখানেই শেষ নয়—বলতে পারো শুরু। আমার পরিশ্রমের ফল রেখে যাচ্ছি তোমার জন্যে, সে সাথে বংশানুক্রমে যেসব প্রমাণপত্র পেয়েছি সেগুলোও। আমার ইচ্ছা, এমন একটা বয়েসে এগুলো তোমার হাতে পড়ুক যে বয়েসে সবদিক বিবেচনা করে তুমি নিজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারবে, রহস্য অনুসন্ধানে বেরোবে কি বেরোবে না। তোমাকে আমি বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করতে চাই না। তুমি নিজেই বিচার করে দেখ সব দিক। যদি মনে হয় তুমি বেরোবে তাহলে যাতে কোনোরকম অভাবে পড়তে না হয় সেজন্যে আমি ব্যবস্থা করে যাচ্ছি। আর যদি মনে করো পুরো ব্যাপারটাই গাঁজাখুরি, সেক্ষেত্রে তোমার প্রতি আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, ধ্বংস করে ফেলবে পোড়ামাটির ফলক আর লেখাগুলো, যাতে ভবিষ্যতে এ বংশের আর কেউ আমার বা আমার পূর্বপুরুষদের মতো যন্ত্রণা ভোগ না করে। সেটাই সম্ভবত বুদ্ধিমানের কাজ হবে। মনে রাখবে, কোনো ভাবেই যেন অন্য কারো হাতে না পড়ে জিনিসগুলো।—বিদায়!'

এভাবে আচমকা শেষ হয়ে গেল ভিনসির তারিখ, স্বাক্ষরবিহীন চিঠি।

'কি বুঝলে, হলি কাকা?' চিঠিটা টেবিলে নামিয়ে রাখতে রাখতে বললো লিও। 'রহস্যময় কিছু একটা আশা করছিলাম আমরা, এবং মনে হয় পেয়েছি, তাই না?'

'কি বুঝেছি জানতে চাইছো?' বললাম আমি। 'আর কিছু বুঝি আর না বুঝি, তোমার বাপের মাথাটা যে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না। বিশ বছর আগের সে রাতেই আমি সন্দেহ করেছিলাম।'

'ঠিক বলেছেন, স্যার!' বললো জব, সর্বজান্তার ভঙ্গি তার মুখে।

'যা হোক,' বললো লিও। 'এবার দেখা যাক, পোড়ামাটির ফলকটা কি বলতে চায়।'

বাবার হাতে লেখা অনুবাদটা তুলে নিলো লিও। পড়তে লাগলোঃ

'আমি, মৃত্যুপথযাত্রী আমেনার্তাস, মিশরের রাজকীয় ফারাও বংশের মেয়ে, দেবতারা যার সন্তুষ্টি কামনা করে এবং দানবরা যাকে ভয় করে সেই আইসিসের পূজারী ক্যালিক্রেটিসের (সৌন্দর্যের শক্তিশালী) স্ত্রী, আমার শিশুপুত্র টিসিসথেনেসকে (শক্তিমান প্রতিশোধগ্রহণকারী) বলছিঃ আমি তোমার বাবার সাথে নেকতানেবেস * এর আমলে মিশর থেকে পালিয়ে যাই। আমার ভালোবাসার কারণে তিনি তাঁর পুরোহিতের ব্রত ভঙ্গ করেন। জলপথে দক্ষিণ দিকে পালাই আমরা। দুবার বারো চাঁদ (অর্থাৎ দু'বছর) সাগরে ভেসে বেড়ানোর পর উদীয়মান সূর্যের দিকে মুখ করে থাকা লিবিয়া (আফ্রিকা) উপকূলে পৌঁছাই, যেখানে এক নদীর তীরে বিশাল পাথর কুঁদে তৈরি করা হয়েছে ইথিওপিয়ানের মাথা। এই সময় ঝড়ে পড়ি আমরা। বিরাট এক নদীর ভিতর দিয়ে চারদিন একটানা ভেসে চলি ঝড়ের মুখে। আমাদের সঙ্গী-সাথীদের বেশিরভাগই মারা পড়ে--কেউ ডুবে, কেউ অসুখে। আমরা বেঁচে গেলাম। জংলী মানুষরা জনশূন্য অকর্ষিত জলাভূমির ওপর দিয়ে নিয়ে গেল আমাদের। সেখানে সামুদ্রিক পাখির ঝাঁক আকাশ ঢেকে ফেলে। দশদিন একটানা চলার পর একটা পাহাড়ের কাছে পৌঁছুলাম। পাহাড়ের ভেতরটা ফাঁপা। এককালে বিরাট এক নগর ছিলো সেখানে, এখন ধ্বংসস্তূপ। আর সেখানে আছে গুহা, অসংখ্য, কোনো মানুষ কখনো তার শেষ দেখেনি। আগন্তুকের মাথায় পাত্র বসিয়ে দেয় যে জাতি তাদের রানীর কাছে আমাদের নিয়ে গেল জংলীরা। মেয়ে মানুষটা জাদুকরী, দুনিয়ার তাবৎ জিনিস সম্পর্কে জ্ঞান রাখে সে। তার জীবন এবং সৌন্দর্য কোনোটাই কখনো নিঃশেষ হয় না। প্রেমের চোখে সে তাকায় তোমার বাবা ক্যালিক্রেটিসের দিকে, এবং আমাকে হত্যা করে বিয়ে করতে চায় তাঁকে। কিন্তু তোমার বাবা ভালোবাসতেন আমাকে, তাই ভয় পান ওর কথায়। ওকে বিয়ে করতে রাজি হলেন না উনি। এতে খেপে গেল সে, তার জাদুর প্রভাবে দুর্গম পথ পেরিয়ে বিশাল এক গহ্বরের কাছে যেতে বাধ্য করলো আমাদের। সেই গহ্বরের মুখে বৃদ্ধ দার্শনিককে মৃত পড়ে থাকতে দেখলাম। আমাদেরকে অমর জীবনের ঘূর্ণায়মান স্তম্ভ দেখালো সে, সেখানে বজ্র গর্জনের মতো শব্দ শোনা যায়। আগুনের শিখার ভেতর গিয়ে দাঁড়ালো সে, বেরিয়ে এলো একটু পরে। দেখলাম, কিছুই হয়নি তার, বরং রূপ আরো বেড়ে গেছে। তারপর সে শপথ করলো, তার মতোই অমর করে দেবে তোমার বাবাকে যদি তিনি

---

* মিশরের শেষ মিশরীয় ফারাও। খৃঃ পূঃ ৩৩৯ অব্দে ওকাস থেকে ইথিওপিয়ায় পালিয়ে যান।—সম্পাদক।

আমাকে হত্যা করে তার কাছে আত্মনিবেদন করেন। সে নিজে আমাকে হত্যা করতে পারেনি, কারণ আমার দেশে প্রচলিত জাদুবিদ্যায় আমি পারদর্শী, সেই জাদুর প্রভাব কাটিয়ে আমাকে হত্যা করা সম্ভব ছিলো না ওর পক্ষে। তার সৌন্দর্য যেন দেখতে না হয় সেজন্যে চোখে হাত চাপা দিয়েছিলেন তোমার বাবা, তখন ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে ওঠে সে, জাদুর প্রভাবে হত্যা করে তাঁকে। এরপর তাঁর শরীরের ওপর আছড়ে পড়ে কাঁদলো সে, বিলাপ করলো। তারপর ভয় পেয়ে যেখানে জাহাজ আসে সেই বিরাট নদীর মোহনায় পাঠিয়ে দিলো আমাকে। কয়েকদিন পর একটা জাহাজ আমাকে উদ্ধার করে অনেক দূর দেশে নিয়ে যায়, সেখানে আমি জন্ম দিই তোমাকে। তারপর অনেক ঘুরে অনেক কষ্টে অবশেষে পৌঁছাই এথেন্সে। পুত্র, টিসিসথেনেস, তোমাকে বলছি, ঐ মেয়েলোকটাকে খুঁজে বের করবে এবং জেনে নেবে জীবনের গোপন রহস্য, আর যদি পারো হত্যা করবে তাকে—পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবে। যদি তুমি ভয় পাও বা ব্যর্থ হও, সেজন্যে তোমার সব উত্তরপুরুষদের উদ্দেশ্যে আমি বলে যাচ্ছি, যতদিন না তাদের ভেতর তেমন সাহসী কেউ জন্মায়, যে ঐ আগুনে স্নান করে এসে বসবে ফারাওয়ের আসনে, ততদিন যেন অব্যাহত থাকে চেষ্টা। এসব কথা আমি বললাম, হতে পারে অতীত বিশ্বাসের কথা, কিন্তু আমি জানি, আমি মিথ্যা বলি না।'

'ঈশ্বর ক্ষমা করুন ওঁকে,' আর্তনাদের মতো কথা ক'টা বেরোলো জবের মুখ দিয়ে। এতক্ষণ হাঁ করে চমকপ্রদ কাহিনীটা শুনছিলো ও।

আর আমি, কিছুই বললাম না। প্রথমেই আমার মনে হলো, কাহিনীটা ভিনসির বানানো নয় তো?—যদিও মনে মনে বুঝতে পারছি, এমন একটা কাহিনী বানানো প্রায় অসম্ভব। অতিমাত্রায় মৌলিক এ কাহিনী। সন্দেহ নিরসনের জন্যে তুলে নিলাম পোড়ামাটির ফলকটা। পড়তে শুরু করলাম, প্রাচীন গ্রীক বড় হরফে লেখা মূল লিপিটা। দেখলাম, ভিনসির অনুবাদের সাথে কোনো পার্থক্য নেই এর।

পোড়ামাটির ফলকটার এ পিঠে আরো কয়েকটা জিনিস চোখে পড়লো আমার। একেবারে ওপরে অনুজ্জ্বল লাল রঙে আঁকা একটা ছবি। কাজ করা রূপোর বাক্সে যে গোলমোহরটা পেয়েছি তাতে যে ছবি আঁকা ঠিক সেরকম। পার্থক্য একটাই, এ ছবিটা উল্টো। অর্থাৎ ঐ মোহরে রং মাখিয়ে ছাপ দিয়ে আঁকা হয়েছে ছবিটা।

লিপির একদম নিচে ঐ একই অনুজ্জ্বল লাল-এ আঁকা একটা স্ফিংস-এর মাথা এবং কাঁধ। মর্যাদার প্রতীক দুটো পালক পরে আছে স্ফিংসটা।

ফলকের ডান পাশে লাল কালি দিয়ে লেখা কয়েকটা কথাঃ 'পৃথিবীতে, আকাশে এবং সাগরে কত বিচিত্র জিনিসই না আছে।' নিচে নীল রং-এ সই করা, 'ডরোথি

BanglaBook.org

ভিনসি'।

কিছুই বুঝলাম না। হতবুদ্ধি হয়ে ওল্টালাম ফলকটা। এ পাশে খুদে খুদে অক্ষরে অসংখ্য মন্তব্য আর স্বাক্ষর; গ্রীক-এ, ল্যাটিন্-এ, ইংরেজিতে। প্রথমটার লেখক টিসিসথেনেস। গ্রীক বড় হরফে তাঁর ছেলেকে উদ্দেশ্য করে লিখছে, 'আমি পারলাম না যেতে। টিসিসথেনেস, পুত্র ক্যালিক্রেটিসকে।'

এই ক্যালিক্রেটিস (সম্ভবত গ্রীক রীতিতে দাদার নামে নাম রাখা হয়েছিলো তার) বোধহয় বেরিয়েছিলো অনুসন্ধানে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। তার হাতে লেখা অস্পষ্ট কথাগুলো দেখলামঃ 'রওনা হয়েও ফিরে আসতে বাধ্য হলাম। দেবতারা আমার বিরুদ্ধে। ক্যালিক্রেটিস তার পুত্রকে।'

এর পরের কতকগুলো লেখা একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। দু'একটা শব্দ ছাড়া সেগুলোর কিছুই পড়তে পারলাম না। তারপর এক জায়গায় দেখলাম একটা স্বাক্ষরঃ 'লায়োনেল ভিনসি'। এর ঠিক ডানে লেখা, 'জে.বি.ডি'। এবং এর নিচে বিচিত্র হাতের লেখায় এক গাদা গ্রীক দস্তখত—প্রায় প্রত্যেকটার সাথে এই শব্দ ক'টা আছেঃ 'আমার পুত্রের প্রতি'।

এর পর যে শব্দটা আমি পড়তে পারলাম, তা হলো 'রোম, এ. ইউ. সি.' অর্থাৎ রোমে চলে এসেছে পরিবারটা। এরপর বারোটা ল্যাটিন স্বাক্ষর। এই বারোটার ন'টা নামই শেষ হয়েছে 'ভিনডেক্স' অর্থাৎ 'প্রতিশোধগ্রহণকারী' শব্দটা দিয়ে। সম্ভবত ল্যাটিন শব্দটা প্রথমে দ্য ভিনসি পরে শুধু ভিনসিতে রূপান্তরিত হয়।

রোমান নামগুলোর পর বেশ কয়েক শতাব্দীর ফাঁক। এই সময়ে কি হয়েছিলো, কার কাছে ছিলো ফলকটা, কোনো উল্লেখ নেই। ভিনসি বলেছিলো, পরিবারটা শেষ পর্যন্ত লোম্বার্ডিতে স্থিত হয়েছিলো এবং শার্লেমেনের সময় আল্পস পেরিয়ে ব্রিটানিতে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলো। এসব কথা ভিনসি কি করে জেনেছিলো জানি না। কারণ এ সম্পর্কে কোনো কথা বা, এ সময়ের কারো স্বাক্ষর নেই ফলকে।

এরপর দেখলাম অদ্ভুত একটা লিপি। ফলকটার ওপর মূল ল্যাটিন ভাষায় লেখা। রূপোর বাক্সে পাওয়া দ্বিতীয় পার্চমেন্টটায় ইংরেজির প্রাচীন রূপে রূপান্তর করা হয়েছে সেটা। মূল লিপিটা লিখছেন দ্য ভিনসি, ১৪৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। তার ছেলে বা নাতি কেউ সম্ভবত করেছে পার্চমেন্টের অনুবাদটা।

সবশেষে এলো আর একটা জিনিস, আমেনার্তাস-এর মূল লিপির আর একটা অনুবাদ, মধ্যযুগীয় ল্যাটিনে করা।

'সব তো শুনলে,' পোড়ামাটির ফলকটা নামিয়ে রাখতে রাখতে বললাম আমি

BanglaBook.org

'এবার তোমার মত কি?'

'তোমার?' স্বভাবসুলভ চটপটে গলায় জিজ্ঞেস করলো লিও।

'পোড়ামাটির ফলকটা নিঃসন্দেহে খাঁটি। তবে ওর ওপর আমেনার্তাসের লেখাটা পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়। স্বামীর মৃত্যু এবং তার আগের ও পরের দুঃখ কষ্টে মাথা বিগড়ে গিয়েছিলো মহিলার।'

'তাই যদি হবে, বাবা যা যা দেখেছিলেন বা শুনেছিলেন সে সব কি?'

'নিছক কাকতালীয় ঘটনা। আফ্রিকা উপকূলে অনেক পাহাড় থাকতে পারে যার একটা চূড়া নিগ্রোর মাথার মতো দেখতে, ওখানে এমন লোকও থাকতে পারে যারা জঘন্য আরবীতে কথা বলে, আর জলাভূমি তো থাকতেই পারে। তাছাড়া, একটা কথা, লিও, দুঃখ পেও না, তিনসি যখন ঐ চিঠিটা তোমাকে লেখে, আমার বিশ্বাস ও-ও তখন সুস্থ মস্তিষ্কে ছিলো না। আমি নিশ্চিত, সব ফালতু কথা। --তুমি কি বলো, জব?'

'আমারও তাই ধারণা, স্যার. সব গাঁজাখুরি গল্পো। আর যদি সত্যি হয়ও, নিশ্চয়ই মিস্টার লিও খামোকা ওসব বিপদ আর ঝামেলার ভেতর যাবেন না?'

'হয়তো তোমাদের দু'জনের ধারণাই ঠিক,' নিরুত্তাপ গলায় বললো লিও। 'আমি কোনো মত দিতে যাচ্ছি না। কিন্তু আমি, চিরতরে ইতি ঘটাতে চাই ব্যাপারটার। তোমরা কেউ যদি না যাও, আমি একাই যাবো।'

লিওর মুখের দিকে তাকালাম আমি। স্থির প্রতিজ্ঞার ছাপ দেখলাম সেখানে। লিওর মুখের এই বিশেষ ভাবটা আমার পরিচিত। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি—ওর মুখে এই ছাপটা পড়ার অর্থ, ও সিদ্ধান্তে অটল। এখন ও ভাঙবে তবু মচকাতে রাজি নয়। কিন্তু লিওকে একা ছেড়ে দেয়ার কথা আমি ভাবতেও পারি না। এই পৃথিবীতে ও আমার একমাত্র বন্ধন। আমার পৃথিবী বলতেই তো লিও—ভাই, সন্তান, বন্ধু—ও-ই আমার সব। ও যেখানে যাবে—যখন জানি বিপদের সম্ভাবনা আছে—আমাকেও যেতে হবে সাথে। কিন্তু অবশ্যই ওকে জানতে দেয়া চলবে না, আমার ওপর ওর প্রভাব কত বড়ো। সুতরাং ওর সাথে যাওয়ার জন্যে এবার একটা ছুতো খুঁজতে হবে আমাকে। নিরাসক্ত ভঙ্গিতে চুপ করে রইলাম আমি।

'হ্যাঁ, বুড়ো কেথনো কখনো লিও এ নামে ডাকে আমাকে), আমি যাবো। "অমর জীবনের ঘূর্ণায়মান স্তম্ভের" দেখা যদি না-ও পাই, তুখোড় এক চোট শিকার তো হবে।'

এই তো পেয়ে গেছি ছুতো! সঙ্গে সঙ্গে ধরলাম কথাটা।

'শিকার!' বললাম আমি। 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কথাটা তো ভাবিনি। নিশ্চয়ই ভয়ানক বুনো

BanglaBook.org

দেশটা, বড়সড় একটা দান মারা যাবে হয়তো। সারা জীবনের স্বপ্ন আমার, মরার আগে একটা বাফেলো মারবো। এবার সুযোগ পাওয়া গেছে। বুঝলে, লিও, ওসব অনুসন্ধান ইত্যাদি তুমিই চালিও, আমি শিকার করবো। তুমি যখন যাবেই, আমিও যাই, তোমার সাথে কয়েকটা দিন ছুটি কাটিয়ে আসি।'

'আগেই জানতাম,' বললো লিও। 'এমন সুযোগ তুমি ছাড়তে পারবে না। কিন্তু, টাকা পয়সার কি হবে? বেশ মোটা একটা অঙ্ক তো লাগবে?'

'ও নিয়ে ভাবতে হবে না তোমাকে। গত বিশ বছর ধরে জমা হয়েছে তোমার আয়, আর আমার কাছেও আছে কিছু। তোমার বাবা যা দিয়ে গিয়েছিলো তার তিন ভাগের দু'ভাগই জমা হয়েছে। টাকা-পয়সা কোনো সমস্যাই না।'

'তাহলে আর দেরি কেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়। শহর থেকে কয়েকটা বন্দুকও কিনতে হবে। ভালো কথা, জব, তুমি আসছো নাকি? জীবনটা তো ঘরের কোণেই কাটিয়ে দিলে, এবার দুনিয়াটা একটু দেখ।'

'দুনিয়া দেখার শখ খুব একটা নেই আমার,' নিরাসক্ত গলায় বললো জব। 'তবে কিনা, আপনারা দু'জন যাচ্ছেন, আপনাদের দেখাশোনার জন্যে তো কাউকে না কাউকে দরকার। বিশ বছর আপনাদের সেবা করেছি, এখনই বা করবো না কেন?'

'ঠিক, জব,' বললাম আমি। 'খুব মজার কিছু দেখতে পাবে তা ভেবো না, তবে শিকার করতে পারবে ইচ্ছে মতো। আর হ্যাঁ, তোমাদের দু'জনকেই বলছি এ নিয়ে কোনো কথাই যেন বাইরের কেউ জানতে না পারে,' পোড়ামাটির ফলকটার দিকে ইশারা করলাম আমি। 'মানুষ আমাদের পাগল ভাবুক তা আমি চাই না।'

চার

প্রায় মাঝ রাত। সামনে বিস্তীর্ণ শান্ত সমুদ্র। পূর্ণ চাঁদের রুপালি আলোয় ঝিকমিক করছে। অনুকূল বাতাসে ফুলে আছে আমাদের ডাউ-এর বিশাল পালটা। মৃদু দুলুনির সাথে তরতরিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে ডাউ। সামনে বেশির ভাগ লোকই ঘুমিয়ে আছে। শ্যামলা রঙের শক্তপোক্ত এক আরব—নাম মাহমুদ—অলস ভঙ্গিতে ধরে আছে হালের দণ্ড। ডানদিকে তিন-চার মাইল দূরে অস্পষ্ট একটা রেখা। মধ্য আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ওটা।

শান্ত রাত। এত শান্ত যে, ডাউ-এর সামনে ফিসফিস করে কথা বললে পেছন

BanglaBook.org

থেকে শোনা যায়। হঠাৎ ডাঙার দিক থেকে ভেসে এলো অস্পষ্ট অথচ গম্ভীর একটা আওয়াজ।

হালের দণ্ডটা শক্ত করে ধরলো আরব, একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলো, 'সিমবা (সিংহ)!'

উঠে বসে কান খাড়া করলাম আমরা আবার। শোনা গেল ধীর; গম্ভীর আওয়াজটা। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো আমাদের শরীর।

'ক্যাপ্টেন যদি হিসেবে গোলমাল না করে থাকে,' বললাম আমি। 'কাল সকাল দশটা নাগাদ সেই রহস্যময় মানুষের মুণ্ডুওয়ালা পাহাড়ের কাছে পৌঁছে যাবো আমরা, তারপর শুরু হবে শিকার!'

'তারপর শুরু হবে খোঁজ,' মুখ থেকে পাইপ সরিয়ে সংশোধন করে দিলো লিও। মৃদু হেসে যোগ করলো, 'প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আর অমর জীবনের আগুন।'

'যতোসব পাগলামি, বিকেলে তো হালের ওই লোকটার সঙ্গে আলাপ করছিলে, কি বললো? ব্যবসার কারণে (সম্ভবত দাস ব্যবসা) জীবনের অর্ধেকটা সময় ও আসা যাওয়া করছে এপথে, সেই "মানুষ" পাহাড়ের কাছে নেমেছেও একবার। ধ্বংস হয়ে যাওয়া শহর আর গুহার কথা কখনো শুনেছে ও?'

'না, ও বলছে, পাহাড়ের ওপাশ থেকেই শুরু হয়েছে জলাভূমি, সাপ-খোপের আড্ডা। যতদূর জানি, আফ্রিকার পুরো পূর্ব উপকূল জুড়েই আছে অমন জলাভূমি, তার মানে খুব বেশি চওড়া নয়।'

'ঐ আশাতেই থাকো--ম্যালেরিয়ার বাসা জায়গাটা। ঐ জায়গা সম্পর্কে কি ধারণা ওদের শুনেছো তো? কেউ যেতে রাজি নয় আমাদের সাথে। পাগল ভাবছে আমাদের। সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে হয় ঠিকই ভাবছে ওরা। সাধের ইংলণ্ডে যদি ফিরে যেতে পারি বুঝবো অনেক পুণ্য করেছিলো পূর্বপুরুষেরা। ভেবো না আমার জন্যে বলছি কথাগুলো। আমার যা বয়েস তাতে এখন বাঁচলেই কি আর মরলেই কি? ভাবছি তোমার আর জবের কথা। সত্যি বলছি, বাবা, কাজটা ঠিক হবে।'

'হোক, হোরেস কাকা। এতদূর যখন এসেছি, চেষ্টা আমি করবোই। আরে! মেঘ জমেছে দেখছি!' হাত তুলে ইশারা করলো ও।

সত্যিই তাই, আমাদের কয়েক মাইল পেছনে রাতের ধূসর আকাশের গায়ে কালো কালি লেপে দিয়েছে কে যেন।

'হালের লোকটাকে জিজ্ঞেস করো তো, কি ব্যাপার।'

উঠে এগিয়ে গেল লিও। ফিরে এলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

BanglaBook.org

'ও বলছে, দমকা ঝড় উঠতে পারে, তবে ভয়ের কিছু নাকি নেই, আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে যাবে ঝড়টা।'

এই সময় ওপরে উঠে এলো জব। বাদামী রঙের শিকারির পোশাকে খুবই চৌকস দেখাচ্ছে ওকে। শুধু হ্যাটটা হাস্যকর ভঙ্গিতে ঝুলে আছে মাথার পেছনে।

'আমি, স্যার, পেছনের ঐ তিমি নৌকায় (Whale boat) গিয়ে শুই,' উদ্বিগ্ন গলায় বললো ও। 'আমাদের বন্দুক, গুলি-বারুদ, খাবার দাবার সব ওর ভেতর। ঐ কেলেভূতগুলোর চাউনি,' এখানে খাদে নেমে এলো ওর গলা, 'একদম পছন্দ হচ্ছে না আমার। কেউ যদি ওতে উঠে দড়ি কেটে পালায় কিছু করতে পারবো না আমরা।'

তিমি নৌকাটা আমরা তৈরি করিয়েছিলাম স্কটল্যাণ্ডের ডাণ্ডিতে। কাজে লাগতে পারে ভেবে সঙ্গে এনেছিলাম। যেখানে আমরা নামবো, আফ্রিকা উপকূলের সে জায়গাটা খুব দুর্গম, নানা আকারের ডুবো আধা ডুবো পাহাড়ে ভর্তি। দরকার পড়তে পারে ভেবে এমনিই আমরা সঙ্গে এনেছিলাম ওটা। এখন দেখছি আমাদের ধারণাই সত্যি। ক্যাপ্টেন জানিয়েছে ডুবো পাহাড়ের কারণে ডাঙ তীরের খুব একটা কাছে যেতে পারবে না। তার মানে ঐ তিমি নৌকায় করেই তীরে যেতে হবে আমাদের। চমৎকার জিনিসটা—ত্রিশ ফুট লম্বা, মাঝামাঝি জায়গায় পাল খাটানোর মাস্তুল, তলাটা তামার পাত দিয়ে মোড়া, কয়েকটা জল নিরোধী কুঠুরিও আছে। আজ সকালে ক্যাপ্টেন যখন জানায় কাল বেলা দশটা নাগাদ জায়গা মতো পৌঁছে যাবো, তখনই আমরা আমাদের যাবতীয় জিনিসপত্র বোঝাই করে ফেলি ওতে। কাল সকালে হয়তো সময় পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ এখন যে কোনো মুহূর্তে ছাড়বার জন্যে তৈরি নৌকাটা। সুতরাং জব যা বলেছে ঠিকই বলেছে।

'বেশ, জব,' বললাম আমি। 'প্রচুর কম্বল আছে ওতে। মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়োগে যাও।'

আবার আগের জায়গায় এসে বসলাম আমরা। চমৎকার রাত। বসে বসে গল্প করতে লাগলাম আমি আর লিও। তারপর কখন ঝিমুনি লেগেছে, কখন ঘুমিয়ে গেছি কিছু টের পাইনি।

আচমকা তীব্র বাতাসের গর্জন আর জেগে ওঠা নাবিকদের প্রাণ কাঁপানো চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল আমাদের। জলের ঝাপ্টা চাবুকের মতো এসে লাগছে চোখেমুখে। এক পলক তাকিয়েই বুঝলাম এসে পড়েছে দমকা ঝড়। কয়েকজন নাবিক পাল নামানোর জন্যে ছুটে গেল দড়ি-দড়ার দিকে। কিন্তু তাড়াহুড়োয় আটকে গেল কপিকল। নামলো না পাল। আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে শক্ত করে আঁকড়ে ধরলাম

BanglaBook.org

একটা রশি। মাথার ওপর নিকষ কালো আকাশ। কিন্তু আশ্চর্য, আমাদের সামনেটা এখনো পরিষ্কার, চাঁদ হাসছে।

হঠাৎ খেয়াল করলাম, বিশাল একটা ঢেউয়ের মাথায় চড়ে অনেক উপরে উঠে গেছে তিমি নৌকার কালো অবয়বটা। বিশাল ঢেউটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে ডাউ-এর দিকে। পলকের মধ্যে দেখলাম পুরো দৃশ্যটা। রশি আঁকড়ে ধরলাম আরো শক্ত করে। পরমুহূর্তে নোনা জলের নিচে চাপা পড়ে গেলাম আমি।

ঢেউটা চলে গেল। মনে হলো, না জানি কত মিনিট ধরে ছিলাম পানির নিচে—আসলে কয়েক সেকেণ্ড মাত্র। উপরে তাকিয়ে দেখলাম, ঝড়ের দাপটে ছিঁড়ে খুঁড়ে গেছে বিশাল পালটা। মাস্তুলের মাথায় প্রকাণ্ড এক পাখির ডানার মতো ঝটপটিয়ে চলেছে।

এই সময় শুনলাম জবের চিৎকার, 'এদিকে আসুন, স্যার! নৌকায়!'

পুরোপুরি দিশেহারা অবস্থার ভেতরেও অনুভব করলাম পেছনে ছুটে যেতে হবে আমাকে। বুঝতে পারছি ডুবে যাচ্ছে ডাউ—খোলের বেশিরভাগই পানিতে ভরে গেছে। প্রচণ্ড বাতাসে ভয়ানকভাবে এদিক ওদিক দুলছে তিমি নৌকা। দেখলাম হালের কাছে দাঁড়ানো আরবটা লাফিয়ে পড়লো ওতে। আমিও ছুটে গিয়ে ধরলাম নৌকা বাঁধা রশিটা। সর্বশক্তিতে ডাউ-এর পাশে টেনে আনার চেষ্টা করলাম তিমি নৌকাটাকে। একটু কাছে আসতেই ওতে লাফিয়ে পড়লাম আমি। মাহমুদ তার কোমরের কাছ থেকে বাঁকা একটা ছোরা বের করে কেটে দিলো রশি। এক মুহূর্ত পরে দেখলাম তীব্র ঝড়ের মুখে ছুটে চলেছে তিমি নৌকা, ডাউ-এর কোনো চিহ্ন নেই কোথাও।

'হায়, ঈশ্বর,' ডুকরে উঠলাম আমি। 'লিও কোথায়? লিও! লিও!'

'ভেসে গেছে, স্যার, ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন!' আমার কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করলো জব।

তীব্র আক্ষেপে হাত দুটো মুঠো হয়ে গেল আমার। লিও ডুবে গেছে, আর আমি বেঁচে আছি শোক করার জন্য!

'সাবধান!' হাঁক ছাড়লো জব। 'আরেকটা আসছে!'

মুখ ঘোরাতেই দেখলাম সত্যিই আরেকটা আসছে। ঢেউ! আগেরটার মতোই বিশাল। দ্রুত এগিয়ে আসছে আমাদের ছোট্ট তিমি নৌকার দিকে। অবাক বিস্ময়ে আমি তাকিয়ে রইলাম সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের দিকে। ইতিমধ্যে চাঁদ প্রায় পুরো ঢাকা পড়ে গেছে মেঘের আড়ালে। এখনো যেটুকু বাকি আছে তা থেকে সামান্য আলো এসে পড়েছে বিশাল ঢেউটার ওপর। হঠাৎ মনে হলো কিছু একটা যেন রয়েছে ওটার মাথায়!

এসে পড়েছে ঢেউটা! আর কয়েক গজ। তারপরই উঠে পড়বে নৌকার ওপর।

BanglaBook.org

পরমুহূর্তে জলের পাহাড় হুড়মুড় করে ভেঙে পড়লো আমাদের ওপর। পুরো নৌকা ভর্তি হয়ে গেল পানিতে। কিন্তু বাতাস নিরোধী কুঠুরিগুলোর জন্যে এক সেকেণ্ড পরেই রাজহাঁসের মতো ভেসে উঠলো ওটা। সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম বিক্ষুব্ধ ঢেউয়ের চূড়ায় জমে ওঠা ফেনার আড়াল থেকে সোজা আমার দিকে ধেয়ে আসছে কি যেন। হাত বাড়িয়ে দিলাম আমি। পরমুহূর্তে অন্য একটা হাত আঁকড়ে ধরলো আমার হাত। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করলাম ঢেউয়ের প্রচণ্ড টান। কিন্তু ছাড়লাম না হাতটা। দুসেকেণ্ড পর চলে গেল ঢেউ। আমরা নৌকার ওপর হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'পানি সেচুন, স্যার!' চিৎকার করে উঠলো জব। বলতে বলতে পানি সেচার কাজে লেগে গেছে ও।

কিন্তু আমি ঠিক সে মুহূর্তে শুরু করতে পারলাম না পানি সেচার কাজ। কারণ এইমাত্র যাকে উদ্ধার করেছি তার মুখ দেখতে পেয়েছি অস্পষ্ট চাঁদের আলোয়। নৌকার খোলে আধশোয়া আধভাসা অবস্থায় পড়ে আছে, আর কেউ না, লিও।

'পানি সেচুন! পানি সেচুন!' অবার হাঁক ছাড়লো জব, 'নয়তো ডুবে যাবো আমরা।'

হাতল লাগানো বড় একটা টিনের গামলা নিয়ে পানি সেচতে শুরু করলাম আমি। মাহমুদও একটা পাত্র নিয়ে হাত লাগিয়েছে। সমানে ফুঁসছে সমুদ্র। ফোয়ারার মতো পানির ঝাপটা এসে লাগছে আমাদের চোখে মুখে।

প্রাণপণে পানি সেচে চলেছি আমরা। এক মিনিট! তিন মিনিট! ছয় মিনিট। একটু একটু করে হাল্কা হচ্ছে নৌকা! আর কোনো ঢেউ এলো না আমাদের ওপর। আরো পাঁচ মিনিট কাটলো। নৌকার খোল প্রায় জলশূন্য করে ফেলেছি, এমন সময় ঝড়ের আর্তনাদ ছাপিয়ে শুরু গম্ভীর একটা আওয়াজ ভেসে এলো আমার কানে। সর্বনাশ! ঢেউয়ের গর্জন!

ঠিক সেই মুহূর্তে চাঁদ আবার বেরিয়ে এলো মেঘের আড়াল থেকে। স্নিগ্ধ আলোর বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেল বিক্ষুব্ধ সাগর। সেই আলোয় দেখলাম, আমাদের প্রায় আধমাইল সামনে ফেনার শাদা একটা রেখা। তারপর খানিকটা জায়গা কালো অন্ধকার। তারপর আবার শাদা রেখা। নিঃসন্দেহে সারি বেঁধে এগিয়ে আসছে ঢেউ। ক্রমশ উঁচুগ্রামে উঠছে গর্জনের আওয়াজ।

'হাল ধরো, মাহমুদ!' আরবীতে চিৎকার করে উঠলাম আমি। 'যেভাবেই হোক ফাঁকি দিতে হবে ওগুলোকে।' বলতে বলতে ছোঁ মেরে একটা দাঁড় তুলে নিলাম, জবকেও ইশারা করলাম নিতে।

BanglaBook.org

লাফ দিয়ে পেছনে চলে গেল মাহমুদ। হাল ধরলো। ইতিমধ্যে জবও তুলে নিয়েছে একটা দাঁড়। প্রাণপণে দাঁড় টানছি আমরা। এক মিনিটেরও কম সময়ের ভেতর দেখলাম, এসে গেছে ঢেউয়ের সারি। আমাদের ঠিক সামনে ঢেউয়ের প্রথম সারিটা, বা অথবা ডানদিকের গুলোর চেয়ে একটু ছোট। ঘাড় ফিরিয়ে ওটার দিকে ইশারা করলাম আমি।

'ওখান দিয়ে পার করে নাও, মাহমুদ!' চিৎকার করে বললাম।

অত্যন্ত দক্ষ মাঝি মাহমুদ। নিপুণভাবে পেরিয়ে গেল ঢেউয়ের প্রথম সারিটা। কিন্তু পরেরগুলোকে আর এড়াতে পারলো না। এক সঙ্গে অনেকগুলো ঢেউ—প্রত্যেকটা বিশাল আয়তনের—একের পর এক বয়ে গেল আমাদের ওপর দিয়ে। সে এক অভিজ্ঞতা বটে। আমার শুধু এটুকু মনে আছে, হঠাৎ আবিষ্কার করলাম শাদা ফেনার সমুদ্রে ভাসছি আমরা। ডানে, বাঁয়ে, সামনে, পেছনে, যেদিকে তাকাই শুধু ফেনা আর ফেনা। আর, প্রতি সেকেণ্ডে কতবার করে যে ওপরে উঠেছি আর নিচে নেমেছি বলতে পারবো না।

মাহমুদের দক্ষতার গুণে না ভাগ্যক্রমে জানি না, কিছুই হলো না আমাদের। মিনিট দুয়েক পর হঠাৎ একটা আছাড় খেলো নৌকা, তারপর দেখলাম অপেক্ষাকৃত শান্ত সাগরে ভাসছি আমরা। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খেয়াল করলাম, আধমাইল মতো দূরে আরেক সারি ঢেউ এগিয়ে আসছে। এর মধ্যে আবার জলে ভরে গেছে নৌকার খোল। করণীয় এখন একটাই—আবার প্রাণপণে পানি সেচতে শুরু করলাম আমরা।

ভাগ্য ভালো, ঝড় প্রায় থেমে গেছে। উজ্জ্বল আলো ছড়াচ্ছে চাঁদ। আধ মাইল বা তার কিছু বেশি দূরে একটা পাহাড়ী অন্তরীপ দেখতে পেলাম। দ্বিতীয় ঢেউয়ের সারিটাকে মনে হচ্ছে সেটারই প্রলম্বিত রূপ। সম্ভবত ওখানে একটা ডুবো বা আধা ডুবো পাহাড়ের সারি আছে। তাতে বাধা পেয়েই ঢেউয়ের সারিটা আরো ফেনাময় হয়ে উঠেছে। প্রাণপণে পানি সেচতে সেচতে এসব ভাবছি, এমন সময় পরম স্বস্তির সাথে লক্ষ্য করলাম, চোখ মেলেছে লিও। ওকে চুপ করে শুয়ে থাকতে বললাম, কারণ দ্বিতীয় ঢেউয়ের সারিটা এসে পড়েছে, এ সময় ওঠার চেষ্টা করলে আবার হয়তো ভেসে যাবে ও।

এক মিনিটও পার হয়নি, হঠাৎ চিৎকার করে আল্লাহকে ডাকলো আরবটা, আমিও কায়মনোবাক্যে স্মরণ করলাম ঈশ্বরকে। পরমুহূর্তে আবার ঢেউয়ের ভেতর পড়লাম আমরা। আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হলো এবারও, তবে আগের বারের মতো অত প্রচণ্ড ভাবে নয়। মাহমুদের দক্ষ নৌচালনা আর বায়ুনিরোধী কুঠুরিগুলো বাঁচিয়ে দিলো আমাদের। কয়েক মিনিটের ভেতর খেয়াল করলাম স্রোতের মুখে ভেসে চলেছি আমরা,

সোজা সেই অন্তরীপটার দিকে।

স্রোতের টানে তীরের দিকে আরও একটু এগোলো নৌকা। তারপর আচমকা থেমে গেল প্রায়। নিস্তরঙ্গ শান্ত জল চারপাশে। ডাঙার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, একটা নদীর মুখে এসে পড়েছি আমরা। ঝড় সম্পূর্ণ থেমে গেছে। আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। শান্ত পানিতে ভাসছে নৌকা, গতিহীন। লিও কখন ঘুমিয়ে পড়েছে টের পাইনি কেউ। ভেজা কাপড়গুলো সেঁটে আছে ওর শরীরের সাথে। সামনের গলুইয়ে গিয়ে বসেছে জব, মাহমুদ হাল ধরে আছে, আমি বসে আছি নৌকার মাঝামাঝি, লিওর কাছাকাছি।

রাত প্রায় শেষ। চাঁদ ডুবে গেছে। সাগরের মৃদু কল্লোল ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই প্রকৃতিতে। যতদূর চোখ যায় দৃষ্টি মেলে দিলাম। না, কোনো চিহ্ন নেই ডুবে যাওয়া ডাউ বা তার কোনো ধ্বংসাবশেষের। পুব দিকে চোখ পড়লো, ফর্সা হয়ে উঠছে আকাশ। একটু পরেই সূর্য উঠবে।

পাঁচ

ধীরে ধীরে পরিষ্কার হয়ে এলো চারদিক। রাঙা হয়ে উঠতে শুরু করেছে পুবের আকাশ। মৃদু স্রোতে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছে নৌকা। পাহাড়ী অন্তরীপটার শেষ মাথায় চোখ পড়লো আমার। চমকে উঠলাম সঙ্গে সঙ্গে। অদ্ভুত দর্শন এক চূড়া। একটু আগে ওর পাশ দিয়ে এসেছি আমরা। তখন কিছু দেখতে পাইনি—হয়তো অন্ধকার ছিলো বলে, হয়তো দেখার মতো মানসিক অবস্থায় ছিলাম না বলে। চূড়াটা ওপর দিকে প্রায় আশি ফুট মতো চওড়া, গোড়ার দিকে একশো। দেখতে হুবহু নিগ্রোর মুখের মতো। পৈশাচিক একটা অভিব্যক্তি ফুটে আছে তাতে। দেখলেই গা শিউরে ওঠে। ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম। না চোখের ভুল নয়, নিগ্রোর মুণ্ডুর মতোই—মোটাসোটা ঠোঁট, পুরুষ্টু গাল, থ্যাবড়া নাক, গোল মাথা। সত্যিই ভীষণ অদ্ভুত। এতো অদ্ভুত, যে কিছুতেই আমার বিশ্বাস হলো না, নেহায়েত প্রকৃতির খেয়ালেই তৈরি হয়েছে এমন একটা জিনিস। হয়তো মিসরের স্ফিংসের মতো এটাও তৈরি করেছিলো এ অঞ্চলের প্রাচীন কোনো জাতি। দু'হাজার বছর আগে মিসরের রাজকন্যা, লিওর পূর্বপুরুষ ক্যালিক্রেটিসের স্ত্রী আমেনার্তাস দেখেছিলো এই পৈশাচিক চেহারা, দু'হাজার বছর পরেও যদি কেউ আসে, নিঃসন্দেহে এমনটিই দেখতে পাবে, বদলাবে না কিছুই।

'জব,' ডাকলাম আমি। 'ওদিকে তাকাও, দেখ তো কি ওটা?'

BanglaBook.org

নৌকার এক কোনায় আরাম করে বসে ছিলো জব। ঘাড় ফিরিয়েই বিস্মিত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, 'ও, ঈশ্বর! এ কি?'

ওর চিৎকারে জেগে উঠলো লিও।

'আরে,' অবাক গলায় বললো ও। 'আমার কি হয়েছে?' হাত-পা সব শক্ত মনে হচ্ছে—ডাউ কোথায়? একটু ব্র্যাণ্ডি দাও আমাকে।'

'কপাল ভালো,' বললাম আমি। 'আরো শক্ত হয়ে যাওনি। ডাউটা ডুবে গেছে। ওতে যারা ছিলো তারাও। আমরা চারজনই কেবল রক্ষা পেয়েছি, আর তোমার বেঁচে যাওয়াটা তো রীতিমতো অলৌকিক ঘটনা।' ব্র্যাণ্ডি বের করার জন্যে একটা দেরাজ খুললো জব, এই ফাঁকে আমি লিওর কাছে বর্ণনা করলাম গত রাতের রোমাঞ্চকর ঘটনা।

'এহ্,' অস্ফুট গলায় বললো লিও। 'বড় বাচা বেঁচে গেছি তো!'

ব্র্যাণ্ডি এগিয়ে দিলো জব। নিতে নিতে মুখ তুললো লিও। তরপরই ওর চোখ গেল পাহাড় কুঁদে তৈরি বিশাল নিগ্রোর মাথার দিকে।

'আরে!' চিৎকার করে উঠলো ও, 'ঐ তো সেই ইথিওপিয়ানের মাথা!'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে পুরো ব্যাপারটা সত্যি।'

'উঁহুঁ, ওটা এখানে আছে বলেই সব সত্যি এমন ভাবার কোনো কারণ নেই। আমরা জানি, তোমার বাবা এটা দেখেছিলো। কিন্তু আমেনার্তাসের লেখায় যেটার কথা বলা হয়েছে এটাই যে সেটা তার কি প্রমাণ?'

একটু হাসলো লিও। 'তুমি একটা অবিশ্বাসী ইহুদী, হোরেস কাকা। যাকগে, ব্যাপারটা সত্যি না মিথ্যে বেঁচে থাকলে আমরা দেখবো।'

'ঠিক,' বললাম আমি। 'এখন নামার চেষ্টা করতে হবে। জব, বৈঠা ধরো,' শেষে আরবীতে যোগ করলাম, 'মাহমুদ, নদীর মুখে ঐ বালুচরটার দিকে নৌকা চালাও।'

নদীর মুখটা বিশেষ চওড়া মনে হলো না আমার কাছে, যদিও পাড়ের কাছ দিয়ে জমে থাকা কুয়াশার জন্যে প্রকৃত মাপ বুঝতে পারছি না। ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছি আমরা সেদিকে। ভাগ্য ভালো ভাটা নয় এখন। পূর্ব আফ্রিকার নদীগুলো সম্পর্কে যা শুনেছি তাতে ভাটার সময় জাহাজ তো দূরের কথা নৌকা পর্যন্ত ঢুকতে পারে না নদীতে।

যা হোক, মিনিট বিশেকের ভেতর আমরা পেরিয়ে গেলাম নদী মুখ। আমি আর জব দাঁড় টানছি, বাতাসেরও সাহায্য পাচ্ছি সামান্য। লিও এখনো বেশ দুর্বল, তাই

BanglaBook.org

ওকে বসে থাকতে বলেছি। বেশ খানিকটা উঠে এসেছে সূর্য, কুয়াশাও অনেক পাতলা হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে উষ্ণ হয়ে উঠছে প্রকৃতি। এখন বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চারপাশ। খেয়াল করলাম, প্রায় আধ মাইলের মতো চওড়া হবে নদীর মোহনাটা। পাড়গুলো কাদায় ভর্তি আর সে কাদার ওপর শুয়ে আছে অসংখ্য কুমীর। মনে হচ্ছে বিদঘুটে চেহারার অজস্র কাঠের টুকরো যেন কে ছড়িয়ে রেখেছে।

প্রায় এক মাইল চলে আসার পর পাড়ের কাছে এক জায়গায় এক টুকরো শক্ত জমি দেখতে পেলাম। ওখানে নৌকা ভেড়ালাম আমরা। একটাও কুমীর দেখতে পেলাম না আশপাশে। ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিয়ে নেমে এলাম পাড়ে। গায়ের কাপড় চোপড় এবং নৌকার জিনিসপত্র সব কাল রাতে ভিজে একসা হয়েছিলো। প্রথমেই সেগুলো মেলে দিলাম রোদে শুকানোর জন্যে। তারপর ঝাঁকড়া পাতাওয়ালা একটা গাছের ছায়ায় বসে নাশ্‌তা সেরে নিলাম। নাশ্‌তা শেষ হতে না হতেই দেখলাম শুকিয়ে গেছে কাপড়গুলো। চারপাশটা ঘুরে ফিরে দেখতে হবে এবার।

প্রায় দু'শো গজ চওড়া এবং পাঁচশো গজ লম্বা একটুকরো শুকনো জমির ওপর রয়েছি আমরা। এক দিক দিয়ে বয়ে যাচ্ছে নদী। বাকি তিন দিকে অন্তহীন জনশূন্য জলাভূমি। জলাভূমি এবং নদীর উপরিভাগ থেকে প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচু জায়গাটা। দেখে মনে হয় মানুষের হাতে তৈরি।

'এক কালে বোধহয় জাহাজঘাট ছিলো এখানে,' বললো লিও।

'পাগল,' জবাব দিলাম আমি, 'একে জংলীদের রাজত্ব, তার ওপর এ রকম জলা জায়গা, কোন্ গর্দভ এখনে জাহাজঘাটা বানাবে?'

'হয়তো আগে এখানে এমন জলা ছিলো না, হয়তো এখানকার লোকরা চিরকালই জংলী ছিলো না,' পাড়ের খাড়া ঢালে এক জায়গয় তীক্ষ্ণ চেখে আছিয়ে লিও বললো। 'ওখানে দেখ, পাথর মনে হচ্ছে না?'

'পাগল,' আবার বললাম আমি। বললাম বটে কিন্তু লিওর সঙ্গে সাবধানে নেমে গেলাম জায়গাটায়।

'কি মনে হয়?' জিজ্ঞেস করলো ও।

এবার কোনো জবাব দিতে পারলাম না আমি। কারণ দেখলাম সত্যিই মাটির ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে চৌকো এক খণ্ড পাথর। বেশ বড় এবং শক্ত। ছুরির ডগা দিয়ে খোঁচা মেরে দেখলাম, একটুও দাগ পড়লো না।

'জেটির মতোই তো মনে হচ্ছে, হোরেস কাকা,' উত্তেজিত গলায় বললো লিও। 'বড় বড় জাহাজ ভিড়তো বোধহয়।'

BanglaBook.org

আবার বলতে চেষ্টা করলাম, 'পাগল', কিন্তু কথাটা আটকে গেল গলার কাছে। আমিও এখন বিশ্বাস করতে শুরু করেছি, সত্যিই হয়তো জাহাজঘাট ছিলো এখানে।

গল্পটা তাহলে নেহাত গল্প ছিলো না, হোরেস কাকা,' উত্তেজিত গলায় বললো লিও।

সরাসরি কোনো জবাব দিতে পারলাম না আমি। বললাম, 'আফ্রিকার মতো একটা দেশে এমন আশ্চর্য অনেক কিছুই থাকতে পারে। মিসরীয় সভ্যতার বয়স কত তা কে বলতে পারে? তারপর ব্যাবিলনীয়রা ছিলো, ফিনিসিয়রা ছিলো, ছিলো পার্সিয়ানরা–এদের সবাই কম বেশি সভ্য ছিলো। এদের কারো উপনিবেশ বা বাণিজ্য ঘাঁটি হয়তো ছিলো এখানে, কে বলতে পারে?'

'ঠিক ঠিক। কিন্তু এতক্ষণ তো এ কথা মানতে চাইছিলে না তুমি।'

এ কথার জবাব দেয়া যায় না। কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম আমি। বললাম, 'বেশ, এখন কি করা যায় তাই বলো।'

জানি এই মুহূর্তে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না ও। ধীরে ধীরে জলাভূমির প্রান্তের দিকে এগিয়ে গেলাম আমরা। যতদূর চোখ যায় ধুধু করছে জল–কাদা। মাঝে মধ্যে নানা ধরনের জলজ উদ্ভিদ।। অসংখ্য জলজ পাখিও দেখলাম, একবার উড়ছে একবার বসছে।

'দুটো জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারছি,' আমি বললাম। 'প্রথমত এর ওপর দিয়ে যেতে পারবো না আমরা,' বিস্তৃত জলাভূমির দিকে ইঙ্গিত করলাম, 'আর, দ্বিতীয়ত, এখানে যদি চুপচাপ বসে থাকি, নির্ঘাত অসুখে পড়তে হবে।'

'দিবালোকের মতো পরিষ্কার, স্যার,' বললো জব।

'হুঁ। তার মানে দুটো পথ আছে আমাদের সামনে। একটা, তিমি নৌকা করে কোনো বন্দরের উদ্দেশ্যে পাড়ি জমানো—যদিও খুবই ঝুঁকিপূর্ণ কাজটা। আর অন্যটা, পাল তুলে বা দাঁড় টেনে এই নদী ধরে এগিয়ে যাওয়া এবং অপেক্ষা করা, শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছাই।'

'তোমরা কি করবে না করবে, জানি না,' বললো লিও, 'আমি নদী ধরে এগিয়ে যাচ্ছি।'

হতশাসূচক অস্ফুট একটা ধ্বনি বেরোলো জবের গলা চিরে। আরবটাও বিড়বিড় করে উঠলো, 'আল্লাহ।' আর আমি ভেবে দেখলাম, এই তিরিশ ফুটের তিমি নৌকায় সাগর পাড়ি দেয়ার চেষ্টা করা আর নদী ধরে অজানা পথে এগিয়ে যাওয়া একই কথা। তাছাড়া মুখে স্বীকার না করলেও, ঐ বিশাল নিগ্রোর মাথা আর পাথরের জেটি দেখে

BanglaBook.org

মনে মনে লিওর মতো আমিও উৎসুক হয়ে উঠেছি, রহস্যের শেষ কোথায় দেখতে হবে। তবে ওপরে ওপরে ভাব দেখালাম, লিও যখন যাবেই, আমাদেরকেও যেতে হবে, ওকে তো আর একা ছেড়ে দেয়া যায় না।

সাবধানে নৌকায় মাস্তুল লাগালাম আমরা। রাইফেলগুলো বের করলাম। তারপর রওনা হয়ে গেলাম উজানের দিকে। ভাগ্য ভালো সাগরের দিক থেকে বাতাস আসছে। সহজেই পাল তুলে দিতে পারলাম। বাকি কাজ মাহমুদের। হাল ধরে রইলো সে।

দুপুর নাগাদ প্রচণ্ড হয়ে উঠলো সূর্যের তাপ। ঘেমে নেয়ে অস্থির আমরা। সেই সাথে জলাভূমি থেকে ভেসে আসছে তীব্র দুর্গন্ধ। সাবধান হওয়ার প্রয়োজন বোধ করলাম আমি। তাড়াতাড়ি এক ডোজ করে কুইনাইন গিলিয়ে দিলাম সবাইকে।

একটু পরেই বাতাস পড়ে গেল। দাঁড় টেনে এগোনোর কথা ভুলেও ঠাঁই দিলাম না মনে—একে নৌকাটা বেশ ভারি, তার ওপর এগোতে হবে স্রোতের উল্টোদিকে। সুতরাং আপাতত নৌকা ঘাটে বেঁধে অপেক্ষা করা-ই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সামনে কিছু দূরে একটা খাঁড়ি মতো দেখে সেদিকে দাঁড় টানতে লাগলাম আমরা। নৌকা বাঁধার জন্যে খুব উপযোগী হবে জায়গাটা, সুতরাং দাঁড় টানার এই কষ্টটুকু স্বীকার করে নেয়া যায়। এমন সময় একটা জিনিস দেখে ফিসফিস করে আমাকে ডাকলো লিও। আমি মুখ তুলতেই পাড়ের একটা জায়গার দিকে ইশারা করলো ও।

অসম্ভব সুন্দর একটা মর্দা হরিণ, নদীর কূলে দাঁড়িয়ে পানি খাচ্ছে। সামনের দিকে বাঁকানো বিরাট শিং। মেরুদণ্ডের শেষ প্রান্তে শাদা একটা ডোরা। নিঃশব্দে এক্সপ্রেস রাইফেলটা দিলাম লিওর হাতে, আমিও তুলে নিলাম আমারটা। ফিসফিস করে বললাম, 'ফস্কায় না যেন।'

'ফস্কাবে! মাথা খারাপ!'

রাইফেল উঁচু করলো লিও। ইতিমধ্যে পানি খাওয়া শেষ করে মাথা তুলেছে হরিণটা।

গুড়ুম! ঘুরে দাঁড়িয়েই ছুটলো হরিণ। লাগাতে পারেনি লিও। গুড়ুম! এবার আমি, লক্ষ্যবস্তু ছুটন্ত। একলাফ দিয়ে মুখ থুবড়ে পড়লো হরিণটা।

'তোমার চোখে বোধহয় ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছিলাম, কি বলো, লিও বাবু?' বেশ একটু আত্মতুষ্টির ভঙ্গিতে বললাম আমি।

'সে-রকমই মনে হচ্ছে,' গরগরিয়ে উঠলো লিও। তারপর একটু হেসে যোগ করলো, 'স্বীকার করছি, হোরেস কাকা, টিপটা তোমার চমৎকার হয়েছে, আর

BanglaBook.org

গ্রামারটা একেবারে জঘন্য।'

ঝপটপট নৌকা তীরে ভিড়িয়ে আমরা ছুটলাম হরিণটার দিকে। মোক্ষম লেগেছে গুলি, সঙ্গে সঙ্গে শেষ। পনেরো মিনিট বা কিছু বেশি সময় লাগলো ওটার চামড়া ছাড়িয়ে, নাড়ীভুঁড়ি ফেলে নৌকায় এনে তুলতে। তারপর আবার রওনা হলাম পশ্চিম দিকে।

ছোটখাটো একটা হ্রদের মতো জায়গাটা। এর মাঝামাঝি জায়গায় নোঙর ফেললাম আমরা। জলাভূমির বিষাক্ত গ্যাসের ভয়ে তীরের কাছে যাওয়ার সাহস পেলাম না। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে ঘুমানোর আয়োজন করতে লাগলাম আমরা।

সবেমাত্র কম্বল টেনে নিয়েছি গায়ে, এমন সময় টের পেলাম, হাজার হাজার রক্ত পিপাসু একগুঁয়ে মশা আক্রমণ চালিয়েছে আমাদের ওপর। ইয়া বড় বড় একেকটা। তাড়াতাড়ি কম্বল টেনে দিলাম মাথার ওপর।

মশার একটানা গুঞ্জন ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। হঠাৎ সিংহের গম্ভীর গর্জনে কেঁপে উঠলো চারদিক! তারপর আবার। এবার বোধহয় আরেকটা।

'ভাগ্য ভালো, তীরের কাছে নোঙর ফেলিনি,' কম্বলের নিচ থেকে মাথা বের করে বললো লিও। 'উঁহুঁ, মর, শালা! আমার নাকে একটা কামড় বসিয়ে দিয়েছে!' আবার অদৃশ্য হয়ে গেল ওর মাথা।

কিছুক্ষণ পর চাঁদ উঠলো। একটু পরপরই নানা রকম গর্জনের শব্দ ভেসে আসছে কানে। তীর থেকে দূরে নিরাপদে আছি ভেবে নিশ্চিন্ত মনে শুয়ে রইলাম আমরা।

কি কারণে জানি না—কম্বলের নিচে থাকা সত্ত্বেও মশার কামড় থেকে নিস্তার পাচ্ছি না বলেই হয়তো, মাথা বের করলাম। সঙ্গে সঙ্গে শুনলাম জবের ফিস্ ফিসে গলাঃ

'হায় হায়, দেখুন, স্যার!'

আমরা সবাই দেখলাম, দুটো প্রশস্ত বৃত্ত—ক্রমশ আরো প্রশস্ত হতে হতে এগিয়ে আসছে নৌকার দিকে।

'কি?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ঐ সিংহগুলো স্যার,' স্পষ্ট আতঙ্ক ওর গলায়। 'আমাদের দিকে আসছে।'

আবার ভালো করে দেখলাম। না কোনো সন্দেহ নেই, সিংহ। ওদের জ্বলজ্বলে হিংস্র চোখ দেখতে পাচ্ছি। হরিণের মাংস অথবা আমাদের গন্ধ পেয়ে এগিয়ে আসছে ক্ষুধার্ত জন্তুগুলো।

এর ভেতরে লাফিয়ে উঠে রাইফেল তুলে নিয়েছে লিও। আমি ওকে অপেক্ষা

BanglaBook.org

করতে বললাম, আগে আরো কাছে আসুক। আমাদের থেকে ফুট পনেরো দূরে একটা চরা মতো। পানির উপরিভাগ থেকে ইঞ্চি পনেরো নিচে। প্রথম সিংহটা ওটার ওপর উঠে গা ঝাড়া দিয়ে পানি সরালো। তারপর মুখ হাঁ করে গর্জে উঠলো। ঠিক সেই মুহূর্তে গুলি করলো লিও। সিংহটার খোলা মুখের ভেতর দিয়ে ঢুকে ঘাড়ের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেট। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল ওটা। অন্য সিংহটা পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ। সবেমাত্র সামনের থাবা দুটো চরায় ঠেকিয়েছে সে; এমন সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটলো। তীব্র আলোড়ন উঠলো পানিতে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পেছন দিকে তাকালো সিংহটা। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে গর্জন করে দ্বিতীয় এক লাফে উঠে পড়লো চরে। কালো কি একটা যেন আটকে আছে তার পায়ে।

'আল্লাহ্!' চিৎকার করে উঠলো মাহমুদ, 'কুমীরে ধরেছে ওটাকে!'

এর পর যে দৃশ্য দেখলাম তাকে শুধু অসাধারণ বললে কম বলা হয়। সিংহটা চরে উঠে পড়তে পেরেছে আর কুমীরটা আধ দাঁড়ানো আধ সাঁতরানো অবস্থায় বেচারার পেছনের পা কামড়ে ধরে সমানে পেছনে টেনে চলেছে। হিংস্রভাবে গর্জন করে চলেছে সিংহটা, সেই সাথে টানা-হ্যাঁচড়া করে ছাড়াতে চেষ্টা করছে পা। হঠাৎ সিংহের হিংস্র একটা থাবা গিয়ে পড়লো কুমীরটার মাথায়। পা ছেড়ে দিয়ে খপ করে সিংহের কোমরের কাছটা কামড়ে ধরলো কুমীর। এই ফাঁকে সিংহও কামড়ে ধরতে পেরেছে কুমীরের গলা। তারপর শুরু হলো আসল ধস্তাধস্তি। সিংহের কোমর দুই চোয়ালের ফাঁকে আটকে ধরে ভয়ানকভাবে এপাশে ওপাশে ঝাঁকাচ্ছে কুমীর। আর তাকে আঁচড়ে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে চেষ্টা করছে সিংহ।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই দুর্বল হয়ে পড়লো সিংহটা। আচমকা এক ঝাঁকুনিতে কুমীরের পিঠের ওপর গিয়ে পড়লো ওর মাথা। তারপর শেষ একটা আর্তনাদ করে নিস্পন্দ হয়ে গেল বেচারা। মিনিটখানেক স্থির হয়ে রইলো কুমীর। তারপর ধীরে ধীরে এক গড়ান দিয়ে চিৎ হয়ে গেল। সিংহের ক্ষতবিক্ষত শরীরটা এখনো আটকে আছে তার চোয়ালে। দু'জনেই মরণ পণ করে লড়েছে, মরেছে দু'জনেই।

চারপাশ আবার নিথর নীরব। একটানা মশার গুঞ্জনই কেবল শোনা যাচ্ছে। আবার কখন কি বিপদ উপস্থিত হয়, ঠিক নেই। মাহমুদকে পাহারায় রেখে শুয়ে পড়লাম আমরা।

BanglaBook.org

পরদিন, ভোরের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম আমরা। খেয়াল করলাম, সাগরের দিক থেকে বাতাস বইতে শুরু করেছে আবার। এখন দেরি করা অর্থহীন। বিছানাপত্র গোছগাছ করে নাশতা সেরে নিয়ে পাল তুলে দিলাম। নদীর ওপর দিয়ে এগিয়ে চললাম অজানার দিকে।

কালকের মতো আজও বাতাস পরে গেল দুপুরের পর। ভাগ্য ভালো, বেশি খোঁজাখুঁজি ছাড়াই নদীর পাড়ে একটা শুকনো জায়গা পেয়ে গেলাম। নৌকা ভিড়িয়ে তীরে নামলাম আমরা। আগুন জ্বাললাম। দুটো বুনো হাঁস এবং খানিকটা হরিণের মাংস রান্না করে খাওয়া হলো। হরিণের বাকি মাংসটুকু সরু, লম্বা ফালি করে কেটে শুকাতে দিলাম। পরদিন সকাল পর্যন্ত এ জায়গায় কাটালাম আমরা। একমাত্র মশা ছাড়া আর কোনো হিংস্র প্রাণীর উপদ্রব পোহাতে হলো না। একই ভাবে কাটলো পরের দু'তিনটি দিন।

পঞ্চম দিন নাগাদ উপকূল থেকে প্রায় একশো পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ মাইল মতো পশ্চিমে চলে আসতে পারলাম আমরা। এদিন সকাল এগারোটা বাজতে না বাজতেই স্তব্ধ হয়ে গেল বাতাস। দাঁড় টেনে কিছুদূর এগোনোর পর থামতে বাধ্য হলাম আমরা। নদী এবং প্রায় পঞ্চাশ ফুট চওড়া একটা জলস্রোতের সঙ্গমস্থলে এসে পড়েছি। যতদূর চোখ যায় একই রকম চওড়া হয়ে এগিয়ে গেছে নতুন জলস্রোতটা। পাড়ের ঠিক ওপরেই বেশ কিছু বড় গাছ। আগেও যত গাছ দেখেছি, বেশির ভাগই পাড়ের কাছাকাছি শক্ত জমিতে, এখানেও তাই। গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে নদীর শক্ত পার ধরে এগিয়ে গেলাম জায়গাটার অবস্থা দেখার উদ্দেশ্যে। খাওয়ার জন্যে কয়েকটা পাখি শিকার করলাম। পঞ্চাশ গজ যাওয়ার আগেই বুঝে ফেললাম, নদী ধরে আর এগোনোর আশা নেই। যেখানে এখন দাঁড়িয়ে আছি এর দুশো গজ পর থেকেই শুরু হয়েছে অগভীর কাদার রাজত্ব। পানির পরিমাণ ছ'ইঞ্চিও হবে কিনা সন্দেহ।

এবার অন্য জলস্রোতটার পাড় ধরে এগোলাম আমরা। নানা আলামত দেখে কিছুক্ষণের ভেতর বুঝতে পারলাম, আসলে এটা প্রাচীন একটা খাল। নিঃসন্দেহে দূর অতীতের কোনো মানবগোষ্ঠী কেটেছিলো এই খাল। অস্বাভাবিক উঁচু পাড়গুলো দেখলে মনে হয় গুণ টানার সুবিধার জন্যে তৈরি করা হয়েছিলো।

খালে পানি যথেষ্ট গভীর, তবে স্রোত প্রায় নেই বললেই চলে। নদী ধরে এগোনোর

BanglaBook.org

প্রশ্ন ওঠে না, আমরা যদি আরো এগোতে চাই, এই খাল ধরেই এগোতে হবে। সবাইকে বললাম কথাটা। শেষে যোগ করলাম, 'আমার মনে হয়, চেষ্টা করা উচিত, কি বলো?'

আমি ফিরে যাওয়ার বদলে এগিয়ে যেতে চাইছি শুনে ঠোঁট বেঁকিয়ে একটু হাসলো লিও। অন্য দু'জন মৃদু গজ গজ করলো। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রাজি হলো ওরাও।

সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়ার পরও অনুকূল বাতাসের পাত্তা পাওয়া গেল না। এদিকে অপেক্ষা করতেও আর ইচ্ছে করছে না। অতএব রওনা হলাম আমরা। প্রচণ্ড পরিশ্রম করে প্রথম ঘন্টাখানেক দাঁড় টেনে এগোনো গেল। তারপরই জলজ আগাছা এত ঘন হয়ে উঠলো যে, তার ভেতর দিয়ে নৌকা এগিয়ে নেয়া অসম্ভব মনে হলো। অবশেষে নৌকা চালানোর প্রাচীনতম পদ্ধতি–গুণ টানার আশ্রয় নিতে হলো আমাদের। দু'ঘন্টা একটানা টেনে চললাম আমরা–আমি, জব আর মাহমুদ। লিও রইলো নৌকার আগ গলুইয়ে। মাহমুদের তলোয়ার দিয়ে যথাসম্ভব কেটে দিতে লাগলো আগাছা।

সন্ধ্যার পর কয়েক ঘন্টার জন্যে বিশ্রাম। তারপর আবার গুণ টেনে চলা। ভোর বেলায় আবার ঘন্টা তিনেকের বিশ্রাম, তারপর আবার চলা। সকাল দশটার দিকে আচমকা ঝড় উঠলো, সেই সাথে বৃষ্টি মুষলধারে। এবং সত্যি বলতে কি, পরবর্তী ছয় ঘন্টা আমরা কাটালাম জলের নিচে।

পরের চারটে দিন কিভাবে কাটলো তার বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এটুকু বলতে পারি, জীবনে এত কষ্ট কখনো করিনি। একঘেয়ে কঠোর পরিশ্রম, গরম, মশা, দুর্গন্ধ–সব মিলিয়ে দুর্দশার চূড়ান্ত। খালে ঢোকার তৃতীয় দিনে দূরে একটা গোল মতো পাহাড় দেখতে পেলাম। বিশাল বিস্তৃত জলাভূমির ভেতর থেকে হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে যেন। চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় যখন বিশ্রামের জন্যে থামলাম তখন মনে হলো, এখনও পঁচিশ কি তিরিশ মাইল দূরে রয়েছে পাহাড়টা। ইতিমধ্যে ক্লান্তির শেষসীমায় পৌঁছে গেছি আমরা। নৌকা টানা দূরে থাক, টিন থেকে যে খাবার বের করে খাবো সে শক্তিটাও নেই। ইচ্ছেও করছে না। মৃত্যুর জন্যে মনে মনে প্রস্তুত হয়ে গেছি যেন। বসে বসে ঝিমোতে লাগলাম সব ক'জন।

আচমকা কেন জানি না–কোনো শব্দ শুনে বা অন্য কোনো কারণেও হতে পারে, চোখ মেলে তাকালাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে রক্ত হিম হয়ে গেল! বিরাট বিরাট দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে আমার মুখের ওপর। তীব্র এক চিৎকার করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। আমার চিৎকার শুনে লিও, জব, আর মাহমুদও ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। ক্লান্তি এবং আতঙ্কে টলছে ওরা। তারপরই হঠাৎ দেখা গেল শীতল ইস্পাতের ঝলকানি।

BanglaBook.org

বিরাট একটা বল্লমের ফলা এসে ঠেকেছে আমার গলায়। পেছনে আরো অনেকগুলো জ্বলজ্বলে ফলা, যেন ক্রূর চোখে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

'শান্ত হও,' আরবীতে নির্দেশ দিলো একটা কণ্ঠস্বর। 'তোমরা কারা? কোত্থেকে এসেছো? বলো, না হলে মরবে।' বল্লমের ফলা আর একটু চেপে বসলো আমার গলায়।

'আমরা দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছি, ভ্রমণকারী,' আরবীতে জবাব দিলাম আমি। 'পথ ভুলে এখানে এসে পড়েছি।'

আমার কথা বোধহয় বুঝতে পারলো লোকটা। ঘাড় ফিরিয়ে পাড়ে দাঁড়ানো কারো কাছে নির্দেশ চাইলো, 'মেরে ফেলবো, পিতা?'

'রং কেমন লোকগুলোর?' জিজ্ঞেস করলো ভারি একটা গলা।

'শাদা।'

'মেরো না। চার সূর্য আগে নির্দেশ এসেছে "সে-যাকে-মানতেই-হবে'র" কাছ থেকেঃ "শাদা মানুষরা আসবে, যদি আসে, মেরো না ওদের।" "সে-যাকে-মানতেই-হবে'র" কাছে নিয়ে যেতে হবে এদের। মানুষগুলোকে আগে নিয়ে চলো। ওদের সাথে যে সব জিনিস আছে পরে সেগুলোও নিতে হবে।'

'চলো!' হাঁক ছাড়লো বল্লমধারী। আম নড়ার আগেই সে খপ করে আমার হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে নামাতে লাগলো নৌকা থেকে। অন্য কয়েকজন একই আচরণ করলো আমার সঙ্গীদের সাথে।

পাড়ে নেমে দেখলাম জনা পঞ্চাশেক লোক জড়ো হয়েছে। সবকজনই দীর্ঘদেহী। পেশিবহুল শরীর। কোমরের কাছে এক টুকরো করে চিতার চামড়া জড়ানো, ও ছাড়া পুরো শরীর উলঙ্গ। প্রত্যেকেরই হাতে বিশাল বল্লম।

জব এবং লিওকে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে আসা হলো আমার পাশে।

'ব্যাপার কি? কিছুই তো বুঝতে পারছি না,' চোখ ডলতে ডলতে বললো লিও।

'কি আশ্চর্য! এ কি কাণ্ড…,' শুরু করলো জব। এমন সময় একটা হৈ-চৈ শোনা গেল পেছনে। হোঁচট খেতে খেতে আমাদের মাঝে এসে পড়লো মাহমুদ। পেছনে উদ্যত বল্লম হাতে অস্পষ্ট একটা ছায়ামূর্তি।

'আল্লাহ্! আল্লাহ্!' হাউ-মাউ করে উঠলো মাহমুদ। 'বাঁচাও আমাকে! বাঁচাও আমাকে!'

একটা কালো-ও আছে, পিতা,' বললো একজন। "সে-যাকে-মানতেই-হবে" কি বলেছেন এর সম্পর্কে?'

'কিছু না, কিন্তু মেরো না ওকে। তুমি এদিকে এসো।'

BanglaBook.org

এগিয়ে গেল লোকটা। দীর্ঘদেহী ছায়ামূর্তি ঝুঁকে কি যেন বললো ফিসফিস করে।

'হ্যাঁ–হ্যাঁ,' বললো অন্যজন, তারপর হেসে উঠলো রক্ত হিম করা এক স্বরে।

'শাদা তিন জন আছে ওখানে?' জিজ্ঞেস করলো ছায়ামূর্তি।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে যাও, ওদের নেয়ার জন্যে যেগুলো আনা হয়েছে সেগুলো নিয়ে এসো। আর কয়েক জনকে বলো ঐ ভেসে থাকা জিনিসটায় যা–যা আছে সব নিয়ে আসুক।'

তার কথা শেষ হতেই কয়েকজন লোক ঘাড়ে করে যে জিনিসগুলো নিয়ে এলো সেগুলোকে পাল্‌কি ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই। প্রতিটার জন্যে চারজন করে বাহক আর অতিরিক্ত দু'জন –এই দু'জন সম্ভবতঃ বদলি বাহক বা প্রহরী হিসেবে কাজ করবে। যথেষ্ট স্বস্তি বোধ করলাম মনে মনে। যাক হেঁটে যেতে হবে না তাহলে। লিও তো বলেই বসলো–অবশ্য ইংরেজিতে, 'এতদূর নিজেরা এসেছি, এবার নিয়ে চলো, বাবারা।' শত বিপদের মাঝেও বেশ উৎফুল্ল থাকতে পারে ও।

প্রতিবাদ করা অর্থহীন, অতএব একেকজন একেকটা পাল্‌কিতে চড়ে বসলাম। তারপর শুরু হলো যাত্রা। ঘাসের আঁশ থেকে তৈরি এক ধরনের কাপড়ে ছাওয়া পাল্‌কির ভেতরটাঃ বেশ আরামদায়ক। সেই সাথে বাহকদের হাঁটার ছন্দে এক লয়ে দুলছে পাল্‌কি। কিছুক্ষণের ভেতর গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম আমি।

ঘুম যখন ভাঙলো তখন বেশ উপরে উঠে এসেছে সূর্য। ঘন্টায় প্রায় চার মাইল বেগে ছুটে চলেছে বাহকরা। পাল্‌কির মিহি পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়লাম। জলাভূমির রাজত্ব শেষ। ঘাসে ছাওয়া সমভূমির ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে বাহকরা। সামনে পেয়ালার মতো দেখতে একটা পাহাড়। ওটার দিকেই নিয়ে যাচ্ছে আমাদের। খালের পাড় থেকে আমরা যেটা দেখেছিলাম এটা সেই পাহাড়টাই কি না জানি না। পরে অনেক চেষ্টা করেও এ সম্পর্কে কোনো তথ্য আদায় করতে পারিনি স্থানীয়দের কাছ থেকে।

যাহোক, এবার আমি চোখ ফেরালাম আমার বাহকদের দিকে। চমৎকার স্বাস্থ্য, বোধহয় কারো উচ্চতাই ছ'ফুটের নিচে নয়। হলদেটে গায়ের রং। চেহারা–ছবি যথেষ্ট ভালো। দাঁতগুলো সুন্দর, ঝকঝকে মুক্তার মতো। কিন্তু যে জিনিসটা বিশেষ ভাবে আমার মনে দাগ কাটলো তা ওদের সৌন্দর্য নয়, ওদের মুখে সেঁটে থাকা শীতল নিষ্ঠুর অভিব্যক্তি। আর একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম, হাসতে জানে না এরা। পাল্‌কি বইতে বইতে মাঝে মাঝে একঘেয়ে সুরে গান গাইছে। কিন্তু গান শেষ হওয়া মাত্র সবাই চুপ—রাম গরুড়ের ছানা।

BanglaBook.org

এসব কথা ভাবছি আর চারপাশের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করছি, এই সময় আরেকটা পাল্‌কি চলে এলো আমারটার পাশে। তার চারদিকের পর্দা ওঠানো। শাদা টিলা আলখাল্লা পরা এক বৃদ্ধ বসে আছে ওতে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম, কাল রাতে এই লোককেই 'পিতা' বলে সম্বোধন করা হচ্ছিলো। অদ্ভুত চেহারা বৃদ্ধের। তুষারের মতো শাদা দাড়ি—এত লম্বা যে পাল্‌কির পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে; বাঁকানো নাক, সাপের মতো তীক্ষ্ণ এক জোড়া চোখ, অদ্ভুত বুদ্ধিদীপ্ত অথচ কৌতুকের দৃষ্টি তাতে।

'জেগে আছো নাকি, বিদেশী?' ভারি অথচ নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো সে।

'নিশ্চয়ই, পিতা,' বিনীত ভাবে জবাব দিলাম আমি।

শ্বেত-শুভ্র দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে মৃদু হাসলো বৃদ্ধ। 'কোন্ দেশ থেকে এসেছো তোমরা? নিশ্চয়ই এমন কোথাও থেকে, যেখানে আমাদের ভাষা একেবারে অজানা নয়।' পরের বাক্যটা নিজেকেই যেন শোনালো বৃদ্ধ। 'স্মরণাতীত কাল থেকে যে দেশে মানুষের পা পড়েনি সে দেশে কিসের আশায় এসেছো তোমরা? জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা এসে গেছে?'

'অজানাকে জানার জন্যে এসেছি আমরা,' দৃঢ় গলায় বললাম আমি। 'সাগর পাড়ি দিয়ে আমরা এসেছি যদি নতুন কিছু আবিষ্কার করা যায় এই আশায়। একটা কথা আপনাকে বলতে চাই, পিতা, সাহসী জাত আমরা, মৃত্যুকে ভয় পাই না।'

'হুম্!' বললো বৃদ্ধ, 'যুক্তি আছে তোমার কথায়, নয়তো বলতাম তুমি মিথ্যে বলছো। যাহোক, আমার মনে হয় "সে-যাকে-মানতেই-হবে" মেটাতে পারবেন তোমার এই নতুনকে জানার তৃষ্ণা।'

"সে-যাকে-মানতেই-হবে"! কে সে?'

বাহকদের দিকে চকিতে একবার তাকালো বৃদ্ধ। 'অপেক্ষা করো, সময় হলেই জানতে পারবে, অবশ্য তিনি যদি সশরীরে দেখা দেন।'

'সশরীরে? কি বলতে চাইছেন, পিতা?'

কোনো জবাব না দিয়ে হাসলো বৃদ্ধ, ভয়ঙ্কর হাসি।

'আপনাদের জাতির নাম কি, পিতা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আমাহ্যাগার, মানে পাহাড়ের লোক।'

'বেআদবি নেবেন না, আপনার নাম কি, পিতা?'

'বিলালি।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

BanglaBook.org

'সময় হলেই দেখবে।' বাহকদের কি একটা ইশারা করলো বৃদ্ধ। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ওরা তার পাল্‌কি নিয়ে।

এরপর আর তেমন কিছু ঘটলো না। পাল্‌কির দুলুনিতে আবার যে কখন ঘুমিয়ে গেলাম টের পেলাম না। যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলাম, আগ্নেয়গিরির লাভায় তৈরি সঙ্কীর্ণ একটা পাথুরে গিরিপথ দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা।

একটু পরেই মোড় নিলো গিরিপথটা। সঙ্গে সঙ্গে অপূর্ব একটা দৃশ্য ভেসে উঠলো চোখের সামনে। বিশাল একটা সবুজ পেয়ালা যেন পড়ে আছে মাটিতে। চার থেকে ছ'মাইল হবে বিস্তৃতি। অনেকটা প্রাচীন রোমের অ্যাম্ফিথিয়েটারের মতো দেখতে। ধারগুলো পাহাড়ী। এখানে ওখানে ঝোপঝাড়। সবচেয়ে অপূর্ব এর মাঝখানটা। চমৎকার সবুজ ঘাসে ছাওয়া। ছাগল এবং অন্যান্য গৃহপালিত পশুর পাল চরে বেড়াচ্ছে। তবে কোনো ভেড়া দেখলাম না। অদ্ভুত জায়গাটা কি হতে পারে প্রথমে ভেবে পেলাম না। পরে মনে হলো, প্রাচীন কোনো আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ হয়তো। আগ্নেয়গিরিটা মরে যাওয়ার পর এই চেহারা নিয়েছে। যা দেখে সবচেয়ে আশ্চর্য হলাম তা হলো, পশুর পালগুলো চরিয়ে বেড়াচ্ছে মানুষে, কিন্তু আশপাশে কোনো লোকবসতি নেই। তাহলে থাকে কোথায় এরা?

বাঁ দিকে একটা মোড় নিয়ে প্রায় আধ মাইল এগোনোর পর থামলো পাল্‌কির সারি। বিলালি নেমে পড়লো তার পাল্‌কি থেকে। দেখাদেখি আমিও নামলাম। লিও আর জবও। প্রথমেই খেয়াল করলাম, আমাদের আরব সঙ্গী মাহমুদের দুরবস্থা। পুরো পথ বাহকদের সাথে দৌড়ে আসতে হয়েছে তাকে। ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে বেচারা।

বিরাট একটা গুহার মুখে একটা বেদী মতো জায়গায় থেমেছি আমরা। সামনে স্তূপ করে রাখা আমাদের জিনিসপত্র, এমন কি নৌকার পাল এবং দাঁড়গুলো পর্যন্ত।

গুহা মুখটা ঘিরে দাঁড়িয়েছে আমাদের পাল্‌কিবাহক লোকগুলো। একই রকম স্বাস্থ্যবান অন্য লোকও দেখলাম সেখানে। কয়েকজন মহিলাও আছে ওদের ভেতর। এই লোকগুলো চিতার চামড়ার বদলে পরেছে লাল হরিণের চামড়া। পুরুষদের মতো মেয়েগুলোও দেখতে খুব সুন্দরী। বড় বড় কালো চোখ, সুন্দর মুখ, মাথা ভর্তি ঘন চুল—নিগ্রোদের মতো কোঁকড়া নয় মোটেই। দু'এক জন—যদিও সংখ্যায় খুব কম—বিলালির মতো হলদেটে এক ধরনের লিনেনের কাপড় পরেছে। পরে জেনেছিলাম এটা আভিজাত্যের প্রতীক। মেয়েগুলোর মুখের ভাব পুরুষদের মতো অমন নিষ্ঠুর নয়।

আমাদের দেখেই কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে এলো মেয়েগুলো। সবারই মনোযোগ লিওর দিকে। ওর দীর্ঘ পেটা শরীর আর গ্রীক ধাঁচের চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে

BanglaBook.org

সবাই। যখন হ্যাট খুলে নম্রভাবে অভিবাদন জানালো, তখন ওর সোনালী চুল দেখে রীতিমতো একটা গুঞ্জন উঠলো মেয়েগুলোর ভেতর। এখানেই শেষ হলো না ব্যাপারটা। ওদের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটা এগিয়ে এলো আস্তে আস্তে। লিনেনের আলখাল্লা দুলছে তার হাঁটার ছন্দে ছন্দে। দাঁড়িয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভালো করে দেখলো সে লিওকে। তারপর গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো ওর ঠোঁটে।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল আমার, নিশ্চয়ই এখুনি বল্লম দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেয়া হবে লিওকে। কিন্তু না, তেমন কিছু ঘটলো না। লিও অবাক চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো মেয়েটার দিকে, তারপর সেও মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলো।

আবার শ্বাস বন্ধ হয়ে এলো আমার। এবার কিছু ঘটবেই। কিন্তু আশ্চর্য, কম বয়েসী মেয়েদের মুখে বিরক্তির ছাপ পড়লো একটু, বয়স্করা মৃদু হাসলো। ব্যস, আর কিছু না। এই মানুষগুলোর রীতি নীতি সম্পর্কে যখন জানলাম তখন বুঝতে পারলাম এর কারণ।

আমাহ্যাগার সম্প্রদায়ের ভেতর নারী এবং পুরুষে কোনো পার্থক্য নেই। বরং নারীরা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে। মায়ের পরিচয়ে সন্তানরা পরিচিত হয়; যদিও গোত্রের প্রধান একজন পুরুষ, এবং তাকে নির্বাচিত করা হয়। গোত্র প্রধানের উপাধি 'পিতা'। যেমন, প্রায় সাত হাজার মানুষের এই গোত্রের পিতা বিলালি। বিয়ের ব্যাপারেও এখানকার মেয়েরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। কোনো পুরুষকে পছন্দ হলে সবার সামনে আলিঙ্গন করে মেয়েটা তার মনের ইচ্ছা প্রকাশ করে। পুরুষটা যদি পাল্টা আলিঙ্গন করে তাহলে বুঝতে হবে সে তাকে গ্রহণ করলো। ঠিক এই ব্যাপারটাই ঘটেছে ঐ মেয়েটা—যার নাম উস্তেন—আর লিওর মধ্যে।

সাত

চুম্বনপর্ব শেষ হওয়ার পর এগিয়ে এলো বৃদ্ধ বিলালি। আমাদের দিকে তাকিয়ে আন্তরিক ভঙ্গিতে গুহায় ঢোকার ইশারা করলো। এই ফাঁকে বলে রাখি, উপস্থিত যুবতীদের একজনও আমার প্রতি কোনো আগ্রহ দেখায়নি। এমন কি জবের আশপাশেও ঘুর ঘুর করতে দেখলাম একজনকে, কিন্তু আমার দিকে ফিরেও তাকালো না কেউ।

উস্তেনের পেছন পেছন ভেতরে ঢুকলাম আমরা। এবং পাঁচ কদম যাওয়ার আগেই, আমার মনে হলো, গুহাটা প্রাকৃতিক নয়, মানুষের তৈরি। লম্বায় হবে প্রায় একশো ফুট,

BanglaBook.org

চওড়ায় পঞ্চাশ। অনেক উঁচু। এই মূল গুহার গায়ে প্রতি বারো বা পনেরো ফুট পরপর একেকটা ছোট পথ, সম্ভবত ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে গিয়ে ঢুকেছে। গুহামুখ থেকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট ভেতরে একটা আগুন জ্বলছে। তার চারপাশে পাতা রয়েছে পশুর ছাল। এখানে থামলো বিলালি। বসতে বললো আমাদের। জানালো, ওর লোকরা খাবার নিয়ে আসবে এক্ষুণি।

আমরা বসলাম। সত্যিই একটু পরে খাবার নিয়ে এলো মেয়েরা। সেদ্ধ ছাগলের মাংস, বড় একটা মাটির পাত্র ভর্তি সদ্য দোয়ানো দুধ এবং এক ধরনের শস্যের সেদ্ধ পিণ্ড। খিদেয় পেট চোঁ-চোঁ করছিলো, মহানন্দে খেলাম আমরা।

খাওয়া শেষে উঠে দাঁড়ালো বিলালি। ভাষণ দিলো আমাদের উদ্দেশ্যে। সে জানালো, আমাদের এ পর্যন্ত আসাটা অদ্ভুত এক ব্যাপার। পাহাড়ের লোকদের দেশে শ্বেতাঙ্গ আগন্তুক আসবে এমন কথা কেউ কোনো দিন শোনেনি, কল্পনা পর্যন্ত করেনি। মাঝে মাঝে কালো মানুষরা আসে এখানে, তাদের কাছে ওরা শুনেছে, দুনিয়াতে শাদা মানুষ আছে, জাহাজে পাল তুলে দিয়ে তারা সাগরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু তারা যে এখানে এসে পড়বে তা কেউ ভাবেনি। আমরা যখন খালের ভেতর দিয়ে নৌকা টেনে আনছি তখনই ওর লোকরা দেখে আমাদের। খোলাখুলি জানালো বিলালি, সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের ধ্বংস করার নির্দেশ দিয়েছিলো। কারণ কোনো বিদেশীর এখানে ঢোকা বেআইনী। "সে-যাকে-মানতেই-হবে'র" কাছ থেকে নির্দেশ আসাতেই শুধু আমাদের না মেরে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে।

এ পর্যন্ত শোনার পর বাধা দিলাম আমি। বললাম, 'ক্ষমা করবেন, পিতা, আমি যতটুকু বুঝতে পেরেছি, আপনাদের এই "সে-যাকে-মানতেই-হবে" আরো দূরে কোথাও থাকেন। আমরা যে আসছি তা তিনি জানলেন কি করে?'

ভালো করে চারপাশে তাকিয়ে দেখলো বিলালি, নিশ্চিত হয়ে নিলো আমরা ছাড়া আর কেউ নেই গুহায়-সে যখন কথা শুরু করে তখনই উঠে গেছে উস্তেন। তারপর মৃদু হেসে বললো, 'চোখ ছাড়া দেখতে পায়, কান ছাড়া শুনতে পায় এমন কেউ নেই তোমাদের দেশে? কোনো প্রশ্ন কোরো না; তিনি জানেন।'

শুনে একটু কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। বিলালি বলে যেতে লাগলো, আমাদের কি করা হবে না হবে এসম্পর্কে আর কোনো নির্দেশ এখনো আসেনি। তাই সে কিছুক্ষণের ভেতর রওনা হবে আমাহ্যাগারদের রানী "সে-যাকে-মানতেই-হবে'র" উদ্দেশ্যে।

'কদিন লাগবে ফিরতে?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'অন্তত পাঁচদিন,' জবাব দিলো বিলালি। 'বিস্তৃত জলাভূমি পেরিয়ে যেতে হবে

BanglaBook.org

আমাকে। চিন্তা কোরো না, এদিকে সব ব্যবস্থা করে যাচ্ছি, তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না।' একটু থেমে যোগ করলো, 'তবে শেষ পর্যন্ত তোমাদের পরিণতি কি হবে তা বলতে পারি না। আশা করার মতো বিশেষ কিছু আমি দেখছি না। আমার নানীর আমল পর্যন্ত জানি, কোনো বিদেশী এলেই নির্মম ভাবে তাকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের বাঁচানোর ব্যাপারে কখনো হস্তক্ষেপ করেননি "সে"।'

'কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব?' বললাম আমি। 'আপনি নিজেই বৃদ্ধ, আপনার নানীর আমলের মানুষকে মারার বা বাঁচানোর নির্দেশ কি করে দেবেন "সে"? এর ভেতরে তো একজন মানুষ তিনবার জন্মে তিনবার মরবে।'

হাসলো বিলালি—সেই অদ্ভুত হাসি। আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বেরিয়ে গেল গুহা ছেড়ে। পাঁচ দিনের ভেতর আর দেখলাম না তার চেহারা।

বিলালি চলে যাওয়ার পর পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করলাম আমরা। সবদিক বিবেচনা করে আমি একটু শঙ্কিত বোধ না করে পারলাম না। বিশেষ করে এখানকার রহস্যময়ী রানী, "সে-যাকে-মানতেই-হবে" সম্পর্কে যা শুনলাম তা সত্যিই শিউরে ওঠার মতো। যে কোনো আগন্তুককেই নির্দয় ভাবে হত্যা করার নির্দেশ দেয় সে। লিওকেও দেখলাম বেশ চিন্তিত। তবে একটা কথা ভেবে ও সান্ত্বনা পেতে চাইছে, এই রানী নিঃসন্দেহে ওর বাবার চিঠি এবং সেই পোড়া মাটির ফলকে যার কথা লেখা হয়েছে সেই মহিলা। তার বয়স এবং ক্ষমতা সম্পর্কে বিলালি যা বলেছে তাতে ওর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়েছে। এদিকে আমার মানসিক অবস্থা এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এই আজগুবি বিষয় নিয়ে লিওর সাথে তর্ক করারও প্রবৃত্তি হলো না। বাইরে গিয়ে স্নান করে আসার পরামর্শ দিলাম আমি।

বিলালি যে ক'দিন থাকবে না সে ক'দিন আমাদের দেখাশোনার জন্যে এক লোককে দায়িত্ব দিয়ে গেছে সে। তাকে ডেকে বললাম আমরা গোসল করতে যেতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো সে। পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল উপত্যকার একটা ঝরনার কাছে।

স্নান সেরে যখন ফিরে এলাম তখন সূর্য ডুবে গেছে। গুহার ভেতর ঢুকে দেখলাম মানুষে প্রায় ভর্তি। আগুনের চারপাশে বসে সন্ধ্যার খাওয়া সারছে তারা। পোড়া মাটির তৈরি এক ধরনের প্রদীপ জ্বলছে দেয়ালের গায়ে। গুহার মাঝখানেও দেখলাম কয়েকটা প্রদীপ। এগুলো ছোট ছোট। পশুর চর্বি আর গাছের আঁশের সলতে দিয়ে জ্বালানো।

গোসল করে আসায় এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে শরীর। কিছুক্ষণ বসে বসে লোকগুলোর খাওয়া দেখলাম, তারপর আমাদের নতুন তত্ত্বাবধায়ককে ডেকে বললাম, আমরা শুতে যেতে চাই।

BanglaBook.org

বিনা বাক্যব্যয়ে উঠে দাঁড়ালো সে। বিনয়ের সঙ্গে আমার হাত ধরে নিয়ে চললো, গুহার দেয়ালে কিছুটা পর পর যে ছোট পথগুলো দেখেছিলাম তার একটার দিকে। সরু গলির ভেতর দিয়ে পাঁচ-ছয় পা যাওয়ার পর হঠাৎ চওড়া হয়ে গেল গলিটা। আট ফুট লম্বা, আট ফুট চওড়া বর্গাকার একটা কুঠুরি। এক পাশে কুঠুরির এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত একটা পাথরের চাঙড়, ওপরটা সমান, মাটি থেকে প্রায় তিন ফুট উঁচু। এই পাথরটার ওপরই ঘুমাতে হবে আমাকে। কোনো জানালা নেই কুঠুরিতে, বাতাস ঢোকার কোনো ছিদ্রও না। প্রথম দর্শনেই মনে হলো মড়া রাখার ঘর, পাথরটার ওপর শুইয়ে রাখা হয় মৃতদেহ। কথাটা ভাবতেই সরসর করে খাড়া হয়ে গেল ঘাড়ের চুলগুলো। কিন্তু কিছু করার নেই, এখানেই শুতে হবে। কম্বল নেয়ার জন্যে ফিরে এলাম বড় মূল গুহায়-আমাদের নৌকার জিনিসপত্র সব এখন ভেতরে এনে রাখা হয়েছে। লিও আর জবের সঙ্গে দেখা হলো, ওদেরও একই রকম দুটো আলাদা কুঠুরিতে থাকতে দেয়া হয়েছে। কিন্তু জব কিছুতেই একা এক কুঠুরিতে থাকতে রাজি নয়। বলছে ভয়েই মরে যাবে। আমি যদি দয়া করে অনুমতি দিই তো আমার সঙ্গে কাটাতে পারে রাতটা। সানন্দে অনুমতি দিলাম, কারণ আমার অবস্থাও ওর চেয়ে ভাল নয় মোটেই।

মোটামুটি আরামে কাটলো রাতটা। মোটামুটি বলছি কারণ, ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন দেখা ছাড়া আর কোনো অসুবিধা হয়নি। ভোরে শিঙার শব্দে জেগে উঠলাম। সেই ঝরণার কাছে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এলাম। তারপর সকালের নাশতা দেয়া হলো।

সবে খাওয়া শুরু করেছি আমরা, এমন সময় এক মহিলা- মোটেই যুবতী বলা যাবে না তাকে, অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছে বয়সের সে পর্ব-এগিয়ে এলো জবের দিকে। সবার সামনে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলো ওকে। গুরু গম্ভীর জবের চেহারাটা যা হলো, সে না দেখলে কল্পনা করা সম্ভব নয়। যতটুকু জানি আমার মতো ও--ও একটু নারী-বিদ্বেষী। তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো ও। ঠেলে সরিয়ে দিলো তিরিশোত্তীর্ণ মহিলাটিকে।

'কক্ষণো না!' ঢোক গিলে বললো জব। কিন্তু মেয়েলোকটা ভাবলো লজ্জা পাচ্ছে ও। এগিয়ে গিয়ে আবার আলিঙ্গন করলো।

'ভাগো, ভাগো! বেহায়া মেয়ে মানুষ কোথাকার!' চিৎকার করলো জব। হাতের কাঠের চামচটা নাড়তে নাড়তে বললো, 'আমাকে ক্ষমা করবেন, স্যার, আমি কখনোই পাত্তা দিইনি ওকে। ও, ঈশ্বর! আবার আসছে। ধরুন ওকে, মিস্টার হলি! দয়া করে ধরুন! আমি মরে যাবো, সত্যিই বলছি, দুশ্চরিত্র নই আমি।' এ পর্যায়ে এসে রণে ভঙ্গ দিলো জব। চামচ, খাবার সব ফেলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলো গুহার বাইরে। প্রচণ্ড হাসিতে

BanglaBook.org

ফেটে পড়লো উপস্থিত আমাহ্যাগাররা। কিন্তু হতভাগিনী মেয়েটা হাসলো না, অন্যদের হাসি দেখে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো সে। দুপদাপ পা ফেলে বেরিয়ে গেল গুহা থেকে।

একটু পরেই ফিরে এলো জব। মুখ দেখে বুঝতে পারছি, এখনো আতঙ্কিত বোধ করছে ও—এই বুঝি ফিরে এলো মেয়েটা। উপস্থিত আমাহ্যাগারদের আমি ব্যাখ্যা করে বোঝালাম, দেশে বউ আছে জবের, এখন যদি আরেকটা বিয়ে করে তাহলে পারিবারিক জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে, তাই মেয়েটাকে গ্রহণ করতে রাজি হয়নি ও। কি বুঝলো ওরা কে জানে, কিছু বললো না।

নাশতার পর বেরোলাম আমাহ্যাগারদের গৃহপালিত পশুর পাল দেখতে। সঙ্গে এলো উস্তেন। স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী ও এখন লিওর বাগদত্তা। ওর কাছে শুনলাম ওদের জীবন, রীতিনীতি আর রানী সম্পর্কে নানা কথা। আমাহ্যাগার জাতির সূচনা বা কোত্থেকে ওরা এলো এখানে সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে পারলো না উস্তেন। তবে জানালো, যেখানে 'সে' অর্থাৎ ওদের রানী থাকেন সেখানে বিশাল বিশাল পাথরের তৈরি থাম আছে। কোনো নগরের ধ্বংসাবশেষ সম্ভবত। জায়গাটার নাম কোর। প্রাচীনকালে এক জাতি বাস করতো সেখানে। সম্ভবত তারাই আমাহ্যাগারদের পূর্বপুরুষ। এখন আর কেউ থাকে না সেখানে। ভয়ে কেউ যায়ও না। বিশাল বিস্তৃত জলাভূমির এখানে ওখানে আরো প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আছে। এখানকার গুহাগুলোও প্রাচীনকালের কোনো জাতির তৈরি। আমাহ্যাগারদের লিখিত কোনো আইন নেই, যা আছে তা হলো প্রথা—লিখিত আইনের চেয়ে কোনো অংশে কম নয় এই প্রথার বাঁধন। প্রথার বিরুদ্ধে কেউ কিছু করলে গোত্র পিতার নির্দেশে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

ওদের রানী 'সে'। কালেভদ্রে তাকে দেখা যায়—দু'বা তিন বছরে খুব বেশি হলে একবার। সে সময় লম্বা আলখাল্লা দিয়ে তার সারা শরীর ঢাকা থাকে, এমনকি মুখটাও সেজন্যে তার মুখ দেখার সৌভাগ্য হয়নি কারো। তাঁর সেবা যত্নের জন্যে যারা আছে তারা বোবা-কালা। ফলে তাদেরও কেউ কখনো বলতে পারেনি কেমন দেখতে 'সে'। তবে যতটুকু জানা গেছে, 'সে' অসম্ভব সুন্দরী। এমন সুন্দরী পৃথিবীতে কখনো সৃষ্টি হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। সে অমর এবং পৃথিবীর সবকিছুর ওপর ক্ষমতা আছে তার। তবে এসব কতদূর সত্যি সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে উস্তেনের। ওর ধারণা রানী মাঝে মাঝে একজন স্বামী বেছে নেয়। যেই মাত্র একটা মেয়ে বাচ্চা জন্ম দেয় অমনি উধাও হয়ে যায় এই স্বামী বেচারা। মেয়ে বাচ্চাটা বড় হয়ে এক সময় পুরানো রানীর

BanglaBook.org

জায়গা দখল করে আর পুরানো রানীকে কোনো গুহায় কবর দিয়ে রাখা হয়। রানীর নিয়মিত কোনো সেনাবাহিনী নেই, তবে রক্ষী আছে। এদের মধ্যে কেউ তার অবাধ্য হলে তাকে প্রাণদণ্ড দেয়া হয়।

দেশটা কত বড় এবং কত লোক থাকে এখানে, উস্তেনকে জিজ্ঞেস করলাম। ও বললো, দশটা গোত্র আছে এখানে। সবচেয়ে বড়টা থাকে রানী যেখানে থাকে সেখানে। সবগুলো গোত্রই গুহায় বাস করে। জলাভূমি অতিক্রম করতে গিয়ে প্রায়ই অসুখে পড়ে এখানকার লোকেরা, এবং মারা যায়, ফলে সংখ্যায় খুব একটা বেড়ে উঠতে পারেনি তারা। পশুর পাল দেখতে দেখতে আমাহ্যাগার জাতি সম্পর্কে এ ধরনের আরো নানা তথ্য জেনে নিলাম উস্তেনের মুখ থেকে।

চারদিন কেটে গেছে। উল্লেখ করার মতো তেমন কিছু ঘটেনি এই চারদিনে। সন্ধ্যার পর আগুনের সামনে বসে আছি আমরা–আমি, লিও, জব আর উস্তেন। মাহমুদ সেই যে প্রথম দিন গুহার এক কোনায় গিয়ে বসেছে, আর নড়েনি। খাওয়ার সময় হলে খেয়েছে, ভোরে একবার বাইরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসেছে, তারপর দিনরাত ক্রমাগত ডেকে গেছে আল্লাহ্ আর নবীকে–যেন তাকে রক্ষা করেন।

রাতের খাওয়া শেষ। একটু পরে শুতে যাবো আমরা। উস্তেন কখন বিদায় নেবে সেই অপেক্ষায় আছি। কিন্তু বিদায় নেয়ার কোনো লক্ষণ দেখছি না তার ভেতর। নীরবে বসে আছে সে। হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো মেয়েটা। লিওর সোনালী চুলের ওপর হাত রেখে সম্বোধন করলো ওকে। তারপর গাঢ় স্বরে অপূর্ব এক সুরে আবৃত্তি করে চললো অদ্ভুত কিছু কথা। লিওর জন্যে গভীর ভালোবাসা আর উদ্দাম কামনা যেন গলে গলে পড়লো কথাগুলো থেকে।

হঠাৎ থেমে গেল ও। ভয়ের ছায়া পড়লো দু'চোখে। লিওর মাথা থেকে হাত উঠিয়ে ইশারা করলো অন্ধকারের দিকে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম আমরা। কিন্তু কালো অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না।

'কি, উস্তেন?' উদ্বিগ্ন স্বরে জানতে চাইলাম আমি।

'না,' বললো ও। 'কিছু না। আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। খামোকা কেন ভয় পাইয়ে দেবো তোমাদের?' তারপর গভীর আবেগে চুমু খেলো লিওর কপালে–যেন মা আদর করছে শিশুকে।

'যখন আমি থাকবো না,' ও বললো। 'যখন রাতে হাত বাড়িয়ে আমাকে পাবে না, তখন ভেবো আমার কথা। জানি, আমি তোমার পা ধুইয়ে দেয়ারও যোগ্য নই তবু

BanglaBook.org

ভেবো, সত্যিই আমি ভালোবাসতাম তোমাকে। এখন এসো, যে সুযোগ আমরা পেয়েছি তার সদ্ব্যবহার করি। কবরে তো প্রেম নেই, উষ্ণতা নেই, নেই ঠোঁটের ছোঁয়া। কাল কি হবে কে বলতে পারে? আজকের রাতটাই আমাদের, কালকের জন্যে বসে থেকে কেন সেটা আমরা নষ্ট করবো?'

আট

পরদিন সকালে আমাদের তত্ত্বাবধায়ক এলো সঙ্গে আরো কয়েকজন আমাহ্যাগারকে নিয়ে। জানালো, আজ সন্ধ্যায় আমাদের সম্মানে এক ভোজের আয়োজন করেছে তারা। প্রতিবাদ করলাম আমি। সাধ্য মতো বোঝানোর চেষ্টা করলাম, আমরা এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ লোক নই যে আমাদের সম্মানে ভোজের আয়োজন করতে হবে। চুপচাপ আমার কথাগুলো শুনলো ওরা। বুঝতে পারলাম বিরক্ত হচ্ছে, শেষে ঠিক করলাম চুপ করে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সূর্য অস্ত যাওয়ার ঠিক আগে আমাকে জানানো হলো, সব তৈরি। জবকে নিয়ে গুহায় ঢুকলাম। লিও আগেই উপস্থিত হয়েছে সেখানে। উস্তেন যথারীতি আছে ওর সাথে। ওরা দু'জন কোথায় যেন বেড়াতে বেরিয়েছিলো, ভোজের কথা জানতো না। উস্তেন যখন শুনলো একথা, দেখলাম আতঙ্কের ছায়া পড়লো ওর সুন্দর মুখে। তাড়াতাড়ি এক লোককে ধরে নিচু স্বরে কি যেন জিজ্ঞেস করলো। লোকটার জবাব শুনে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ছাড়লো। এর পর অন্য এক লোকের কাছে গিয়ে প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো ও। লোকটা একজন কর্তাব্যক্তি। অসন্তোষের সাথে জবাব দিলো ওর কথার। তার পর হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিলো দু'জন লোকের মাঝখানে। আর কোনো উচ্চবাচ্য করলো না মেয়েটা।

আজ একটু অস্বাভাবিক বড় করে তৈরি করা হয়েছে আগুন। তার চারপাশে গোল হয়ে বসেছে প্রায় পঁয়ত্রিশ জন পুরুষ আর দু'জন স্ত্রীলোক—উস্তেন এবং জবকে প্রেম জানাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছিলো যে সেই মেয়েটা। নিঃশব্দে বসে আছে সবাই। প্রত্যেকের পেছনে গুহার মেঝেতে ছোট একেকটা গর্ত। তার ভেতর খাড়া করে রাখা তাদের বল্লম। মাত্র এক কি দু'জন হলদেটে লিনেনের আলখাল্লা পরে আছে। কোমরে চিতার চামড়া ছাড়া আর কিছু নেই অন্যদের শরীরে।

এবার কি হবে, স্যার?' সন্দেহের সুরে জিজ্ঞেস করলো জব। 'সেই

BanglaBook.org

মেয়েলোকটিও এসেছে! আবার চড়াও হবে না তো আমার ওপর? আরে, মাহমুদকেও খেতে ডেকেছে দেখছি! বেটি ওর সাথেই খাতির জমিয়ে আলাপ করছে। যাক বাবা, আমার কথা ভুলেছে তাহলে!'

পুরো ব্যাপারটাতেই কেমন একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছি আমি। শুধু রহস্য নয়, বিপদেরও। এক'দিন সব সময়ই অন্ত্যজ ভেবে আলাদা খাবার দেয়া হয়েছে মাহমুদকে। আজ হঠাৎ এমন কি ঘটলো যে, ওকে এক আসনে নিয়ে খেতে বসছে এরা?

'ব্যাপার বিশেষ সুবিধার লাগছে না,' লিও আর জবের দিকে তাকিয়ে বললাম আমি। 'তৈরি থাকা দরকার। রিভলভার আছে তো তোমাদের সাথে?'

'আমার কাছে আছে,' কাপড়ের নিচে কোমরটায় টোকা দিলো জব। 'কিন্তু লিওর কাছে শিকারের ছুরি ছাড়া কিছু নেই।'

সবাই বসে গেছে। আমরাই কেবল বাকি। এ-সময় লিওর রিভলভার খুঁজতে গিয়ে দেরি করা উচিত হবে না। দৃঢ় পায়ে এগিয়ে গিয়ে এক সারিতে বসে পড়লাম আমরা। গুহার একটা দেয়াল আমাদের ঠিক পেছনে।

আমরা বসার প্রায় সাথে সাথে লম্বাটে চেহারার একটা মাটির পাত্র এলো। চোলাই করা পানীয় তাতে। একজন মুখ লাগিয়ে খাচ্ছে পানীয় তারপর পাশের জনকে দিচ্ছে; এভাবে হাতে হাতে ঘুরে অবশেষে আমাদের কাছে এলো পাত্রটা। অদ্ভুত চেহারা ওটার। দুই হাতলওয়ালা। আমাহ্যাগারদের এখানে যত পাত্র দেখেছি তার বেশিরভাগই এই চেহারার। প্রাচীন কোনো পদ্ধতিতে তৈরি করে পরে পোড়ানো হয়েছে। দু'পাশে দুটো দৃশ্য খোদাই করা। নিপুণ হাতের কাজ। একদিকে প্রচণ্ড বলশালী কিছু লোক বল্লম হাতে আক্রমণ করছে একটা মর্দা হাতিকে। উল্টোদিকে খোদাই করা একটা প্রেমের দৃশ্য, অদ্ভুত সরলতায় আঁকা। প্রশংসার চোখে এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলাম পাত্রটার দিকে। তারপর অন্যদের অনুকরণে গলায় ঢেলে দিলাম খানিকটা পানীয়। আশ্চর্য স্বাদ। অপূর্ব বলবো না, তবে খারাপ যে নয় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এক সময় শেষ হলো পান পর্ব. কেউ বাকি নেই। নিয়ে যাওয়া হলো পাত্রটা। তারপর অনেকক্ষণ কিছু ঘটলো না। আর কোনো খাবার বা পানীয় এলো না। সবাই চুপচাপ বসে। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিরাট অগ্নিকুণ্ডের দিকে। ওদের নীরবতা দেখে আমরাও চুপ মেরে গেছি। আগুন এবং আমাদের মাঝখানে যে ফাঁকা জায়গা সেখানে বিরাট একটা কাঠের বারকোশ, চার কোনায় চারটে হাতল লাগানো। বারকোশটার পাশে লম্বা হাতলওয়ালা বিরাট একটা সাঁড়াশি, আগুনের উল্টোদিকে

BanglaBook.org

একই রকম আরেকটা।

প্রায় এক ঘণ্টা কেটে গেছে। কেমন ভৌতিক একটা পরিবেশ। সবাই নীরব, নিস্পন্দ। আগুনের সালচে আভা পড়েছে বসে থাকা আমাহ্যাগারদের মুখে। রীতিমতো সম্মোহিত হওয়ার মতো পরিবেশ। এমন সময় আমাদের সামনে বসে থাকা এক লোক চিৎকার করে উঠলো·

'আমাদের খাওয়ার মাংস কোথায়?'

গোঁজ হয়ে বসে থাকা প্রতিটা আমাহ্যাগার আগুনের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে এক সাথে মাপা মাপা গলায় জবাব দিলো—

'মাংস আসবে।'

'কিসের? ছাগলের?' একই লোক প্রশ্ন করলো।

'ছাগল তবে শিং ছাড়া, এবং ছাগলের চেয়েও ভালো, আমরা তাকে হত্যা করবো,' পিছন দিকে একটু ঘুরে বল্লমের হাতল ধরে আবার সম্মিলিত কণ্ঠে জবাব দিলো অন্যরা। তারপর সামনে ফিরলো।

'তাহলে ওটা কি ষাঁড়?' আবার প্রশ্ন করলো লোকটা।

'ষাঁড়, তবে শিং ছাড়া, আর ষাঁড়ের চেয়েও ভালো, আমরা তাকে হত্যা করবো,' একই ভঙ্গিতে বল্লম ধরে জবাব দিলো অন্যরা।

কিছুক্ষণের জন্যে আবার চুপচাপ। তারপর দেখলাম, জবকে প্রেম নিবেদন করেছিলো যে সেই মহিলা জড়িয়ে ধরেছে মাহমুদকে। গভীর সোহাগের ভঙ্গিতে গালে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ডাকছে ওর নাম ধরে। গলায় সোহাগ হলেও মহিলার চোখের দৃষ্টিতে আশ্চর্য পাশবিকতা। মাহমুদের সারা শরীরের ওপর ঘুরছে সে দৃষ্টি। কেন জানি না, দৃশ্যটা দেখে আতঙ্কিত বোধ করতে লাগলাম আমি। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। লিও এবং জবের অবস্থাও একই রকম। বেচারা মাহমুদের কালো শরীর ফ্যাকাসে রক্তশূন্য হয়ে গেছে।

'মাংস রান্নার জন্যে তৈরি?' জিজ্ঞেস করলো সেই লোক।

'তৈরি, তৈরি!'

'পাত্র গরম হয়েছে?'

'হয়েছে, হয়েছে!'

'হায়, ঈশ্বর,' বিড়বিড় করে বললো লিও। 'বাবার লেখা সেই কথাটা মনে আছে, "আগন্তুকের মাথায় উল্টো করে পাত্র বসিয়ে দেয় যে জাতি—"!'

লিওর মুখ থেকে সবেমাত্র পড়েছে কথাটা, এমন সময় লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো

BanglaBook.org

বিশাল দুই আমাহ্যাগার। ছোঁ মেরে সাঁড়াশি দুটো তুলে নিয়ে আগুনের ওপর ধরলো। এদিকে সেই মহিলা মাহমুদকে আদর করা থামিয়ে আচমকা একটা ফাঁস বের করেছে তার কোমর পেঁচিয়ে থাকা চামড়ার নিচ থেকে। মাহমুদ কিছু টের পাওয়ার আগেই সেটা পরিয়ে দিলো তার গলায়। হ্যাঁচকা এক টানে এঁটে ফেললো কষে। এই ফাঁকে পাশের লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ে চেপে ধরলো মাহমুদের পা-দুটো। এদিকে সেই দুই লোক সাঁড়াশি দিয়ে নেড়ে একটু ছড়িয়ে দিলো আগুন। তারপর সাঁড়াশি দিয়ে ধরে আগুনের ভেতর থেকে উঠিয়ে আনলো বিরাট একটা মাটির পাত্র। গনগনে আগুনের আঁচে শাদা হয়ে গেছে সেটা। এক লাফে মাহমুদের কাছে পৌঁছুলো তারা। গরম পাত্রটা এবার নামিয়ে আনবে বেচারার মাথায়!

হতভাগ্য আরব তখন প্রাণপণে যুঝছে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না। সেই পিশাচ মেয়েলোকটা গলায় ফাঁস পরিয়ে দেয়ার পরও দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আছে তাকে। পা-দুটোও চেপে ধরেছে দশাসই এক আমাহ্যাগার।

আর দেরি করা যায় না। প্রচণ্ড এক গর্জন করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। হাতে চলে এসেছে রিভলভার। এক মুহূর্ত দেরি না করে গুলি করলাম সেই পিশাচীর দিকে। পিঠে লাগলো গুলি। সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল সে। একই সঙ্গে অমানুষিক প্রচেষ্টায় তীব্র এক লাফ দিলো মাহমুদ। পরমুহূর্তে মেয়েলোকটার মৃতদেহের ওপর আছড়ে পড়লো ওর মৃত দেহও। রিভলভারের গুলি একই সঙ্গে দু'জনের শরীর ভেদ করে গেছে। ভেবে মনে মনে শান্তি পেলাম, শ্বেততপ্ত পাত্র মাথায় নিয়ে মরার চেয়ে এভাবে অনেক আরামে মরেছে মাহমুদ।

মুহূর্তের জন্যে নীরবতা নেমে এলো গুহায়। এর আগে কখনো আগ্নেয়াস্ত্রের গর্জন শোনেনি আমাহ্যাগাররা। হতভম্ব হয়ে গেছে তারা। আমাদের কাছেই বসে থাকা এক লোক সংবিৎ ফিরে পেলো প্রথমে। হ্যাঁচকা এক টানে পিঠের কাছ থেকে বল্লমটা নিয়ে ছুটে গেল লিওর দিকে।

'পালাও!' চিৎকার করেই ছুটলাম আমি গুহার মুখের দিকে। কিন্তু বেশিদূর যেতে পারলাম না। ইতিমধ্যে নড়েচড়ে উঠেছে সব কে জন্য আমাহ্যাগার। বাইরে থেকেও অনেকে হাজির হয়েছে গুহামুখের কাছে। কয়েক পা ছুটেই থেমে পড়লাম আমি। ধীরে ধীরে পিছিয়ে আসতে লাগলাম। লিও আর জব এসে দাঁড়িয়েছে আমার পাশে। একসাথে পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা। গুহার ভেতরের পঁয়ত্রিশজন আমাহ্যাগার পা-পা করে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। এদিকে বাইরে থেকেও পিল পিল করে ঢুকতে শুরু করেছে আরো লোক।

BanglaBook.org

পালানোর কোনো উপায় নেই। এদিক ওদিক তাকালাম আমি। একপাশে গুহার দেয়ালের গায়ে একটা বেদী মতো দেখলাম। রাতে বাতি জ্বালিয়ে রাখা হয় ওটার ওপর। ফুট তিনেক উঁচু, চওড়ায় আট ফুট মতো। জব আর লিওর উদ্দেশ্যে ফিসফিস করে বললাম, 'ওটার দিকে।' পরমুহূর্তে আচমকা এক দৌড়ে বেদীটার ওপর গিয়ে উঠলাম আমরা। লিও মাঝখানে, আমি দাঁড়িয়ে আছি ওর ডানে আর জব বাঁয়ে।

পা-পা করে পিছাতে পিছাতে হঠাৎ ছুট দেয়ায় মুহূর্তের জন্যে থমকে গেল আমাহ্যাগাররা। তারপর আবার এগিয়ে আসতে লাগলো ধীর পায়ে। বল্লম উঁচিয়ে ধরেছে সবাই। মৃত্যু নিশ্চিত। একবার ভাবলাম গুলি করি। কিন্তু লাভ কি? ক'জনকে মারবো? অনিবার্য নিয়তিকে মেনে নেয়ার জন্যে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা।

'বিদায়, হোরেস কাকা, ফিসফিস করে অনেকটা আপন মনে বললো লিও। 'কোনো আশা নেই। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মরবো আমরা। আমার জন্যেই আজ তোমাদের এই দুর্গতি--পারলে আমাকে ক্ষমা কোরো। বিদায়, জব।'

'সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা, লিও,' বললাম আমি। 'দুঃখ কোরো না।'

এই সময় হঠাৎ রিভলভার বের করে গুলি করলো জব। মুখ থুবড়ে পড়লো একজন।

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল আমাহ্যাগারদের ভেতর। ছুটে আসতে লাগলো তারা। আমিও গুলি শুরু করলাম এবার। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর খালি করে ফেললাম রিভলভার। পাঁচজন মরলো। নতুন করে গুলি ভরার সময় নেই। ব্যাপারটা যেন টের পেলো লোকগুলো। গুলি বন্ধ হতেই আবার ধীর পায়ে এগিয়ে আসতে লাগলো তারা।

বিশালদেহী এক আমাহ্যাগার লাফ দিয়ে উঠলো বেদীর ওপর। লিওর ছুরি ধরা হাতের এক আঘাতে ছিটকে নিচে গিয়ে পড়লো লোকটা। আমিও একজনকে কাবু করলাম ছুরি মেরে। কিন্তু জবের আঘাতটা ফস্কে গেল। গাট্টাগোট্টা আমাহ্যাগারটা ধরলো ওকে। কোমর পেঁচিয়ে ধরে নিচে নিয়ে যেতে লাগলো। জব নিজেকে মুক্ত করার জন্যে সমানে হাত পা ছুঁড়ছে। এই সময় ধস্তাধস্তিতে ছুরিটা ছিটকে পড়লো ওর থেকে। পাথরের বেদীর কোনায় ঘা খেয়ে ছুটে গেল সেটা গাট্টাগোট্টার বুক বরাবর। ভারি ছুরিটা অর্ধেক ঢুকে গেল আমাহ্যাগারটার বুকে। জবকে ছেড়ে দিয়ে লুটিয়ে পড়লো সে।

এদিকে দু'জন একসাথে হামলা চালিয়েছে আমার ওপর। ভাগ্য ভালো, তাড়াহুড়োয় দু'জনই ফেলে এসেছে তাদের বল্লম। সামনের জনের বুক বরাবর ছুরি চালিয়ে হ্যাঁচকা টানে সেটা বের করে নিলাম। পরমুহূর্তে বসে পড়ে উঠে দাঁড়ালাম আবার। এখন দ্বিতীয় জনের বুক আমার সামনাসামনি। প্রথম জনের অবস্থা হলো

এরও।

লিওর দিকে তাকালাম আমি। শোচনীয় অবস্থা ওর। একসাথে পাঁচ ছ'জন ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওর ওপর। একজনকে আঘাত করে ঠেলে ফেলতে না ফেলতেই আরেকজন এগিয়ে যাচ্ছে। রীতিমতো একটা জগাখিচুড়ি জটলা। একসঙ্গে এতজনে আক্রমণ করেছে বলেই বোধহয় এখনো লিওকে ওরা কাবু করতে পারেনি। নিজেরা নিজেরা ঠেলাঠেলি করছে খামোকা।

ইতিমধ্যে আরো দু'জন এগিয়ে এসেছে আমার দিকে। বেশিরভাগ আমাহ্যাগারই কেন যে লিওর দিকে ছুটে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। যা হোক, এ দু'জনকেও আমি সহজেই কাবু করতে পারলাম। তারপর মাথা তুলতেই আঁতকে উঠলাম। বেদীর ওপর পড়ে গেছে লিও। চার পাঁচজনে ঠেসে ধরেছে ওর হাত পা।

'একটা বল্লম দাও, চিৎকার করলো একজন। একটা বল্লম, ওর গলা কাটবো, আর একটা পাত্র দাও, রক্ত রাখবো।'

মুহূর্তের মধ্যেই দেখলাম, দীর্ঘদেহী এক আমাহ্যাগার ছুটে যাচ্ছে বল্লম হাতে। চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি।

হঠাৎ অন্যরকম একটা কোলাহলের শব্দ কানে এলো। অনিচ্ছাসত্ত্বেও চোখ খুললাম আমি। দেখলাম, উত্তেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে লিওর ওপর। নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে রেখেছে ওর অচেতন দেহ। দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে গলা। দু'তিন জন পুরুষ আমাহ্যাগার টানা হ্যাঁচড়া করে সরানোর চেষ্টা করছে মেয়েটাকে। পারছে না।

অবশেষে ধৈর্য হারিয়ে ফেললো তারা।

'দু'জনকেই খতম করে দাও,' চিৎকার করে উঠলো কেউ একজন।

বল্লম হাতে লোকটা সোজা হলো। এবার সর্বশক্তিতে নামিয়ে আনবে অস্ত্র— যেন এক ঘায়েই দু'জনকে শেষ করা যায়। আবার চোখ বন্ধ করে ফেললাম আমি।

এমন সময় গভীর গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো আমার কানে। গুহার দেয়ালে বজ্রের মতো প্রতিধ্বনি উঠলো—

'থামো!'

পরমুহূর্তে জ্ঞান হারালাম আমি।

BanglaBook.org

নয়

জ্ঞান ফিরতে দেখলাম একটা চামড়ার মাদুরের ওপর শুয়ে আছি। কাছেই জ্বলছে আগুনের কুণ্ড—সেই আগুনের কুণ্ড যার পাশে ভোজ খেতে বসেছিলাম আমরা। একটু দূরে শুয়ে আছে লিও। এখনো জ্ঞান ফেরেনি। উস্তেন ঝুঁকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছে ওর শরীরের একটা গভীর ক্ষত। উস্তেনের পেছনে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে জব। আপাতদৃষ্টিতে অক্ষত মনে হলেও থর থর করে কাঁপছে ও, ভয়ে না ক্লান্তিতে, জানি না। আগুনের ওপাশে গায়ে গায়ে শুইয়ে রাখা হয়েছে আমাদের হাতে নিহত আমাহ্যাগারদের। হতভাগ্য মাহমুদ আর সেই মেয়েলোকটা ছাড়াও বারোটা মৃতদেহ দেখলাম। বাঁ-দিকে কিছুদূরে একদল লোক বেঁচে যাওয়া মানুষখেকোগুলোকে বাঁধছে। প্রথমে প্রত্যেককে পিছমোড়া করে তারপর দু'জন দু'জন করে একসাথে। বন্ধনপর্ব তদারক করছে বিলালি।

আমাকে উঠতে দেখে এগিয়ে এলো সে। বললো, 'আশা করি ভালো বোধ করছো এখন।'

'ভালো কিনা জানি না, তবে সারা শরীরে ব্যথা।'

ঝুঁকে লিওর ক্ষতটা পরীক্ষা করলো সে। 'মারাত্মক ভাবে কেটেছে। ভাগ্য ভালো, আরো গভীরে ঢোকেনি বল্লমের ফলা। চিন্তা কোরো না, ভালো হয়ে যাবে ও।'

'ঠিক সময়মতো এসেছিলেন, পিতা,' আমি বললাম। 'আর কয়েক সেকেণ্ড দেরি হলেই ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে যেতাম আমরা।'

'ভয় পেয়ো না, পুত্র। সমুচিত শাস্তি দেয়া হবে ওদের। হাড় মাংস আলাদা করা হবে। "সে-যাকে-মানতেই-হবে"র কাছে পাঠানো হবে ওদের। বলো তো, কি করে ঘটলো ঘটনাটা?'

সংক্ষেপে আমি বর্ণনা করলাম।

'হুঁ,' জবাব দিলো বিলালি। 'আসলে এখানকার নিয়মই ওরকম। কোনো বিদেশী এলে গরম পাত্র দিয়ে হত্যা করে তাকে খেয়ে ফেলা হয়।'

'চমৎকার অতিথিপরায়ণতা যা হোক,' বললাম আমি। 'আমাদের দেশে আমরা অতিথিকে আপ্যায়ন করি খাবার দিয়ে আর আপনারা অতিথিকে খেয়ে নিজেরা আপ্যায়িত হন!'

'কি করবো বলো,' কাঁচুমাচু মুখে বললো বিলালি। 'যেখানকার যা নিয়ম। আমি

BanglaBook.org

বুঝি, আমাদের সব নিয়ম ভালো নয়, কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমি তা বদলাতে পারি না। "সে-যাকে-মানতেই-হবে" যখন নির্দেশ পাঠালেন, তোমাদের বাঁচিয়ে রাখতে হবে তখন ঐ কালো লোকটা সম্পর্কে কিছু বলেননি। ফলে স্বভাবতই আমার লোকরা ধরে নিয়েছে ওকে বাঁচিয়ে না রাখলেও চলবে। যা হোক, যে ঘৃণ্য কাজ ওরা করেছে তার প্রতিফল তারা পাবে।

'তবে একটা কথা ঠিক,' বলে চললো বুড়ো, 'দারুণ সাহসের সাথে লড়েছো তোমরা। আচ্ছা, পুত্র বেবুন, বলো তো, মারার সময় ওদের গায়ে এমন গর্ত করলে কিভাবে?'

রিভলভারের রহস্য যথাসম্ভব সরল ভাষায় বুঝিয়ে বললাম বিলালিকে। কি বুঝলো জানি না। তবে হাঁ করে শুনলো সে আমার কথা।

একটু পরে চোখ মেললো লিও। এখনো পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে পায়নি। জবও এতক্ষণে একটু সামলে নিতে পেরেছে—অন্তত হাত-পা কাঁপা কমেছে। উঠে এসে একটু ব্র্যাণ্ডি (আমাদের সাথে এখনো কিছুটা আছে) খাইয়ে দিলো লিওকে। তারপর আমি, জব আর উস্তেন ধরাধরি করে শোয়ার জায়গায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিলাম ওকে। জব রইলো ওর কাছে। আমি গিয়ে শুয়ে পড়লাম আমার কুঠুরিতে।

রাতে ভালো ঘুম হলো না। দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম বার বার। অবশেষে সকাল হলো। উঠতে গিয়ে টের পেলাম প্রচণ্ড যন্ত্রণা সারা শরীরে। আবার শুয়ে পড়লাম। সাতটার দিকে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে জব এলো। পচা আপেলের রং ধরেছে ওর গোল মুখটায়। জানালো, লিও ভালো মতোই ঘুমিয়েছে। ঘন্টা দুয়েক পরে এলো বিলালি (জব তার নাম দিয়েছে বিলি ছাগ, সম্ভবত দাড়ির কারণে)। আমি চোখ বুজে ঘুমিয়ে থাকার ভান করলাম।

'আহ!' বিড়বিড় করে বলতে শুনলাম ওকে (এরকম প্রায়ই নিজে নিজে বিড়বিড় করে কথা বলে সে) 'কি কুৎসিত এটা! ঠিক যেন বেবুন—হাঁ বেবুন, একেবারে মানানসই নাম! আর অন্যটা—সিংহের সাথে তুলনা করা যায়, কি চেহারায় কি সাহসে। তাহলে ওটার নাম সিংহ। দুটোকেই আমার খুব ভালো লেগেছে। নিশ্চয়ই "সে" একে জাদু করবেন না। বেচারা বেবুন! ঘুমিয়ে আছে, ঘুমাক। জাগিয়ে কাজ নেই।'

পা টিপে টিপে ঘুরে দাঁড়ালো সে। বুড়োর কুঠুরির মুখে না পৌঁছা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম আমি। তারপর ডাকলাম, কে, পিতা?'

'হ্যাঁ, পুত্র, আমি। দেখতে এসেছিলাম, কেমন আছো। "সে" এখুনি তাঁর কাছে নিয়ে যেতে বলেছেন তোমাদের। কিন্তু তোমরা যেতে পারবে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

BanglaBook.org

'না, পিতা, একটু সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও নড়তে পারবো না আমরা।' একটু থেমে বললাম, 'আমাকে একটু বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন? এই জায়গাটা একদম ভালো লাগছে না।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। এখানকার বাতাসে কেমন একটা দুঃখের গন্ধ। ছোট বেলায় আমিও সহ্য করতে পারতাম না এ জায়গা। জানো তো, আমাদের কেউ মারা গেলে তাকে আমরা প্রথমে এখানে এনে রাখি?'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে শিউরে উঠলাম আমি। তাহলে ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম! শরীরের সব যন্ত্রণা ভুলে উঠে বসলাম। বিলালির কাঁধে ভর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গেলাম লিওকে দেখতে। আমার চেয়ে অনেক বেশি বিধ্বস্ত অবস্থা ওর। প্রচুর রক্তক্ষরণের ফলে ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়েছে। তবে মানসিকভাবে বেশ উৎফুল্ল দেখলাম ওকে। জব আর উস্তেন বসে আছে ওর পাশে।

আমি টুকটাক কিছু আলাপ করলাম লিওর সাথে। তারপর ওকে সঙ্গে নিয়ে বিলালির পেছন পেছন বেরিয়ে এলাম গুহার বাইরে—দিনের সূর্যের নিচে। গুহা মুখের পাশে ছায়ায় বসলাম আমরা। পরের দুটো দিন এখানেই কাটালাম।

তৃতীয় দিন সকালে মোটামুটি স্বাভাবিক হয়ে গেল আমার আর জবের অবস্থা। লিওর অবস্থাও অনেক ভালো। সুতরাং বিলালি প্রস্তাব করতেই রহস্যময়ী "সে-যাকে-মানতেই-হবে" যেখানে থাকে সেই কোর-এর পথে বেরিয়ে পড়তে রাজি হয়ে গেলাম আমরা।

দশ

এক ঘন্টার ভেতর পাঁচটা পাল্‌কি এনে রাখা হলো গুহার মুখে। প্রতিটার জন্যে চারজন করে বাহক আর দু'জন বদলি বাহক। পাহারাদার হিসেবে যাবে পঞ্চাশজন আমাহ্যাগারের একটা দল। তিনটে পাল্‌কি আমাদের তিন জনের জন্যে, একটা বিলালির জন্যে, আর একটায় কে যাবে? উস্তেন?

'মেয়েটা কি যাবে আমাদের সাথে?' বিলালিকে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

কাঁধ ঝাঁকালো বৃদ্ধ। 'ওর ইচ্ছা! আমাদের দেশে মেয়েরা খুশি মতো সব করতে পারে। ওদের পূজা করি আমরা, এবং ইচ্ছে মতো চলতে দিই, কারণ ওদের ছাড়া পৃথিবী চলতে পারে না; ওরা তো প্রাণের উৎস।'

BanglaBook.org

'হুঁ, এ-ভাবে কখনো ভেবে দেখিনি আমি।'

'ওদের পূজা করি আমরা,' বলে চললো বৃদ্ধ, 'তবে ততক্ষণ পর্যন্ত, যতক্ষণ না ওরা অসহ্য হয়ে ওঠে আমাদের কাছে!'

'অসহ্য হয়ে ওঠে নাকি?'

'মোটামুটি প্রতি দ্বিতীয় পুরুষে একবার।'

'আচ্ছা! তখন কি করেন আপনারা?'

'আমরা মাথা তুলে দাঁড়াই এবং মেরে ফেলি বুড়িগুলোকে, যাতে কম বয়েসীগুলো শিক্ষা পায়, আমরা পুরুষরাই আসলে শক্তিশালী। আমার স্ত্রীকেও ওভাবে মারা হয়েছে তিন বছর আগে। খুব দুঃখ পেয়েছিলাম, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, পুত্র, জীবনটা আমার অনেক সুখের হয়ে গেছে তারপর থেকে।'

'সংক্ষেপে, এখন আপনার স্বাধীনতা অনেক বেশি, দায়িত্ব কম।'

শুনে কিছুক্ষণ থমকে দাঁড়িয়ে রইলো বিলালি। ধীরে ধীরে, অন্তর দিয়ে সে বুঝলো কথাটার মর্ম। 'হ্যাঁ, বেবুন। ঠিক এভাবে কখনো ভাবিনি আমি। তুমি বলায় এখন মনে হচ্ছে, সত্যি তাই। মেয়েটার কথাই ধরো না--সাহসী, সিংহকে ভালোবাসে, তুমি নিজেই তো দেখেছো, কিভাবে তাকে বাঁচিয়েছে। আমাদের প্রথা অনুযায়ী সিংহের সাথে বিয়েও হয়ে গেছে ওর। এখন সিংহ যেখানে যাবে ইচ্ছে হলে ও-ও সেখানে যেতে পারে যদি না,' একটু থেমে যোগ করলো, "সে" বারণ করেন।'

'ধরুন, "সে" বারণ করলেন, মেয়েটা শুনলো না, তখন?'

কাঁধ ঝাঁকালো বৃদ্ধ। 'ধরো প্রচণ্ড ঝড় বাঁকিয়ে ফেলতে চেষ্টা করছে গাছকে, গাছ বাঁকতে রাজি নয়, তখন?'

জবাবের অপেক্ষায় না থেকে নিজের পাল্‌কিতে গিয়ে উঠলো বৃদ্ধ। দশ মিনিটের মাথায় কোর-এর পথে রওনা হলাম আমরা।

বিশাল পেয়ালা আকৃতির আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখটা পেরোতে ঘন্টাখানেক লেগে গেল। আরো আধ ঘন্টা লাগলো ওপাশের ঢাল বেয়ে উঠতে। তারপর যে দৃশ্যটা দেখলাম তা জীবনে ভোলার মতো নয়। অপূর্ব সুন্দর সবুজ ঘাসে ছাওয়া বিস্তৃত সমভূমি ঈষৎ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। এখানে ওখানে ছোট ছোট গাছ, বেশির ভাগই কাঁটা জাতীয়। দুপুর নাগাদ প্রায় মাইল দশেক দীর্ঘ সেই ঢালের শেষ মাথায় পৌঁছুলাম আমরা। তারপরই শুরু হলো ভয়ানক জলার রাজত্ব। তার মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গেছে সরু এক চিলতে একটা আঁকা বাঁকা পথ। ঢালের শেষ আর জলার শুরু যেখানে সে জায়গায় কিছুক্ষণের জন্যে থেমে দুপুরের খাওয়া সেরে নিলাম আমরা। খানিকটা করে কুইনাইন

BanglaBook.org

নিজে খেতে এবং লিও আর জবকে খাওয়াতে ভুললাম না। তারপর আবার রওনা হলাম।

মাইলের পর মাইল কাদা আর পচা পানি। দলের একেবারে সামনে লম্বা লাঠি হাতে দু'জন লোক। একটু পর পরই কাদা পানির ভেতর লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখছে মাটি শক্ত কি-না। এই ভর দুপুরেও ব্যাঙের একটানা চিৎকারে কান পাতা দায়। এখানে ওখানে ঝাঁক বেঁধে বসে আছে, উড়ছে, রাজহাঁস, বেলেহাঁস, পান কৌড়ি, কাদাখোঁচা, এবং আরো নানা রকম পাখি। যারা উড়ছে তারা তো উড়ছেই, যারা বসে আছে আমাদের উপস্থিতিতে মোটেই বিরক্ত হলো না তারা—যেন পোষা পাখি। জলার ভেতর ছোট এক জাতের কুমীর দেখলাম, সংখ্যায় অজস্র। বড় বড় জলচর সাপও দেখলাম অনেক। ভাগ্য ভালো, পাখিগুলোর মতো ওরাও আমাদের দেখে খুব একটা বিরক্ত হলো না। যেমন ছিলো তেমন পড়ে রইলো। একটা জিনিসই কেবল অসহ্য লাগছে, পচা পানির দুর্গন্ধ। যতক্ষণ না এই জলাভূমি শেষ হচ্ছে ততক্ষণ এই দুর্গন্ধের হাত থেকে মুক্তির কোনো উপায় নেই। কোনোমতে নাক-মুখ কুঁচকে বসে আছি পাল্‌কিতে। আর এগিয়ে চলেছে বেহারারা, কোথাও মোটামুটি শুকনো মাটির ওপর দিয়ে, কোথাও হাঁটু সমান কাদা ভেঙে।

সূর্য না ডোবা পর্যন্ত এভাবে এগিয়ে চললাম আমরা। অবশেষে প্রায় দু'একর আয়তনের একটা উঁচু শুকনো জায়গা দেখে থামার নির্দেশ দিলো বিলালি। এখানেই রাত কাটাতে হবে। পাল্‌কি থেকে নামলাম আমরা—আমি, জব আর উস্তেন। ধরাধরি করে নামালাম লিওকে। শুকনো ঘাস-পাতা আর সঙ্গে আনা কাঠ দিয়ে ছোট্ট একটা অগ্নিকুণ্ড তৈরি করা হলো। প্রচণ্ড গরম আর দুর্গন্ধ সহ্য করে যতটুকু সম্ভব খেয়ে নিলাম সবাই। তারপর কম্বলের নিচে গিয়ে ঢুকলাম। কিন্তু ব্যাঙের ডাক আর মশার গুনগুনানিতে ঘুমায় কার সাধ্য? কম্বলের নিচ থেকে মাথা বের করে লিওর দিকে তাকালাম একবার। বসে বসে ঝিমোচ্ছে ও। আগুনের অস্পষ্ট আলোয় উস্তেনকে দেখলাম। লিওর পাশে শুয়ে আছে। একটু পরপর ঘাড় ঘুরিয়ে ভর দিয়ে উদ্বিগ্নমুখে তাকাচ্ছে লিওর দিকে। শুয়ে পড়লাম আমি। তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। মশার যন্ত্রণায় কম্বল মুড়ি দিলাম আবার। তারপর নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি জানি না।

যখন ঘুম ভাঙলো তখন সবেমাত্র ভোর হচ্ছে। প্রহরী আর বাহকরা ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে। আবার রওনা হওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছে। ভোরের ঘন কুয়াশায় ভূতের মতো লাগছে ওদের। আগুন নিবে গেছে কখন জানি। দু'হাতে মাথা চেপে ধরে বসে আছে

লিও। চোখ দুটো লাল টকটকে।

'কেমন লাগছে লিও?' কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'মনে হচ্ছে মরে যাবো,' খেঁকিয়ে উঠলো ও। 'মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, ভীষণ শীত করছে।'

ঠোঁট কামড়ালাম আমি। অবশেষে পড়েছে লিও, এত কুইনাইন খাইয়েও ম্যালেরিয়ার হাত থেকে বাঁচানো গেল না। জবের অবস্থাও বিশেষ সুবিধার মনে হচ্ছে না। দু'জনকেই পুরো দশ গ্রেন করে কুইনাইন খাইয়ে দিলাম। সাবধানতা হিসেবে আমি নিজেও খেলাম খানিকটা। তারপর গেলাম বিলালির কাছে। আমার সঙ্গীদের অসুস্থতার কথা জানালাম। ব্যস্ত সমস্ত হয়ে এগিয়ে এলো বৃদ্ধ। প্রথমে দেখলো লিওকে। তারপর জবকে (এখানে বলে রাখা দরকার, মোটা শরীর, গোল মুখ আর কুতকুতে চোখ দেখে বিলালি ওর নতুন নামকরণ করেছে শূকরছানা)। ভালোমতো দেখে বুড়ো আমাকে টেনে নিয়ে গেল একটু দূরে।

'সেই জ্বর!' ফিসফিস করে বললো সে। 'আমি আগেই ভেবেছিলাম। সিংহের অসুখটা মারাত্মক। তবে ঘাবড়িও না, জোয়ান ছেলে, ঠিক সামলে নেবে। আর শূকরছানার অসুখ সামান্য। আমরা বলি "ছোট জ্বর"। তেমন কিছু না।'

'এখন আর এগোনো কি উচিত হবে, পিতা?'

'অবশ্যই। এখানে থাকলে ওদের মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না। সবকিছু যদি ঠিকমতো চলে, আজ রাতের ভেতর এই জলাভূমি পেরিয়ে যাবো আমরা। তারপর বিশুদ্ধ বাতাস। এসো ওদের পাল্‌কিতে তুলে দিই। যত তাড়াতাড়ি রওনা হওয়া যায় ততই মঙ্গল।'

প্রথম ঘন্টাতিনেক ভালোই এগোলাম আমরা। তারপর আরো দুর্গম হয়ে উঠলো পথ। এখানে ওখানে দেখা যাচ্ছে গভীর জলা। কোনো কোনো জায়গায় আক্ষরিক অর্থেই বেহারাদের হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যেতে লাগলো কাদায়। হাঁটার ছন্দ আর আগের মতো সমান নেই। পাল্‌কি দুলছে ভীষণ। কি করে যে এই ভারি পাল্‌কি কাঁধে নিয়ে হাঁটছে ওরা ভেবে অবাক হলাম।

ঘন্টাখানেক এগোলাম এভাবে। দুলুনির চোটে গায়ে ব্যথা হয়ে গেছে। এমন সময় একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার ভেসে এলো। পরমুহূর্তে ভয়ানক হৈ-চৈয়ের আওয়াজ। থেমে দাঁড়ালো পুরো দলটা!

লাফ দিয়ে পাল্‌কি থেকে নেমে সামনে দৌড়ালাম আমি। প্রায় বিশ গজ দূরে দেখতে পাচ্ছি একটা গভীর জলার কিনারা। এই কিনারা ঘেঁষে এগিয়ে গেছে আমাদের

BanglaBook.org

কাদামগ্ন পথ। জলার দিকে তাকিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলাম। বিলালির পাল্‌কিটা পানিতে ভাসছে। হতভাগ্য বৃদ্ধকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও। ব্যাপার কি জিজ্ঞেস করতে এক বাহক জানালো, বিলালির বাহকদের একজনকে সাপে কেটেছে। আতঙ্কে লাফিয়ে উঠে লোকটা পাল্‌কি ছেড়ে দেয়। পরমুহূর্তে আবিষ্কার করে, জলায় পড়ে গেছে সে। তখন প্রাণ বাঁচানোর জন্যে পাল্‌কির কিনারা ধরে হাঁচড়-পাচড় করতে থাকে সে। এই পরিস্থিতিতে যা ঘটার তা-ই ঘটে--অন্য বাহকরাও ছেড়ে দেয় পাল্‌কি। ফলে বিলালি এবং সাপে কাটা লোকটাকে সহ পাল্‌কি গড়িয়ে চলে যায় পানিতে।

আমি যখন জলার কিনারায় পৌঁছুলাম তখন দু'জনের একজনকেও জলের ওপর দেখলাম না। হঠাৎ নোংরা পানির এক জায়গায় একটু আলোড়ন উঠলো। তার পরেই ভেসে উঠলো বিলালির শরীর। হাবুডুবু খেতে খেতে গায়ের লিনেনের জট থেকে নিজেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছে সে।

'ঐ তো উনি!' চিৎকার করলো একজন। 'আমাদের পিতা ঐ তো!' বললো কিন্তু একচুল নড়লো না লোকটা। অন্যরাও হাসি হাসি মুখে তাকিয়ে রইলো বিলালির দিকে।

'সামনে থেকে সরো, গাধার দল!' ইংরেজিতে চিৎকার করে উঠলাম আমি। মাথা থেকে হ্যাটটা খুলে ছুঁড়ে দিলাম এক দিকে, তারপর লাফিয়ে পড়লাম সেই দুর্গন্ধময় সবুজাভ পানিতে। দুবার হাত ছুঁড়েই পৌঁছে গেলাম বিলালির কাছে। কখন কি করতে হয় সে সম্পর্কে টনটনে জ্ঞান বৃদ্ধের—ডুবন্ত মানুষরা সাধারণত যেমন করে তেমন আতঙ্কিত ভঙ্গিতে আমাকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করলো না। আস্তে তার এক হাত ধরে টেনে নিয়ে এলাম পাড়ের দিকে।

'কুত্তার দল!' পাড়ে উঠেই খেঁকিয়ে উঠলো বিলালি, চোখ দিয়ে আগুন ঝরছে তার। 'তোদের বাপকে মরতে বসিয়েছিলি! এই বিদেশী, আমার ছেলে বেবুন যদি না থাকতো আজ নিশ্চয়ই ডুবে মরতাম আমি। আর তোরা কি করতি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতি!'

আরো কিছুক্ষণ তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো লোকগুলোর দিকে, তারপর আমার দিকে ফিরলো বিলালি। দু'হাতে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বললো, 'পুত্র বেবুন, আজ থেকে আমি তোমার বন্ধু। তুমি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো, যদি কোনো দিন সময় সুযোগ আসে আমি এর প্রতিদান দেবো।'

ঐ জঘন্য জায়গায় যতটা সাফ সুতরো হওয়া যায় হয়ে নিয়ে, বিলালির পাল্‌কিটা উদ্ধার করে আবার রওনা হলাম আমরা। হতভাগ্য বাহক—যাকে সাপে কেটেছিলো—পড়ে রইলো জলায়। ওর মৃত্যুতে কিছুমাত্র মর্মাহত হতে দেখলাম না কাউকে। যেন

BanglaBook.org

বেমালুম ভুলে গেছে, অমন কেউ ছিলো ওদের সাথে।

এগারো

সূর্যাস্তের প্রায় এক ঘন্টা আগে, অবশেষে জলাভূমির প্রান্তে পৌঁছুনো গেল। তারপরই মাটি ধীরে ধীরে উঁচু হতে হতে ঢেউ খেলানো পাহাড়ের চেহারা নিয়েছে। প্রথম ঢেউয়ের গোড়ায় পৌঁছে রাত কাটানোর জন্যে থামলাম আমরা। পাল্‌কি থেকে নেমেই ছুটে গেলাম লিওর কাছে। আরো খারাপ হয়েছে ওর অবস্থা। নতুন উপসর্গ দেখা দিয়েছে—বমি করছে ঘন ঘন। সারারাত চললো এই ভাবে। বেচারা উস্তেন সাধ্য মতো শুশ্রূষা করছে ওর। একটু কম অসুস্থ জবেরও দেখাশোনা করছে। সত্যি উস্তেনের মতো অক্লান্ত সেবিকা জীবনে আর দেখিনি আমি।

জলাভূমি পেরোনোর পরই আকাশ-পাতাল পরিবর্তন এসেছে আবহাওয়ায়। দুর্গন্ধ বিদায় নিয়েছে, না শীত না গরম একটা অবস্থা, মশাও নেই বললেই চলে। বেশ ক'দিন পর একটু ঘুম হলো রাতে।

ভোরে উঠে দেখলাম আরো খারাপ হয়েছে লিওর অবস্থা। এক রাতেই শুকিয়ে প্রায় অর্ধেক হয়ে গেছে। এমন সময় বিলালি এলো। বললো, এখনি রওনা হওয়া দরকার। কারণ, আর আধ দিনের ভেতর যদি শান্ত কোনো জায়গায় পৌঁছে উপযুক্ত শুশ্রূষার ব্যবস্থা না করা হয় তাহলে লিওকে আর বাঁচানো যাবে না।

সুতরাং আবার রওনা হলাম আমরা। জ্বরের ঘোরে যেন না পড়ে যায় সেজন্যে লিওর পাল্‌কির পাশে পাশে হেঁটে চললো উস্তেন।

সূর্য ওঠার আধ ঘন্টার ভেতর নিচু পাহাড়টার চূড়ায় পৌঁছুলাম আমরা। সামনে সবুজ ঘাসে ছাওয়া পাহাড়ী ভূমি। এখানে ওখানে ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়। নানা রঙের অগুনতি ফুল ফুটে আছে তাতে। বহু দূরে—আন্দাজ করলাম মাইল আঠারো হবে—মাথা তুলেছে বিরাট একটা পাহাড়। চেহারা দেখে মনে হয়, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছিলো। প্রায় গোল দেখতে। চূড়াটা ক্রমশ সরু হতে হতে আকাশের গায়ে মিশেছে। মেঘের দল ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে চূড়ার এপাশে ওপাশে। একটু কম উঁচু একটা পাহাড়ী দেয়াল ঘিরে রেখেছে গোল পাহাড়টাকে।

পাল্‌কিতে বসে অপূর্ব এই দৃশ্য দেখছি, এমন সময় বিলালির পাল্‌কিটা পিছিয়ে চলে এলো আমারটার পাশে।

BanglaBook.org

'ওখানে থাকে "সে"!' বললো বৃদ্ধ। 'আর কোনো রানীর এমন সিংহাসন দেখেছো?'

'সত্যিই অপূর্ব, পিতা। কিন্তু, আমরা ঢুকবো কি করে ওর ভেতর?'

'সময় হলেই দেখতে পাবে, বেবুন। নিচে পথের দিকে তাকাও, তোমরা তো বুদ্ধিমান মানুষ, কি বুঝতে পারছো?'

তাকিয়ে দেখলাম, ঘাসে ছাওয়া একটা রাস্তা মতো, সোজা এগিয়ে গেছে পাহাড়টার পাদদেশ পর্যন্ত। পথের দু'পাশে খাড়া উঁচু পাড়। হুবহু খালের মতো। পার্থক্য একটাই—পানি নেই এতে।

'রাস্তার মতোই মনে হচ্ছে বটে, বললাম আমি। 'তবে রাস্তার চেয়ে শুকনো খাল বা নদীর সঙ্গেই সাদৃশ্য বেশি এটার।'

'ঠিক বলেছো, পুত্র। ওটা খালই। আমাদের আগে যারা এ এলাকায় বাস করতো তারা কেটেছিলো। অনেক আগে ঐ পাহাড়ের কাছে একটা হ্রদ ছিলো। ওখান থেকে পানি নিয়ে আসার জন্যে অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে খালটা তৈরি করেছিলো ওরা। পরিশ্রমও করেছিলো প্রচণ্ড। পাহাড়ের উঁচু দেয়ালে সুড়ঙ্গ কেটে প্রথমে পানি বাইরে আনতে হয়েছে তারপর খাল কেটে তা নিয়ে গেছে দূরে। পরে হ্রদটা শুকিয়ে গেছিলো—কি কারণে জানি না। তখন ওরা ঐশুকনো হ্রদের তলায় বিশাল একটা নগর তৈরি করে। কালক্রমে সেই নগরও ধ্বংস হয়ে ঐ পাহাড়ের চেহারা নেয়। নগরের "কোব" নামটাই কেবল টিকে আছে এখনো।'

'হুঁ, বুঝলাম, কিন্তু বৃষ্টির পানিতে আবার কেন ভরে গেল না হ্রদটা?'

'না, পুত্র, ওরা বুদ্ধিমান ছিলো। বিরাট একটা নালা কেটে দিয়েছিলো। বৃষ্টির পানি চলে যেতো ঐ নালা দিয়ে। ঐ যে সেই নালাটা।' ডান দিকে ইশারা করলো বিলালি। দেখলাম প্রায় চার মাইল দূর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা জলধারা। 'প্রথমে বোধহয় এই খাল দিয়েই পানি বয়ে যেতো। পরে এটাকে রাস্তা হিসেবে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয় ওরা। তখন ঐ খালটা কাটায়।'

'এই নালা ছাড়া আর কোনো রাস্তা নেই পাহাড়ে ঢোকার?'

'আছে। তবে গোপন সেটা। অনেক পরিশ্রম করতে হয় ঐ পথে যেতে হলে।'

"সে" সবসময় ওখানেই থাকেন? বাইরে আসেন না কখনো?'

'না, পুত্র, যেখানে আছেন সবসময় সেখানেই থাকেন তিনি।'

সন্ধ্যার ঘন্টা দেড়েক আগে সেই বিশাল আগ্নেয় পাহাড়ের ছায়ায় পৌঁছুলাম আমরা।

BanglaBook.org

প্রাচীন শুকনো খাল-পথ ধরে এগিয়ে চলেছে বেহারারা। সামনেই পাহাড়ী দেয়ালটা। কাছাকাছি পৌঁছে এখন দেখছি, একটা নয়, অনেকগুলো খাড়া খাড়া চূড়া। একটা ছাড়িয়ে উঠে গেছে অন্যটা। যত কাছে এগোচ্ছি তত স্পষ্ট হয়ে উঠছে প্রাচীন কোর নগরী যারা তৈরি করেছিলো তাদের শিল্প এবং কারিগরি নৈপুণ্যের পরিচয়। কি অসামান্য দক্ষতার সাথে পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়েছে। সামনেই দেখতে পাচ্ছি তার অন্ধকার গহ্বর। কি বিপুল সংখ্যক লোক নিয়োগ করতে হয়েছিলো এ কাজে কে বলবে? কোথা থেকে ধরে আনা হয়েছিলো তাদের তা-ই বা কে জানে?

সুড়ঙ্গের মুখে এসে থেমে দাঁড়ালো আমাদের দলটা। রক্ষীদের দু' একজন প্রদীপ জ্বালার ব্যবস্থা করতে লাগলো। বিলালি তার পাল্‌কি থেকে নেমে এসে বিনীতভাবে জানালো, এখান থেকে চোখ বেঁধে নিয়ে যাওয়া হবে আমাদের। "সে" নাকি তেমনই নির্দেশ দিয়েছে।

আমি আপত্তি করলাম না। আপত্তি করার মতো শারীরিক অবস্থা নয় লিওর। কেবল জব— এখন একটু ভালো ওর শরীরের অবস্থা--খানিকটা গাঁইগুঁই করলো। কিন্তু ওর আপত্তিতে কান দিলো না কেউ। প্রদীপগুলো জ্বলে ওঠার পরপরই চোখ বেঁধে ফেলা হলো আমাদের। উস্তেনও বাদ গেল না। তারপর আবার চললো কাফেলা। এবার আর কিছু দেখতে পাচ্ছি না। পাল্‌কির মৃদু দুলুনি অনুভব করছি আর বেহারাদের পদশব্দের প্রতিধ্বনি শুনছি শুধু। একটু পরেই শুরু হলো একঘেয়ে জল পড়ার শব্দ। চোখ ছাড়া বাকি সব কটা ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ করে বুঝতে চেষ্টা করছি, কোন্‌পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আমাদের।

কিছুক্ষণ পরেই বাতাস ভারি হয়ে উঠতে শুরু করলো। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। কিছু দেখতে পাচ্ছি না, তবে বুঝতে পারছি, এভাবে আর কিছুক্ষণ চললে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো। জোরে জোরে শ্বাস টেনেও ফুসফুস ভরাতে পারছি না, এমন সময় তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিলো পাল্‌কি। তারপর আরেকটা এবং আরেকটা। জল পড়ার শব্দ মিলিয়ে গেল। বাতাস আবার তাজা হয়ে উঠলো। কিন্তু বাঁক নেয়া চলছে সমানে। প্রথম কয়েকটা খেয়াল করতে পারলাম, কোন্ দিকে কোন্ দিকে মোড় নিলো, পরেরগুলো গুলিয়ে ফেললাম।

আধ ঘন্টা চললো এভাবে। তারপর হঠাৎ আলোর আভাস দেখতে পেলাম চোখের ফেটির ভেতর দিয়ে। আরো কয়েক মিনিট এগোলো পাল্‌কি। তারপর থেমে পড়লো। বিলালির গলা শুনলাম। উস্তেনকে নিজের চোখের বাঁধন খুলে আমাদেরগুলো খুলে দিতে বললো। উস্তেনের অপেক্ষায় না থেকে আমি নিজেই আমার বাঁধন খুলে চোখ

BanglaBook.org

মেলে তাকালাম।

যা ভেবেছিলাম তাই, পাহাড়ী দেয়ালটার অন্যপাশে এসে পড়েছি আমরা। গোল পাহাড়ের চূড়াটা তত উঁচু নয় এখান থেকে, শ'পাঁচেক ফুট হবে। তার মানে শুকিয়ে যাওয়া হ্রদের তলা অর্থাৎ বিশাল প্রাচীন জ্বালা মুখটা বাইরের মাটি থেকে বেশ উঁচুতে। বিলালিদের ওখানে যেটা দেখেছিলাম সেটার মতো বিশাল পেয়ালার আকৃতি এটারও, আয়তনে অন্তত দশগুণ বড়--এই যা তফাৎ। প্রাকৃতিক দেয়াল ঘেরা জায়গাটার এক বিরাট অংশে চাষাবাদ হয়। কয়েক জায়গায় গরু, ছাগল ও এই ধরনের আরো গৃহপালিত পশুর পাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাতে ফসলের খেত নষ্ট করতে না পারে সেজন্যে পাথরের দেয়াল তুলে ঘিরে রাখা হয়েছে তাদের। বেশ দূরে, জায়গাটার প্রায় কেন্দ্রের কাছাকাছি বিশাল এক নগরীর ধ্বংসাবশেষ।

আপাতত আর কিছু দেখার সুযোগ পেলাম না, দলে দলে আমাহ্যাগাররা এসে ঘিরে ধরেছে আমাদের। গত কয়েকটা দিন যাদের মাঝে কাটিয়েছি হুবহু তাদের মতো, কি স্বভাবে কি চেহারায়। গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে অবাক চোখে দেখছে আমাদের। তারপর হঠাৎ একদল সশস্ত্র লোক দ্রুতপায়ে ছুটে এলো আমাদের দিকে। একেবারে সামনে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সৈনিক, প্রত্যেকের হাতে হাতির দাঁত দিয়ে তৈরি লাঠি। চিতার চামড়া ছাড়াও এদের পরনে রয়েছে লিনেনের আলখাল্লা। সম্ভবত "সে-যাকে-মানতেই-হবে"র দেহরক্ষী বাহিনীর সৈনিক এরা।

বিলালির দিকে এগিয়ে এলো তাদের দলনেতা। হাতির দাঁতের দণ্ডটা আড়াআড়ি ভাবে কপালের সামনে ধরে অভিবাদন জানালো। তারপর কয়েকটা প্রশ্ন করলো। জবাব দিলো বিলালি। প্রশ্ন বা উত্তর কোনোটাই বুঝতে পারলাম না আমি। বিলালির জবাব শোনার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়ালো দলটা। চলতে শুরু করলো পাহাড়ী দেয়ালের ধার ঘেঁষে। আমাদের পাল্‌কি কাফেলাও রওনা হলো ওদের পেছন পেছন।

আধ মাইল যাওয়ার পর প্রকাণ্ড এক গুহামুখের সামনে থামলাম আমরা। প্রায় ষাট ফুট উঁচু হবে গুহাটা, চওড়ায় আশি ফুট। পাল্‌কি থেকে নামলো লিলালি। জব এবং আমাকেও অনুরোধ করলো নামতে। লিওকে কিছু বলার প্রশ্নই উঠলো না, কারণ এখনও ও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে ওর পাল্‌কিতে। লিওকে ধরাধরি করে নিয়ে বিরাট গুহাটার ভেতর ঢুকলাম আমরা। কিছুদূরের একটা ফোকর দিয়ে অস্তায়মান সূর্যের ম্লান আলো আসছে গুহায়। সূর্য ডুবে গেলে যেন ভেতরটা অন্ধকার না হয়ে যায় সেজন্যে অনেকগুলো প্রদীপও জ্বালানো হয়েছে। গুহার দেয়ালগুলো খোদাই করা ভাস্কর্যে মোড়া। বিলালিদের ওখানে পানীয়ের পাত্রে যে ধরনের কাজ দেখেছি অনেকটা

BanglaBook.org

সেরকম—প্রেমের দৃশ্য সবচেয়ে বেশি, তারপর শিকারের ছবি, প্রাণদণ্ড কার্যকর করার দৃশ্য, উত্তপ্ত লাল পাত্র মাথায় বসিয়ে অপরাধীদের শাস্তি দেয়ার দৃশ্য। যুদ্ধের দৃশ্য খুব কম দেখলাম। তাতে আমার ধারণা হলো, বাইরের শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতা খুব বেশি নেই এদের। ভাস্কর্যগুলোর সাথে প্রাচীন কোনো জনগোষ্ঠীর কাজের সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম না—না গ্রীক, না মিসরীয়, না হিব্রু, না আসিরীয়। সামান্য সাদৃশ্য যেটুকু পেলাম তা চৈনিক ভাস্কর্যের সাথে। কালের গ্রাসে অনেক কাজই ক্ষয়ে গেছে। অনেকগুলো এখনো সম্পূর্ণ অক্ষত আছে।

সশস্ত্র রক্ষীরা দাঁড়িয়ে রইলো গুহার মুখে। এক এক করে আমরা ঢুকলাম ভেতরে। শাদা আলখাল্লা পরা এক লোক এগিয়ে এসে বিনীত ভাবে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো। কিন্তু মুখে একটা শব্দও করলো না। লোকটা রানীর বোবা-কালা পরিচারকদের একজন।

প্রবেশ পথ থেকে সমকোণে এগিয়ে গেলে ফুট বিশেক দূরে আরেকটা ছোট্ট গুহা মূলগুহার মেঝে ফুঁড়ে বেরিয়েছে। ডান এবং বাঁ—দুদিকে দুটো মুখ সেটার। বাঁ দিকের মুখে দাঁড়িয়ে আছে দু'জন রক্ষী। ধারণা করলাম "সে" থাকে ওটার ভেতরে। ডান দিকের মুখটায় কেউ নেই। বোবা লোকটা ইশারায় জানালো, ওটার ভেতরে যেতে হবে আমাদের। তারপর সে নিজেই পথ দেখিয়ে চললো।

এক জাতীয় ঘাসের আঁশে তৈরি পর্দা ঝুলছে ছোট গুহাটার মুখে। বোবা লোকটা হাত দিয়ে পর্দা উঠিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালো। ভেতরে ঢুকলাম আমরা। বেশ বড়সড় একটা কামরা বলা যেতে পারে, যথারীতি পাথর খোদাই করে বানানো। পরম স্বস্তির সাথে লক্ষ করলাম, আলো বাতাস আসার জন্যে একটা গর্ত আছে গুহাটার দেয়ালে। আরো আছে শোয়ার জন্যে পাথরের চৌকি, হাত-মুখ ধোয়ার জন্যে বড় পাত্র ভর্তি পানি, গায়ে দেয়ার জন্যে চিতার চামড়ার চমৎকার কম্বল।

চৌকির ওপর শুইয়ে দিলাম অচেতন লিওকে। উস্তেন বসলো ওর পাশে। এরপর বোবা লোকটা একই রকম আরেকটা কামরায় নিয়ে গেল আমাদের। জব নিলো এ ঘরটা। তারপর আরো দুটো কামরায়—একটা দখল করলো বিলালি একটা আমি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

বারো

প্রথমেই লিওর চিকিৎসার যথাসাধ্য বন্দোবস্ত করলাম। তারপর হাতমুখ ধুয়ে নিলাম আমি আর জব। আমাদের সব জিনিসপত্র এখান পর্যন্ত বয়ে এনেছে বিলালির লোকজন। ফলে গায়ের নোংরা কাপড়গুলো বদলে নতুন একপ্রস্থ পোশাক পরে নিতে পারলাম। বেশ ঝরঝরে বোধ করছি এখন, সেই সাথে ক্ষুধার্তও। তাই একটু পরে যখন কোনোরকম আগাম ঘোষণা ছাড়াই গুহা মুখের পর্দা সরে গেল এবং নতুন একজন বোবা-কালা ঢুকলো তখন বিরক্ত হলাম না মোটেই। এবারের জন যুবতী। মুখ হাঁ করে আর হাত নেড়ে সে যা বোঝাতে চাইলো তার একটাই অর্থ হতে পারে—খাবার তৈরি, খেতে চলুন।

মেয়েটার পেছন পেছন আরেকটা গুহায় গিয়ে ঢুকলাম। শোয়ার কুঠুরিগুলোর প্রায় দ্বিগুণ এটা। অন্য একটা মেয়ের সঙ্গে জব আগেই পৌঁছে গেছে সেখানে। বেশ আড়ষ্ট দেখলাম ওকে। দুশ্চিন্তায় আছে সম্ভবত—যদি এই মেয়েটাও প্রেম নিবেদন করে বসে?

এই গুহার দেয়ালেও খোদাই করা সূক্ষ্ম ভাস্কর্য। বিষয়বস্তু মৃত্যু, মৃতদেহের সংরক্ষণ এবং সৎকার। গুহার প্রতি পাশে একটা করে পাথর কেটে বানানো টেবিল। চওড়ায় প্রায় তিন ফুট, উঁচু তিন ফুট ছয় ইঞ্চি। টেবিলের পাশে দেয়াল ঘেঁষে একটা করে ছোট বেঞ্চ মতো। বেঞ্চ এবং টেবিল—সবগুলোই আটকানো গুহার মেঝের সাথে। অর্থাৎ পাহাড় কুঁদে যখন গুহা তৈরি করা হয়েছিলো আসবাবপত্রগুলোও সে সময়ই তৈরি করা হয়েছিলো। টেবিলের ওপর খাবার সাজানো—পরিষ্কার কাঠের থালায় সেদ্ধ ছাগলের মাংস, সদ্য দোয়ানো দুধ এবং ছাতুর তৈরি পিঠা।

খাওয়া শেষ করে লিওর কাছে ফিরে এলাম আমরা। এই টুক সময়ের ভেতর আরো খারাপ হয়েছে ওর শরীর। অনবরত হাত-পা ছুঁড়ছে আর ভুল বকছে। ওকে জড়িয়ে ধরে শান্ত করার চেষ্টা করছে উস্তেন। কিন্তু পারছে না। আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে বসলাম ওর পাশে। আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর একটু শান্ত হলো লিও। ভুলিয়ে ভালিয়ে একমাত্র কুইনাইন খাইয়ে দিলাম ওকে।

এক ঘন্টার ওপর হয়ে গেছে, বসে আছি লিওর পাশে। ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছে গুহার ভেতরটা। এমন সময় বিলালি এসে হাজির। ব্যস্তসমস্ত ভঙ্গি। জানালো, রানী নিজে আমার সাথে দেখা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আমার জন্যে যে এটা দুর্লভ

BanglaBook.org

সম্মানের ব্যাপার তা-ও জানাতে ভুললো না।

খবরটা শুনে খুব একটা উৎফুল্ল হতে পারলাম না আমি। অসুস্থ লিওর জন্যে দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে আছে মন। এর ভেতর কোথাকার কোন্ রানী দেখা করতে চাইলো কি না চাইলো তাতে কি এসে গেল? তবু বিলালির অনুরোধে তার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে পড়ে থাকা উজ্জ্বল কিছু একটার ওপর চোখ পড়লো আমার। তুলে নিলাম জিনিসটা।

পাঠকের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে, সূক্ষ্ম কারুকাজ করা রূপার বাক্সে একটা ছোট্ট গোল মোহর ছিলো। একটা সোনার আংটির ওপর সেটা বসিয়ে নিয়েছিলো লিও। মোহরটা এত ছোট যে আংটির ওপর সেটা বসাতে কোনো অসুবিধাই হয়নি। সব সময় ওটা পরে থাকতো লিও। সেই আংটিটাই এইমাত্র কুড়িয়ে নিলাম আমি। জ্বরের ঘোরে লিও যখন অস্থির ভাবে হাত-পা ছুঁড়ছিলো তখন বোধহয় খুলে পড়ে গেছিলো ওটা। রেখে গেলে হারিয়ে যেতে পারে ভেবে আংটিটা আমি হাতে পরে নিলাম।

বিলালির সঙ্গে লিওর গুহা থেকে মূল গুহায় বেরিয়ে এলাম। আমার দিকে তাকিয়ে চোখে চোখে ইশারা করলো বৃদ্ধ গোত্রপতি। ছোট গুহার বাঁ দিকের মুখটা দেখাল। তারপর এগোলো সেদিকে। আমিও এগোলাম পেছন পেছন। গুহাটার মুখে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে দুই রক্ষী। আমাদের দেখে মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো তারা। এরপর হাতের লম্বা বর্শা দুটো আড়াআড়ি ভাবে কপালের সামনে ধরে দাঁড়িয়ে রইলো। মাথা নিচু করে সেগুলোর নিচ দিয়ে এগোলাম আমরা। কয়েক পা যেতেই আমাদেরকে যে ধরনের কামরায় থাকতে দেয়া হয়েছে হুবহু সেরকম একটা কামরায় আবিষ্কার করলাম নিজেকে। পার্থক্য একটাই, যে পথে আমরা ঢুকেছি সেটা ছাড়াও একটা বা বেরোনোর আর একটা পথ আছে এটায়। অত্যন্ত উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত কুঠুরিটা। দু'জন পুরুষ এবং দু'জন বোবা-কালা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো এরাও, তারপর পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। মেয়ে দুটো সামনে, পুরুষ দু'জন পেছনে, আমি আর বিলালি মাঝখানে। অনেকগুলো পর্দা টানা গুহামুখ পেরিয়ে, ছোট বড় গুহার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললো আমাদের ছোট মিছিল। অবশেষে আর একটা গুহামুখের সামনে পৌঁছুলাম আমরা। এখানেও দেখলাম, হলদেটে আলখাল্লা পরা দু'জন রক্ষী পাহারা দিচ্ছে গুহামুখ। এরাও মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো। কপালের কাছে অস্ত্র তুলে ভেতরে ঢোকার পথ করে দিলো।

ভারি পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমরা। বিরাট একটা গুহা। লম্বায় প্রায় চল্লিশ ফুট, চওড়ায়ও একই রকম। অনেকগুলো প্রদীপের আলোয় আলোকিত। আট দশ জন

BanglaBook.org

মহিলা, বেশির ভাগই যুবতী এবং সুন্দরী, গদির ওপর বসে হাতির দাঁতের সুঁই দিয়ে সেলাইয়ের কাজ করছে। এই মেয়েগুলোও যথারীতি বোবা-কালা। গুহার শেষ মাথায় আর একটা প্রবেশ পথ। সুন্দর প্রাচ্যদেশীয় কারুকাজ করা ভারি পর্দা দিয়ে ঢাকা। আগের গুহামুখগুলোয় যত পর্দা দেখেছি তার একটাও এটার মতো নয়। অত্যন্ত রূপসী দুই বোবা সুন্দরী দাঁড়িয়ে প্রবেশ পথের দু'পাশে। আমরা এগিয়ে যেতে বুক পর্যন্ত মাথা নুইয়ে সম্মান জানালো তারা। সোজা হয়ে দুদিক থেকে দু'জনে হাত বাড়িয়ে তুলে ধরলো পর্দা। এর পরই অদ্ভুত এক আচরণ করলো বিলালি। হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে বসে পড়লো মাটিতে। বৃদ্ধের চেহারায় যে সৌম্য সম্ভ্রান্ত ভাব তার সাথে এ আচরণকে কিছুতেই মেলাতে পারলাম না। হাঁটু আর হাতে ভর দিয়ে গুঁড়ি মেরে ঢুকছে নতুন গুহাটায়। আমি এখনো সোজা দাঁড়িয়ে অনুসরণ করছি তাকে। গুঁড়ি মারা অবস্থায়ই ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো বিলালি।

'বসে পড়ো, পুত্র; বসে পড়ো, বেবুন, হাঁটু আর হাতে ভর দাও। "সে"র সামনে যাচ্ছি আমরা। যথাযোগ্য সম্মান না দেখালে মুহূর্তে ছাই হয়ে যাবে!'

থেমে পড়লাম আমি। হাঁটু দুটো নিজের অজান্তেই ভাঁজ হয়ে যেতে চাইলো। পরমুহূর্তে সচেতন হলাম আমি—কেন এমন অপমানজনক আচরণ করবো? আমি ইংরেজ, কেন জংলী এক মহিলার সামনে বানরের মতো হাঁটু গেড়ে বসবো, হলোই বা বিলালির ভাষায় আমার চেহারা বেবুনের মতো? উঁহুঁ, কিছুতেই না। পরে যদি জীবন-মরণ সমস্যা দেখা দেয় তখন দেখা যাবে। বিলালির কথায় কান না দিয়ে দৃঢ় পায়ে হেঁটে চললাম আমি।

অদ্ভুত প্রাচুর্যের সমাহার এই গুহায়। দেয়ালগুলো জমকালো পর্দায় ঢাকা। এমন মনোমুগ্ধকর কাজ পর্দাগুলোয়, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মেঝেতে পাতা গালিচার মতো ভারি শতরঞ্চি। গুহার এখানে ওখানে ছড়িয়ে আছে অনেকগুলো কালো আবলুস কাঠের ওপর হাতির দাঁতের কাজ করা গদিমোড়া আসন। প্রত্যেকটা আসনেই ঠেস দেয়ার ব্যবস্থা। গুহার শেষ প্রান্তে খানিকটা জায়গা আলাদা পর্দা দিয়ে ঘেরা। ভেতরে আলো থাকায় বাইরে থেকে ঝকঝকে দেখাচ্ছে। আমি আর বিলালি ছাড়া কোনো লোক নেই গুহায়।

অবশেষে গুহার মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছুলাম আমরা। হামাগুড়িতেও আর চললো না এবার। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়তে হলো বিলালিকে। হাত দুটো এমন ভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে যেন মারা গেছে। অল্প কিছুক্ষণের ভেতর দ্বিতীয় বারের মতো হতভম্ব হলাম আমি। কি করবো বুঝতে না পেরে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে কেমন

BanglaBook.org

একটা অনুভূতি হলো, আমি আর বিলালি শুধু নয়, আরো কেউ আছে এই কুঠুরিতে— সামনের ঐ পর্দা ঘেরা জায়গার ভেতর থেকে তাকিয়ে আছে আমাদের দিকে। আমি তাকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু সে ঠিকই দেখতে পাচ্ছে আমাকে। কেন জানি না, সন্ত্রস্ত বোধ করতে লাগলাম আমি। সন্দেহ নেই জায়গাটা অদ্ভুত। চারদিকে কারুকাজ করা পর্দা, তার ওপর প্রদীপের ম্লান আলো পড়ে রহস্যময় একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কিন্তু এমন গা শির শির করা অনুভূতি হওয়ার মতো কিছু তো নয়! নাকি বিলালির মতো একজন দুঁদে গোত্রপতি ভয়ে আধমরা হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়েছে দেখে এমন লাগছে?

অপেক্ষার দীর্ঘ সেকেণ্ডগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে এক এক করে। মিনিটে পরিণত হচ্ছে। তারপর আরও মিনিট। এখনো প্রাণের কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। কোনো পর্দার একটা প্রান্তও একটু কাঁপেনি এখনো। অজানা এক ভয় ক্রমশ গ্রাস করছে আমাকে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠছে ভুরুর ওপর।

অবশেষে—কতক্ষণ পর জানি না—ধীরে ধীরে নড়তে শুরু করলো সামনের একটা পর্দা। চমকে সচেতন হলাম আমি। কে আছে পর্দার পেছনে?—কোনো নগ্ন জংলী রানী? অপরূপা কোনো প্রাচ্যদেশীয় সুন্দরী? না চায়ের কাপ হাতে উনিশ শতকীয় কোনো যুবতী? কোনো ধারণা নেই আমার। স্থির চোখে তাকিয়ে আছি সদ্য নড়ে ওঠা পর্দার দিকে।

সামান্য ফাঁক হলো পর্দা। তারপর হঠাৎ সেটার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সুন্দর সুগোল একটা শাদা হাত। তুষারের মতো শাদা। আঙুলগুলো লম্বা, ক্রমে সরু হয়ে এসেছে ডগার দিকে, শেষ হয়েছে গোলাপী নখ দিয়ে। আলতো করে পর্দার প্রান্ত ধরলো হাতটা। সামান্য টেনে আনলো এক পাশে। তার পরই একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, 'বিদেশী!'

মনে হলো এমন কোমল মিষ্টি কণ্ঠ আর কখনো শুনিনি আমি। ঝরনার মৃদু কল্লোলের কথা মনে পড়ে গেল আমার। আমাহ্যাগাররা যে ধরনের আরবী বলে তার চেয়ে অনেক সুন্দর এবং শুদ্ধ আরবীতে বললো, 'বিদেশী, এত ভয় পেয়েছো কেন?'

আচমকা এই প্রশ্ন শুনে হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি। ভয় পেয়েছি সত্যি, কিন্তু ও তা জানলো কি করে? এখনো তো আমাকে দেখেনি ও। প্রশ্নটার জবাব কি দেবো ঠিক করে ওঠার আগেই পুরো সরে গেল পর্দা। দীর্ঘ এক নারীর অবয়ব দেখতে পেলাম সামনে। অবয়ব বলছি, কারণ শুধু শরীর নয় মুখটাও তার ঢাকা শাদা প্রায় স্বচ্ছ রেশমী কাপড় দিয়ে। কাফন পরানো লাশের কথা মনে পড়ে গেল আমার। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠলাম একবার। প্রায় স্বচ্ছ কাপড়ের ভেতর দিয়ে তার গোলাপী শরীর দেখতে পাচ্ছি.

BanglaBook.org

সে শরীরের সৌন্দর্যও অনুভব করতে পারাই, তবু কেন যে এমন একটা উপমা মনে এলো ভেবে পেলাম না।

'এত ভয় পেয়েছো কেন, বিদেশী?' সেই মিষ্টি ঝরনার মতো গলা আবার জিজ্ঞেস করলো। 'আমার ভেতর এমন কি আছে যা দেখে ভয় পেতে পারে একজন পুরুষ? তাহলে বলতে হবে আগের চেয়ে অনেক বদলে গেছে পুরুষ জাত!' এরপর হঠাৎই শরীরে মৃদু দোলা দিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো সে, উত্তেজক ভঙ্গিতে উঁচু করলো একটা হাত, যেন তার সৌন্দর্যের সমস্তটাই দেখাতে চাইলো আমাকে।

কি বলবো বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কিছু একটা বলা দরকার।

'আপনার সৌন্দর্যই আমাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে, মহামান্য রানী,' অবশেষে বিনীত ভঙ্গিতে বললাম আমি।

'হুঁ, মিথ্যে চাটুকারি করে মেয়েদের ভোলানোর কৌশল তাহলে এখনো জানে পুরুষরা!' হাসলো সে। কিসের সঙ্গে তুলনা করবো সে হাসির? আমার মনে হলো, দূর থেকে ভেসে আসা রূপোর ঘন্টার মৃদু ধ্বনি যেন শুনলাম। তারপর আবার বললো, 'আহ্, বিদেশী, মিথ্যে বোলো না! স্বীকার করো আমার অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখে তুমি ভয় পেয়েছিলে। অবশ্য, মিথ্যে হলেও কথাটা তুমি বলেছিলে বেশ কায়দা করে, এবারের মতো ক্ষমা করা গেল তোমাকে। যত যা-ই হোক, মেয়ে তো আমি!

'এবার বলো, ঐ বিশাল জলাভূমি পেরিয়ে গুহাবাসীদের এই দেশে এলে কি করে? কি দেখতে এসেছো? তোমাদের প্রাণ কি এতই সস্তা যে তা "হিয়া'র" হাতে—"সে-যাকে মানতেই-হবে'র" হাতে তুলে দিতে না পারলে স্বস্তি পাচ্ছিলে না? আমার ভাষাই বা জানলে কি করে? এই প্রাচীন ভাষা কি এখনও প্রচলিত আছে পৃথিবীতে?'

এক মুহূর্ত থামলো সে। তারপর আবার বললো, 'দেখতেই পাচ্ছো, গুহা আর ধ্বংসস্তূপের মাঝে আমার বাস, দুনিয়ার আর কোনো কিছু সম্পর্কে জানি না আমি, জানার ইচ্ছেও নেই। আমি বেঁচে আছি, হে বিদেশী, কেবল আমার স্মৃতি নিয়ে, আর সে স্মৃতিও এমন এক কবরে প্রোথিত যার অর্চনা করে অপর হাত। কারণ, সত্যি কথা বলতে কি, মানুষের মন কখনোই সত্য-সুন্দরের পথে থাকতে চায় না।' শেষ দিকে এসে মৃদু হতে হতে এক সময় মিলিয়ে গেল তার গলা। হঠাৎ চোখ গেল মেঝেতে উপুড় হয়ে থাকা বিলালির দিকে। সংবিৎ ফিরে পেলো যেন সে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন জ্বলে উঠলো তার চোখে।

'হুঁ! তুমি, বুড়ো, আছো এখানে! তোমার গোত্রে ঐ সব উল্টোপাল্টা ঘটনা ঘটলো কি করে? আমার নিষেধ সত্ত্বেও তোমার সন্তানরা আমার অতিথিদের একজনকে গরম

BanglaBook.org

পাত্র করে খেলো কোন্ সাহসে? ওরা জানে না, দেহ থেকে প্রাণ একবার বেরিয়ে গেলে আমিও আর ফিরিয়ে আনতে পারি না? এ সবের মানে কি, বুড়ো? আমি যদি এখন চরম প্রতিশোধ নিতে চাই, কি করবে তুমি?'

'ও "হিয়া"! ও "সে"!' মেঝে থেকে মাথা না তুলেই ডুকরে উঠলো বৃদ্ধ। 'ও "সে", আপনি মহান, দয়া করুন আমাকে। আমি কোনো দোষ করিনি। আমি এখনো আপনার দাস, কীটানুকীট। ও "সে" আপনি যাদের আমার সন্তান বলছেন, তাদের চেয়ে খারাপ লোক হয় না। এক বেটি আপনার অতিথি শূকরছানার গলায় মালা দিয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়। স্বভাবতই সে খেপে ওঠে এবং অন্যদের সাথে দল পাকিয়ে আপনার অতিথি বেবুন এবং সিংহের সাথে আসা কালো অতিথিকে গরম পাত্র করে খাওয়ার চেষ্টা করে। কালো লোকটা সম্পর্কে তো আপনি কিছু বলেননি, বোধহয় সেজন্যেই অতখানি সাহস পেয়েছিলো ওরা। কিন্তু বেবুন আর সিংহ ব্যর্থ করে দিয়েছে ওদের সে চেষ্টা। কি ভয়ানক লড়াই না লড়তে হয়েছে আমার বেবুন, সিংহ আর শূকরছানাকে! ও "হিয়া," অপরাধীদের আমি সাথে করে নিয়ে এসেছি। আপনি আপনার মহত্ত্ব দিয়ে যা বিবেচনা হয়, করবেন।'

'হুঁ, বুড়ো, সব জানি আমি। ভয় পেও না। কাল বড় কামরায় বসবো, বিচার হবে ওদের। আর তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম এবারের মতো। তবে সাবধান, ভবিষ্যতে আর যেন কোনো গড়বড় না হয় তোমার গোত্রে!'

মাথা তুললো বিলালি। চোখে সকৃতজ্ঞ বিস্ময়। পর পর তিনবার মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করলো সে। তারপর যেমন এসেছিলো তেমনি হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে বেরিয়ে গেল কুঠুরি থেকে। আমি একা দাঁড়িয়ে রইলাম সেই ভয়ঙ্কর অথচ অদ্ভুত আহিনী মূর্তির সামনে।

তের

'গেছে বুড়ো হাবড়াটা,' বললো "সে"। 'ওহ্, জীবনে কি সামান্য জ্ঞানই না সঞ্চয় করে মানুষ! জলের মতো সংগ্রহ করে, জলের মতোই বেরিয়ে যায় আঙুলের ফাঁক গলে। ভেবেছো লোকটা জ্ঞানী, তাই না? কিন্তু কি বলে ও ডাকে তোমাকে। "বেবুন",' একটু হাসলো সে, 'অসভ্যদের কল্পনা শক্তি ঐ পর্যন্তই—একটা নাম রাখবে, তা-ও পশু-পাখির কাছে ছুটে যায়। তোমার দেশের লোকরা তোমাকে কি বলে ডাকে, বিদেশী?'

BanglaBook.org

'হলি, মহারাণী,' বললাম আমি।

'হলি,' অনেক কষ্টে সে উচ্চারণ করলো শব্দটা। 'হলি মানে কি?'

'হলি এক ধরনের কাঁটাওয়ালা গাছ।'

'আচ্ছা! তা যাই-বলো না কেন, দেখতে তুমি কিন্তু কাঁটাওয়ালা গাছের মতোই। দৃঢ় এবং কুৎসিত। তবে, আমার জ্ঞান যদি ত্রুটিপূর্ণ না হয়ে থাকে তাহলে বলবো, হাড়ে মজ্জায় সৎ তুমি, দুনিয়াদারি সম্পর্কে ভাবনা চিন্তা করারও প্রবণতা আছে তোমার ভেতর। কিন্তু, হলি, অমন গাছের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না তো, এসো, বসবে আমার সাথে। আমি চাই না, ঐ দাসনুদাসগুলোর মতো হামাগুড়ি দাও তুমি।' আমি যাতে ওপাশে যেতে পারি সেজন্যে পর্দা ঘেরা অংশের একটা পর্দা এক পাশে উঁচু করে ধরলো সে।

কম্পিত পায়ে ঢুকলাম আমি। তার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় অদ্ভুত এক সুগন্ধ এসে লাগলো আমার নাকে। একি তার গায়েরই সুগন্ধ না কিছু মেখেছে বুঝতে পারলাম না।

পর্দা ঘেরা জায়গাটা লম্বায় হবে বারো ফুট, চওড়ায় দশ। হেলান দেয়ার ব্যবস্থাওয়ালা একটা আসন আর একটা টেবিল এক পাশে। টেবিলের ওপর একটা পাত্রে টলটলে পানি আর নানান রকম ফল। পাশেই গোল একটা পাথরের বাটি। এটাও পানি ভর্তি। প্রদীপের মৃদু আলোয় জায়গাটা কোমল ভাবে আলোকিত। সেই আলোর ভেতর অনিশ্চিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

'বসো,' আসনটার দিকে ইঙ্গিত করে বললো সে। 'এখনো ভয় পাওয়ার মতো কিছু করোনি তুমি। করলে অবশ্য খুব বেশিক্ষণ ভয় পাওয়ার সুযোগ পাবে না, তার আগেই আমি তোমাকে হত্যা করবো। সুতরাং গোমড়া মুখটাকে প্রফুল্ল করে তোলো।'

আসনটার এক প্রান্তে বসলাম আমি। অন্য প্রান্তে গা এলিয়ে দিলো সে।

'এবার, হলি, বলো, আরবী বলতে শিখলে কি করে? আমার প্রিয় ভাষা এটা। জানো জন্মসূত্রে আমি একজন আরব?—"আল আরাব আল আরিবা," অর্থাৎ আরবের-ও আরব। কাহ্তানের পুত্র ইয়ারাব আমার পিতা। ইয়ামান অর্থাৎ সুখী প্রদেশের প্রাচীন নগরী ওজাল-এ আমার জন্ম। অবশ্য একেবারে আমাদের মতো করে তুমি বলতে পারো না ভাষাটা। হামিয়ার উপজাতির কথায় যে মিষ্টি সাংগীতিক টান, তা নেই তোমার কথায়। কিছু কিছু শব্দও যেন বদলে গেছে। এই আমাহ্যাগারগুলো তো আরো দুরবস্থা করে ছেড়েছে আমার ভাষার। ওদের সাথে কথা বলার সময় মনে হয় আলাদা কোনো ভাষায় কথা বলছি। যাক, বলো কি করে শিখলে আরবী।'

'চেষ্টা করে শিখেছি,' বললাম আমি। 'মিসর এবং আরো কিছু জায়গায় প্রচলিত এ

BanglaBook.org

জাগা।'

'তার মানে আরবীতে এখনো কথা বলে মানুষ? মিসর নামের দেশটাও টিকে আছে এখনো? সিংহাসনে এখন কোন্ ফারাও? পারস্যের ওকাস বা তার আওবাচ্চারাই কি এখনো শাসন করছে দেশটা?'

'না, পারসিয়ানরা অনেক আগেই বিতাড়িত হয়েছে মিসর থেকে—প্রায় দু'হাজার বছর আগে। তারপরে টলেমীয়, রোমান এবং আরো অনেক জাতি পারসিয়ানদের মত অমন গৌরবের শিখরে উঠেছে, দোর্দণ্ড প্রতাপে ঘুরে বেরিয়েছে নীলনদের ওপর দিয়ে। অবশেষে সময় ফুরিয়ে গেলে টুপ করে ঝরে পড়েছে। পারসিয়ান আর্তাজেরজেস সম্পর্কে কি জানেন আপনি?'

হাসলো সে, কোনো জবাব দিলো না। তার হাসির রিনরিনে শব্দ আবার ঠাণ্ডা একটা স্রোত বইয়ে দিলো আমার শরীরের ভেতর দিয়ে।

'এবং গ্রীস?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'গ্রীস নামের দেশটা কি আছে এখনো? আহ্, গ্রীকদের কি পছন্দই না করতাম আমি। দিনের মতো সুন্দর উজ্জ্বল লোকগুলো, বুদ্ধিমান, কিন্তু হৃদয় বলে কিছু ছিলো না।'

'হ্যাঁ, একটা গ্রীস এখনো আছে বটে। লোকও আছে সেদেশে। তবে আজকের গ্রীক জাতি আর প্রাচীন সেই গ্রীক জাতির ভেতর আকাশ পাতাল তফাৎ।'

'তাই নাকি। আচ্ছা হিব্রুদের খবর কি? এখনো কি ওরা জেরুজালেমে বাস করে? আর সেই মন্দীরটা? জ্ঞানী রাজা যেটা তৈরি করিয়েছিলো? ওখানে এখন কোন্ দেবতার পূজা হয়? ওদের মেসায়া (যীশু,খ্রীষ্ট) কি এসেছিলো?'

'ইহুদি জাতি ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়ার আনাচে কানাচে। ওদের সেই জেরুজালেম আর নেই। আর হেরোডের তৈরি সেই মন্দিরটা—'

'হেরোড! হেরোডকে তো আমি চিনি না। আচ্ছা বলে যাও।'

'রোমানরা পুড়িয়ে ফেলে মন্দিরটা। এখন সে জায়গায় মরুভূমি।'

'আচ্ছা, আচ্ছা! মহান জাতি ছিলো ওরা, ঐ রোমানরা—একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল!'

'Solitudinem faciunt Pacem appellant,' বললাম আমি।

'আরে আরে, তুমি দেখছি ল্যাটিনও জানো। উহ্! কতদিন পরে শুনলাম ল্যাটিন কথা! তবে তোমার উচ্চারণ কিন্তু রোমানদের মতো হয়নি। মনে হচ্ছে বহুদিন পর একজন পণ্ডিত লোকের সাক্ষাৎ পেয়েছি। গ্রীকও জানো নাকি?'

'হ্যাঁ, মহামান্য রানী, সমান্য হিব্রুও, তবে কথা বলতে পারি না। ওগুলো এখন

BanglaBook.org

মৃত ভাষা।'

বাচ্চা মেয়ের মতো হাত তালি দিয়ে উঠলো সে। 'সত্যিই, হলি, ফলবান গাছ তুমি। দূর থেকে মনে হয় কদাকার কুৎসিত, কাছে গিয়ে ভালো করে তাকালে দেখা যায় ফল, জ্ঞানের ফল। কিন্তু, ইহুদীরা···আহ্ কি ভীষণ ঘেন্না করতাম এই ইহুদীদের! ওদেরকে আমার দর্শন শোনাতে গিয়েছিলাম, ওরা আমাকে পৌত্তলিক বলে গাল দিয়েছিলো। ওদের মেসায়া কি এসেছিলো শেষ পর্যন্ত? সারা দুনিয়া নিজের শাসনে নিতে পেরেছিলো?'

'হ্যাঁ, তিনি এসেছিলেন। তবে বড় দীনহীনভাবে। ওরা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করে মেরেছে। কিন্তু এখনো তাঁর বাণী বেঁচে আছে, কারণ তিনি ছিলেন ঈশ্বরের পুত্র। এখন, সত্যি কথা বলতে কি, অর্ধেক দুনিয়া শাসন করছেন তিনি, যদিও একটা মাত্র সাম্রাজ্যের মাধ্যমে নয়।'

'আহ্, নিষ্ঠুর নেকড়ের দল। যে এসেছিলো ত্রাণ করতে তাকেই কিনা মেরে ফেললি! জেরুজালেমে মন্দিরের সামনে আমার গায়েও পাথর ছুঁড়ে মেরেছিলো। আমিও গিয়েছিলাম ধর্মের কথা শোনাতে। এই দেখ, এখনো দাগ আছে!' সুগোল হাতের ওপর থেকে কাপড় সরিয়ে ফেললো সে। ধবধবে শাদা বাহুর ওপর ছোট্ট একটা লাল দাগ দেখতে পেলাম।

আবার শিরশির করে উঠলো আমার শরীর। বললাম, 'বেয়াদবি মাফ করবেন মহামান্য রানী, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না, প্রায় দু'হাজার বছর আগে মেসায়াকে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছে ইহুদীরা, তারও আগে কি করে ওদের ধর্মের কথা শোনাতে গিয়েছিলেন আপনি? আপনি তো রক্তমাংসের মানুষ, অশরীরী আত্মা নন। কি করে দু'হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে বেঁচে থাকে একজন মানুষ?'

আসনে হেলান দিলো সে। প্রায় স্বচ্ছ মুখাবরণের নিচে অদ্ভুত একজোড়া চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আবার আমি অনুভব করলাম আমার শরীরে।

'মনে হচ্ছে,' অবশেষে ধীরে ধীরে বললো সে। 'দুনিয়ার অনেক কিছু সম্পর্কেই কিছু জানো না তোমরা। ইহুদীদের মতো তোমরাও কি বিশ্বাস করো, সব কিছু মরে যায়? আমি বলছি, শোনো, কিছুই মরে না। মৃত্যু বলে কিছু নেই পৃথিবীতে, পরিবর্তন বলে একটা ব্যাপার অবশ্য আছে। দেখ,' পাথরের দেয়ালের ওপর কিছু ভাস্কর্যের দিকে ইশারা করলো সে, 'এই ছবিগুলো যারা বানিয়েছিলো, মহামারীর বিষনিঃশ্বাসে ধ্বংস হয়ে গেছে তারা। তিনবার দু'হাজার বছর করে পেরিয়ে গেছে তারপর। কিন্তু ওরা মরেনি, হয়তো এমুহূর্তে তাদের আত্মা চলে এসেছে এখানে,' চারপাশে একবার

BanglaBook.org

তাকালো সে। 'সত্যিই মাঝে মাঝে মনে হয়, আমার চোখগুলো দেখতে পাবে তাদের।'

'হ্যাঁ, কিন্তু পৃথিবীর কাছে তো তারা মৃত।'

'আঁ, হয়তো একটা বিশেষ সময়ের জন্যে, সেই সময় পরিধি শেষ হলে আবার তারা নতুন করে জন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসে। আমি, হ্যাঁ আমি, আয়শা—এটা আমার নাম, বিদেশী—আমি নিজে অপেক্ষা করে আছি একজনের জন্যে। তাকে আমি ভালোবাসি। নিশ্চিত জানি, সে আসবে, এবং আসবে এখানেই। এখানেই সে গ্রহণ করবে আমার ভালোবাসার অর্ঘ্য, যে অর্ঘ্য নিয়ে এখনো আমি অপেক্ষা করে আছি। কেন? বললে বিশ্বাস করবে না, আমি সর্বশক্তিমান, আমার সৌন্দর্য গ্রীসের হেলেনের সৌন্দর্যকেও হার মানায়, আমার জ্ঞান জ্ঞানী বাদশাহ সলোমনের জ্ঞানের চেয়েও গভীর, তোমরা যাকে মৃত্যু বলো সেই পার্থিব পরিবর্তনকে আমি কিছু দিনের জন্যে হলেও অতিক্রম করতে পেরেছি; তবু কেন আমি এই অসভ্য বর্বরদের মাঝে পড়ে আছি, জানো?'

'না,' বিনীতভাবে বললাম আমি।

'কারণ আমি আমার ভালোবাসার পাত্রের জন্যে অপেক্ষা করছি। প্রয়োজন হলে আরো পাঁচ হাজার বছর অপেক্ষা করবো। আমাকে খুঁজতে খুঁজতে সে আসবে এখানে। তার সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করেছিলাম সেবার। তবু আমার বিশ্বাস, এবার ওর মন গলবে। আমার সৌন্দর্যের খাতিরে হলেও গলবে।'

কয়েক মুহূর্ত হতবুদ্ধির মতো বসে রইলাম আমি। আমার সব জ্ঞান বুদ্ধি গুলিয়ে যেতে চাইছে।

'কিন্তু মহামান্য রানী,' অবশেষে কথা ফুটলো আমার মুখে, 'আমরা মানুষরা যদি যুগে যুগে নতুন করে জন্ম নিই—ও, আপনার ক্ষেত্রে তো তা হচ্ছে না,' আবার সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। 'আপনি তো,' তাড়াতাড়ি যোগ করলাম আমি, 'একবারও মরেননি।'

'ঠিক,' বললো সে, 'এবং সম্ভব হয়েছে অর্ধেকটা ভাগ্যক্রমে আর অর্ধেকটা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় রহস্যগুলোর একটার সমাধান করেছি আমি। বলো, বিদেশী, জীবন যখন আছে, কেন তাকে একটু দীর্ঘায়িত করা যাবে না? জীবনকে ধরে রাখার সেই কৌশলই আমি আয়ত্ত করেছি। যদি মন মেজাজ ভালো থাকে তাহলে ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে আরো আলাপ করা যাবে। এখন বলো দেখি, কি করে আমি টের পেলাম তোমরা আসছো এবং গরম পাত্রের হাত থেকে বাঁচালাম তোমাদের, একবারও ভেবেছো?'

BanglaBook.org

'জ্বি,' অবাক হয়েছি, কিন্তু কোনো উত্তর পাইনি।'

'তাহলে এসো, ঐ পানির ওপর তাকাও,' গোল গামলার মতো পাত্রটার দিকে ইশারা করলো সে।

উঠে টেবিলের কাছে গিয়ে তাকালাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে কালো হয়ে গেল পানিটুকু। একটু পরেই আবার স্বচ্ছ। যা দেখার কথা জীবনে কল্পনা করিনি তা-ই দেখলাম এবার—স্পষ্ট দেখলাম, আমাদের নৌকা সেই ভয়ঙ্কর খালের জলে ভাসছে। খোলের ভেতর শুয়ে ঘুমাচ্ছে লিও, মুখ দেখা যাচ্ছে না। মশার কামড় থেকে বাঁচার জন্যে একটা কোট মুড়ি দিয়ে আছে। আমি, জব আর মাহমুদ পাড়ের ওপর দিয়ে গুণ টেনে চলেছি। হুবহু যেমন ঘটেছিলো তেমন।

চমকে চিৎকার করে উঠলাম আমি, 'জাদু! এ জাদু!'

'না, না, হলি, জাদু নয়, এ হলো অজ্ঞতার স্বপ্ন। জাদু বলতে কিছু নেই পৃথিবীতে। প্রকৃতিতে এমন অনেক রহস্য আছে যার সমাধান হলে মনে হবে জাদু দেখছি। এই পানি আমার বীক্ষণ কাচ। ইচ্ছে করলেই আমি আমার জানা কোনো জায়গায় অতীতে কি ঘটেছে বা বর্তমানে কি ঘটছে, জানতে পারি। তবে হ্যাঁ, ভবিষ্যতের ব্যাপারে কোনো ক্ষমতা নেই আমার কাচের। সেদিন হঠাৎই আমার ইচ্ছে হয়েছিলো, যে দুর্গম খাল পেরিয়ে একদিন এ জায়গায় এসেছিলাম সে খালের চেহারা এখন কেমন হয়েছে একটু দেখি। মনে মনে কথাটা ভাবতেই কাচে ফুটে উঠলো দৃশ্য। তখনই প্রথম দেখি তোমাদের নৌকা। একজন শুয়ে আছে ভেতরে বাকিরা সবাই গুণ টানছো। এখানকার জংলীগুলোর রীতি তো জানি, সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের বাঁচানোর জন্যে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিলাম বিলালির কাছে। আচ্ছা, এখন তোমার যুবক সঙ্গীর কথা বলো, বুড়ো যাকে সিংহ বলে ডাকছিলো। ওর সঙ্গেও দেখা করতাম, কিন্তু ও তো অসুস্থ। মারামারির সময় আহতও হয়েছে।'

'ও ভীষণ অসুস্থ,' ভারাক্রান্ত গলায় বললাম আমি। 'আপনি কিছু করতে পারেন না ওর জন্যে? আপনি এতকিছু জানেন!'

'নিশ্চয়ই পারি। এক্ষুণি ওকে সুস্থ করে তুলতে পারি। কিন্তু ওর কথা উঠতেই এত বিমর্ষ হয়ে পড়লে কেন? যুবককে তুমি ভালোবাসো? ও কি তোমার ছেলে?'

'পালিত ছেলে, মহামান্য রানী! ওকে কি নিয়ে আসবো আপনার কাছে?'

'না। ক'দিন হলো ওর অসুখ?'

'আজ তৃতীয় দিন।'

'আর একদিন থাক তাহলে, দেখা যাক এর ভেতর নিজের শক্তিতেই সেরে ওঠে

BanglaBook.org

কিনা। ওষুধ দিলে এক্ষুণি ভালো হয়ে যাবে, কিন্তু তা আমি চাই না। আমার ওষুধের যা ক্ষমতা, তাতে ওর শরীরের ভেতরটা পুরো নাড়া খেয়ে যাবে। কাল রাতের ভেতর যদি ঠিক না হয়, তাহলে আমি যাবো ওর কাছে। ওর সেবা করছে কে?'

'আমাদের শ্বেতাঙ্গ ভৃত্য। বিলালি ওর নাম দিয়েছে শূকর-ছানা। আর···' একটু ইতস্তত করে শেষে যোগ করলাম, 'আর একটা মেয়ে, নাম উস্তেন। এদেশেরই মেয়ে। আমরা ওদের ওখানে পৌঁছার পরই ও আলিঙ্গন করে লিওকে। আপনাদের জাতির বিয়ের রীতি সম্পর্কে ঐ সময়ই প্রথম জানতে পারি আমরা।'

'আমাদের জাতি! আমার জাতি সম্পর্কে কিছু বোলো না। এই ক্রীতদাসগুলো আমার জাতির কেউ নয়। কুকুর ছাড়া কিছু মনে করি না ওদের। আর হ্যাঁ, আমাকে অত রানী রানী করবে না, খোশামুদি আমি একদম পছন্দ করি না, আয়শা বলে ডাকবে আমাকে। নামটা খুব মিষ্টি লাগে আমার কানে। আর এই উস্তেনটা কে? যার সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছিলো আমাকে, সে-ই না তো?' শেষ কথা ক'টা যেন নিজেকেই শোনালো সে। তারপর শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'দেখ তো, এই মেয়ে কিনা?'

পানির দিকে তাকালাম আমি। অস্পষ্ট ভাবে উস্তেনের মুখটা দেখতে পেলাম। ঝুঁকে আবেগঘন চোখে দেখছে লিওকে।

'এ-ই সে,' মৃদুস্বরে বললাম আমি। 'ঘুমন্ত লিওর দিকে তাকিয়ে আছে।'

'লিও!' আপন মনে উচ্চারণ করলো আয়শা। 'তার মানে ল্যাটিন ভাষায় সিংহ। এক বারের জন্যে হলেও ঠিক ঠিক নাম দিয়েছে তাহলে বুড়ো। আশ্চর্য,' নিজে নিজে বলে চললো সে, 'খুবই আশ্চর্য! এত সাদৃশ্য—কিন্তু এ সম্ভব নয়।' অস্থির ভাবে আবার একটা হাত পানির ওপর দিয়ে নিয়ে গেল সে। কালো হয়ে গেল জল। তাকিয়ে রইলো আয়শা। মুহূর্ত পরেই আবার স্বচ্ছ হয়ে গেল পানি। মুখ তুললো সে।

'যাওয়ার আগে আর কিছু জিজ্ঞেস করবে, হলি? এখানে থাকতে খুব কষ্ট হবে তোমাদের, আমি নিজে তো নরক যন্ত্রণা ভোগ করছি। এই যে ফল দেখছো, কি সুন্দর! কিন্তু বিস্বাদ লাগে আমার কাছে। কেবল ভাবি, কবে আমার অপেক্ষার পালা শেষ হবে। যাহোক, আমার মেয়েরা তোমাদের দেখাশোনা করবে।—জানো তো ওরা বোবা-কালা? চাকর হিসেবে এমন লোকই ভালো, তাই না? আমি অমন ভাবেই প্রজনন ঘটিয়েছি ওদের। কয়েক শতাব্দী কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। তারপরে এসেছে সাফল্য। আগেও একবার সফল হয়েছিলাম, কিন্তু চেহারা এমন কুৎসিত হয়েছিলো যে সব ক'টাকে মেরে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলাম। একবার দৈত্যাকৃতি মানুষের এক

BanglaBook.org

প্রজাতিও তৈরি করেছিলাম। বেশিদিন টেকেনি ওরা। যাকগে, আর কিছু জানতে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ, একটা ব্যাপার, আয়শা,' দৃঢ় গলায় বললাম। টের পাচ্ছি, গলায়, চেহারায় যত দৃঢ়তাই ফুটিয়ে তুলি না কেন, মনে মনে মোটেই তত দৃঢ়তা অনুভব করতে পারছি না। 'আমি আপনার মুখ দেখতে চাই।'

নির্ঝরের আওয়াজ তুলে হাসলো সে। 'ভেবে দেখ, হলি। ভালো করে ভেবে দেখ। গ্রীসের সেই পুরাণ কাহিনী তোমার জানা আছে নিশ্চয়ই? অ্যাকতিওন নামের সেই লোকটা মারা গেছিলো, তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয় এত বেশি সৌন্দর্য দেখে ফেলেছিলো সে। আমার মুখ দেখলে তোমারও হয়তো তেমন শোচনীয় পরিণতি হবে। অক্ষম বাসনায় জ্বলে পুড়ে হয়তো নিজের হৃৎপিণ্ড নিজে ছিঁড়ে খাবে। আমি তোমার জন্যে নই—একজন ছাড়া কোনো মানুষের জন্যেই নই।'

'আপনি ঠিকই বলেছিলেন, আয়শা, আমি আপনার সৌন্দর্যকে ভয় করি না। কোনো মহিলার সৌন্দর্যই আমাকে মুগ্ধ করে না কারণ, জানি, সব সৌন্দর্যই একদিন ঝরে যাবে ফুলের মতো।

'না, তুমি ভুল করছো, সব সৌন্দর্যই ঝরে যায় না। আমি যতদিন বেঁচে থাকবো আমার সৌন্দর্যও ততদিন অক্ষুণ্ন থাকবে। একবার কারো সামনে আমার সৌন্দর্য উন্মোচিত হলে সে আর তা ভুলতে পারে না। বন্যার তোড়ের মতো সব ডুবিয়ে ধেয়ে আসতে চায় আমার দিকে। সেজন্যেই এই অসভ্যদের ভেতরে গেলেও আমি মোটা টেনে যাই। বলো, এখনো দেখতে চাও তুমি?'

'হ্যাঁ, চাই!' অদম্য হয়ে উঠেছে আমার কৌতূহল।

শাদা সুগোল একটা বাহু উঁচু করলো সে—এমন হাত জীবনে কখনো দেখিনি আমি! আস্তে, খুব আস্তে, চুলের নিচে হাত চালিয়ে একটা বাঁধন খুললো। তারপর হঠাৎ সেই লম্বা কাফনের মতো কাপড়টা খুলে পড়ে গেল তার শরীর থেকে। আমার চোখজোড়া উঠতে শুরু করলো তার গা বেয়ে। ধবধবে শাদা প্রায় স্বচ্ছ একটা ঝুলপোশাক এখন তার পরনে! নিখুঁত রাজকীয় দেহটার ভাঁজগুলো আড়াল করার চেয়ে প্রকট করে তোলার দায়িত্বই যেন পালন করছে সে পোশাক। ছোট ছোট সুন্দর পা দুটোয় চটি, সোনার পেরেক সাগানো। তারপর গোড়ালি, দুনিয়ার সেরা ভাস্কর স্বপ্নেও কখনো এমন নিখুঁত গোড়ালি দেখেনি। নিরেট সোনার তৈরি একটা দুই মাথাওয়ালা সাপ কোমরের সাথে এঁটে রেখেছে শাদা আলখাল্লাটা। এর ওপর থেকেই তার অপরূপ দেহসুষমা ঢেউয়ের মতো রেখায় ক্রমশ স্ফীত হয়ে উঠেছে। সে সৌন্দর্যের কথা বর্ণনা

BanglaBook.org

করে বোঝানো সম্ভব নয়। তুষার ধবল স্তন দুটোর উপর যেখানে ভাঁজ হয়ে আছে তার বাহু যুগল সেখানে শেষ হয়েছে আলখাল্লার প্রান্ত। আরো ওপরে তার মুখের দিকে তাকালাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেলাম ভেতরে ভেতরে। স্বর্গবাসী দেবীদের সৌন্দর্যের কথা শুনেছিলাম, এখন দেখলাম। এই নিখাদ সৌন্দর্যের তুলনা চলে কেবল আগুনের সঙ্গে, যা মনকে বিন্দুমাত্র শান্তি দেয় না, পোড়ায়, পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। কি করে এর বর্ণনা দেবো আমি জানি না, সত্যিই জানি না। দুনিয়ার কোনো কিছুর সঙ্গে এর তুলনা চলে না। বিশাল কালো একজোড়া চোখের কথা বলতে পারি, বাঁকানো ধনুকের মতো ভুরুর কথা বলতে পারি, উজ্জ্বল ত্বকের কথা বলতে পারি, কিন্তু তাতে কি কিছু বোঝা গেল? সৌন্দর্যের স্বরূপ কি উন্মোচন করতে পারলাম পাঠকের সামনে? স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। অদৃশ্য কোনো চৌম্বক শক্তির প্রভাবে যেন আমার চোখ দুটো সেঁটে আছে তার মুখের ওপর। ফেরাতে পারছি না।

আমার দুরবস্থা দেখে হেসে উঠলো সে। পাগল করা সঙ্গীতের মতো সেই হাসি!

'মূর্খ মানুষ!' বললো সে। 'অ্যাকতিওনের মতো জেদ করেছিলে তুমি। সাবধান, অ্যাকতিওনের মতো শোচনীয় পরিণতি তোমারও হতে পারে। কারণ, ও হলি, আমিও একজন কুমারী দেবী। একজন ছাড়া আর কোনো পুরুষ আমাকে পাবে না। বলো, এখনো কি যথেষ্ট দেখনি?'

'মনে হচ্ছে, আমি অন্ধ হয়ে গেছি,' কর্কশ গলায় কথাটা বলে হাত দিয়ে চোখ ঢাকলাম আমি।

'আগেই তো বলেছিলাম, হলি, দেখতে চেও না। আমার সৌন্দর্য বিদ্যুতের মতো। সুন্দর, কিন্তু ধ্বংস করে—বিশেষ করে গাছ,' আবার মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলো সে।

হাসতে হাসতেই আমার হাত ঢাকা মুখের দিকে তাকালো আরশী। অমনি হাসি মিলিয়ে গেল তার মুখ থেকে। আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, কঠোর হয়ে উঠেছে তার চেহারা। চোয়ালগুলো দৃঢ় হয়ে গেছে। প্রাণের সব লক্ষণ দূর হয়ে গেছে মুখ থেকে। ছোবল দেয়ার আগে সাপ যেমন করে তেমনি মাথাটা পেছন দিকে হেলিয়ে বললো, 'তোমার হাতের ঐ গোল মোহরটা কোথায় পেয়েছো? বলো, না হলে এইমুহূর্তে তোমাকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেবো,' এক পা সামনে এগিয়ে এলো সে। ভয়ানক এক দ্যুতি দেখতে পাচ্ছি তার চোখে। থর থর করে কেঁপে উঠলো আমার ভেতরটা।

আমি কিছু বলার আগেই আবার সে বলে উঠলো, 'শান্ত হও, হলি!' আবার আগের মতো কোমল হয়ে গেছে তার গলা। 'তোমাকে খুব ভয় পাইয়ে দিয়েছি, ক্ষমা করো। সীমাবদ্ধের জড়তা দেখে অসীম মন হঠাৎ হঠাৎ এমন অস্থির হয়ে ওঠে যে কি বলবো।

BanglaBook.org

যাকগে, যা জানতে চাইছিলাম, গোল মোহরটা—কোথায় পেয়েছো?'

'কুড়িয়ে,' কোনো মতে উচ্চারণ করলাম।

'আশ্চর্য!' কাঁপা কাঁপা গলায় বললো আয়শা, হঠাৎ যেন নিছক একটা মেয়ে মানুষে পরিণত হয়েছে সে। 'হুবহু ওরকম একটা গোল মোহর আমি একজনের গলায় দেখেছিলাম। লোকটাকে আমি ভালোবেসেছিলাম।' হঠাৎ যেন একটু ফুঁপিয়ে উঠলো সে। 'তাহলে, এটা না, একই রকম দেখতে অন্য কোনোটা হবে। সেটা তো এরকম আংটির ওপর লাগানো ছিলো না! ঠিক আছে, হলি, এখন তুমি যাও। আর হ্যাঁ, আয়শার সৌন্দর্য দেখেছো, কথাটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করো।' ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলো সে।

চোদ্দ

রাত দশটার দিকে টলতে টলতে কোনোরকমে বিছানায় গিয়ে পড়লাম। গুছিয়ে ভাবতে পারছি না কিছু। এতক্ষণ যা শুনলাম, যা দেখলাম সব সত্যি না স্বপ্ন? দু'হাজার বছরেরও বেশি বয়সের এক যুবতীর সাথে এইমাত্র কথা বলে এলাম, এ-ও কি সম্ভব? আর তার সেই ভয়ানক সৌন্দর্য? রক্তমাংসের কোনো মানুষ এত রূপসী হতে পারে? তাহলে কি ভৌতিক কোনো ব্যাপার? অসম্ভব, আমার বিজ্ঞানমনস্ক মন ভূতপ্রেতে কখনোই আস্থা আনতে পারে না। তাহলে যা দেখে এলাম তা কি বাস্তব? পাগল হয়ে যাবো নাকি?

মাথার চুল খামচে ধরে লাফিয়ে উঠলাম বিছানা ছেড়ে। সত্যি পাগল হয়ে যাবো, নাকি ইতিমধ্যেই গেছি? গোল মোহরটার কথা কি বলছিলো সে? জিনিসটা লিওর। ভিনসি দিয়ে গিয়েছিলো। ভিনসি পেয়েছিলো কোথায়? তার পূর্বপুরুষদের কাছে। তাহলে কি সব সত্যি? যদি তা-ই হয়, আয়শা যার জন্যে অপেক্ষা করে আছে সে কি লিও? অসম্ভব! কে কবে কোথায় শুনেছে মানুষ মৃত্যুর পর জন্ম নেয় আবার?

কিন্তু কোনো মহিলার পক্ষে যদি দু'হাজার বছরেরও বেশি বেঁচে থাকা সম্ভব হয় তাহলে পুনর্জন্ম অসম্ভব হবে কেন?

হঠাৎ করেই আমার মনে পড়লো লিওর কথা। অনেকক্ষণ কোনো খবর জানি না ওর। আশ্চর্য! আমার এত অধঃপতন হয়েছে, প্রাণপ্রিয় লিওর খোঁজ পর্যন্ত নিতে ভুলে গেছি! তাড়াতাড়ি বিছানার পাশে রাখা জ্বলন্ত প্রদীপটা তুলে নিয়ে খালি পায়ে নিঃশব্দে এগোলাম ওর গুহার দিকে। রাতের মৃদু বাতাসে পর্দা দলছে। পা টিপে টিপে ঢুকে

BanglaBook.org

পড়লাম লিওর কামরায়। এখানেও একটা প্রদীপ জ্বলছে বিছানার পাশে। শুয়ে আছে লিও। যদিও ঘুমিয়ে আছে কিন্তু জ্বরের ঘোরে এপাশ ওপাশ করছে। পাথরের একটা আসনে হেলান দিয়ে ঝিমোচ্ছে উস্তেন।

বেচারা লিও! গালটা ওর টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। চোখের কোলে কালি। ঘন ঘন পড়ছে ভারি নিঃশ্বাস। আবার কথাটা আমার মনে হলো, বাঁচবে তো লিও? যদি বেঁচে যায়, নিশ্চয়ই আয়শার ব্যাপারে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে ও। ও যুবক, তার ওপর সুপুরুষ—অসম্ভব সুপুরুষ; আর আমি মধ্যবয়সী প্রৌঢ়, কুৎসিত। কোনো আশা নেই আমার। ছি! কি ভাবছি আমি এসব। লিওর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবো আমি তা—ও আবার প্রেমের ব্যাপারে! ধিক আমাকে!

যাক, ধন্যবাদ ঈশ্বরকে, আমার ভালোমন্দের বোধ এখনো লুপ্ত হয়নি। 'সে' তার সৌন্দর্য দিয়ে এখনো খুন করতে পারেনি আমার এই বোধকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি প্রার্থনা করলাম—কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করলাম, আমার ছেলে, ছেলের চেয়েও বেশি, যেন ভালো হয়ে ওঠে।

যেভাবে এসেছিলাম তেমনি নিঃশব্দে ফিরে এলাম নিজের গুহায়। প্রদীপটা নামিয়ে রাখলাম মাথার কাছে। ঘুম আসছে না এখনো। পায়চারি করতে লাগলাম গুহার এমাথা ওমাথা। হঠাৎ দেখলাম পাথরের দেয়ালে সরু একটা ফাটল, আগে কখনো খেয়াল করিনি। প্রদীপ তুলে নিয়ে পরীক্ষা করলাম ফাটলটা। একজন মানুষ কোনোমতে ঢুকতে পারে। ওপাশে নিকষ অন্ধকার। একটু ভয় পেলাম মনে মনে। যত অস্থিরই হই না কেন, এটুকু বোঝার মতো বুদ্ধি এখনো লোপ পায়নি যে, এরকম রহস্যময় জায়গায় শোয়ার কুঠুরি থেকে অজানা গোপন পথ বেরোনোটা খুব স্বস্তিজনক ব্যাপার নয়। যদি এখানে কোনো গুপ্তপথ থেকেই থাকে তাহলে জানতে হবে, কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তা।

ঢুকে পড়লাম ফাটলটায়। এগিয়ে চললাম। কিছু দূর যাওয়ার পর দেখলাম এক প্রস্থ সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলাম আমি। আরেকটা সরু পথ, আরো নিখুঁত ভাবে বললে, সুড়ঙ্গে এসে পড়লাম। আগের মতো পাহাড় কেটে বানানো। এগিয়ে চললাম সুড়ঙ্গ ধরে।

কবরের মতো নিস্তব্ধতা। গা ছমছম করছে। তবু যেন কিসের অদম্য আকর্ষণে এগিয়ে চলেছি আমি। প্রায় পঞ্চাশ গজ মতো চলার পর সমকোণে এগিয়ে যাওয়া আরেকটা সুড়ঙ্গের মুখে এলাম। নতুন সুড়ঙ্গটায় মাত্র ঢুকেছি এ সময় ভয়ানক এক ব্যাপার ঘটলো। জোরে হাঁটছি বলে, না কি কারণে জানি না নিবে গেল প্রদীপটা।

BanglaBook.org

নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ভেতর দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। এই অন্ধকারে ফিরবো কি করে? হোঁচট খেয়ে নাক-মুখ ভাঙবে নির্ঘাৎ! সঙ্গে দেশলাই নেই যে নতুন করে জ্বালিয়ে নেবো প্রদীপ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম। নিরেট অন্ধকারের দেয়াল ছাড়া কিছু চোখে পড়লো না। সামনে তাকালাম—একই রকম অন্ধকার। কিন্তু, না! বহু দূরে অস্পষ্ট একটা আলোর রেখা যেন দেখা যাচ্ছে! নিশ্চয়ই আলোকিত কোনো গুহা ওটা। ওখানে গিয়ে জ্বেলে নিতে পারবো প্রদীপ।

সুড়ঙ্গের গা হাতড়ে অনেক কষ্টে এগিয়ে চললাম। পা দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করছি সুড়ঙ্গের মেঝে। যদি কোনো গর্ত থাকে তাহলেই হয়েছে। না মরলেও হাত-পা কিছু একটা যে ভাঙবেই তাতে সন্দেহ নেই। আলোর উৎসটা এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একটা গুহার মুখে টানানো পর্দা ভেদ করে আসছে সুড়ঙ্গে। আর কয়েক পা গেলেই পৌঁছে যাবো গুহামুখে। কিন্তু, ও কি? ও ঈশ্বর!

বেশি বড় নয় গুহাটা! দেখে মনে হচ্ছে কোনো সমাধিকক্ষ। মাঝামাঝি জায়গায় জ্বলছে একটা অগ্নিকুণ্ড। আশ্চর্য, আগুন জ্বলছে কিন্তু ধোঁয়া উঠছে না! সেই আগুনের আলোয় আলোকিত গুহাটা। বাঁ পাশে দেয়াল ঘেঁষে পাথরের একটা তাক। তার ওপর পড়ে আছে যে জিনিসটা তাকে লাশ ছাড়া আর কিছু বলার উপায় নেই। অন্তত দেখে সে-রকমই মনে হচ্ছে। শাদা কাপড়ের মতো কিছু একটা বিছানো তার ওপর। ডান দিকে একই রকম আরেকটা তাক। কারুকাজ করা একটা কাপড় বিছানো সেটার ওপর। মাটিতে আগুনের সামনে একটু ঝুঁকে বসে আছে একটা নারীমূর্তি। লাশটার দিকে মুখ করে আছে সে। আগুনের লকলকে শিখার দিকে চোখ। আমি তার পাশটা কেবল দেখতে পাচ্ছি। কালো একটা দীর্ঘ আংরাখা তার পরনে। সবে মাত্র আমি সিদ্ধান্ত নিতে শুরু করেছি, কি করবো, এমন সময় হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো নারীমূর্তি। গায়ের আংরাখাটা খুলে ছুঁড়ে দিলো এক পাশে।

নারীমূর্তি আর কেউ নয়, 'সে' নিজে!

সন্ধ্যায় আমার পীড়াপীড়িতে কাফনের মতো আলখাল্লাটা খুলে ফেলার পর যে পোশাক ছিলো সেই পোশাক এখন তার গায়ে। ধবধবে শাদা, বুকের কাছে অনেকখানি নামানো, কোমরে আঁটা দুই মাথাওয়ালা সোনার সাপ। তার বিশাল চুলের রাশি এখনো তেমনি ছাড়া রয়েছে। নেমে এসেছে প্রায় পাছা পর্যন্ত। কিন্তু এবার যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে বেশি করে চোখে পড়লো তা তার সৌন্দর্য নয়। সৌন্দর্য এখনো আছে, কিন্তু তা ছাপিয়ে অব্যক্ত এক যন্ত্রণা, অন্ধ এক আবেগ আর ভীষণ এক প্রতিশোধ স্পৃহা ফুটে উঠেছে তার চেহরায়।

BanglaBook.org

এক মুহূর্ত স্থির দাঁড়িয়ে রইলো সে। তারপর ধীরে ধীরে হাত দুটো তুললো উপরে। ঠিক সেই সময় তার পোশাকের ঊর্ধ্বাংশটুকু পিছলে নেমে এলো সোনালি কটিবন্ধের কাছে। উন্মুক্ত হয়ে গেল তার নিটোল শরীরের উপরের অংশ। দাঁড়িয়ে রইলো সে। মুঠো পাকিয়ে উঠেছে হাতদুটো। আরো হিংস্র হয়েছে মুখের ভাব।

হঠাৎ আমার মনে হলো, এখন যদি ও আমাকে এখানে এভাবে দেখে, তাহলে কি হবে? কথাটা মনে হতেই অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম আমি। কিন্তু তবু, কি যেন এক অমোঘ আকর্ষণে নড়তে পারলাম না সেখান থেকে।

মুঠো পাকানো হাত দুটো নেমে এলো পাশে। আবার উঠলো। অবাক বিস্ময়ে দেখলাম, হাত উঁচু করার সাথে সাথে আগুনের শিখাও লকলকিয়ে বেড়ে উঠে প্রায় ছাদের কাছে পৌছালো। তীব্র আলোয় ভরে উঠলো গুহা।

আবার নেমে এলো হাত দুটো। তারপর সে কথা বলে উঠলো, বলা যায় হিসহিসিয়ে উঠলো আরবীতে। এমন একটা ভঙ্গি তার গলার স্বরে, আমার রক্ত হিম হয়ে যেতে চাইলো।

'অভিশাপ পড়ুক ওর ওপরে, অনন্ত অভিশাপ।'

বাহু দুটো আবার উপরে তুললো সে। অমনি আগুনের শিখা লকলকিয়ে পৌছুলো ছাদের কাছে। নেমে এলো বাহু দুটো। সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হয়ে এলো আগুনের শিখা।

'অভিশপ্ত হোক ওর স্মৃতি—সেই মিসরীয়ের স্মৃতির মতো অভিশপ্ত।'

আবার উঁচু হলো হাত, আবার লকলকিয়ে উঠলো আগুনের জিহ্বা। আবার নেমে এলো।

'অভিশপ্ত হোক নীলনদের কন্যা, কারণ ও সুন্দরী।'

আবার উপরে উঠলো হাত, আবার নেমে এলো।

'অভিশপ্ত হোক ও, কারণ ওর জাদুর কাছে পরাভূত হয়েছিলাম আমি।'

'অভিশাপ পড়ুক ওর ওপর, কারণ, আমার প্রিয়তমকে ও আমার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলো।'

আবার হাত উঁচু করে নামিয়ে আনলো সে। আবার লকলকিয়ে উঠে স্তিমিত হলো আগুনের শিখা। আর চাপা ক্রোধ মেশানো কণ্ঠে নয়, দু'হাতে এবার চোখ ঢেকে চিৎকার করে উঠলো সেঃ

'এখন আর অভিশাপ দিয়ে লাভ কি? ও জয়ী হয়ে চলে গেছে সে।'

তারপর আরো তীব্র গলায় সে বললো, 'যেখানে আছে সেখানেই ওর ওপর অভিশাপ পড়ুক। আমার অভিশাপ ওর শান্তি নষ্ট করে দিক। ওর ছায়াও অভিশপ্ত হোক।'

'আমার শক্তি সেখানেও ওকে তাড়া করে ফিরুক।'

BanglaBook.org

'যেখানে আছে সেখানে বসেই যেন আমার কথা শুনতে পায় ও। ভয়ে যেন আঁধারের আড়ালে লুকায়।'

'নৈরাশ্যের অসীম গহ্বরে নিমজ্জিত হোক ও, একদিন ওকে আমি খুঁজে বের করবোই।'

আবার স্তিমিত হয়ে এলো আগুন। আবার সে চোখ ঢাকলো হাত দিয়ে।

'লাভ নেই—কোনো লাভ নেই,' আর্তনাদ করে উঠলো সে। 'যে ঘুমিয়ে আছে তার কাছে কে পৌঁছুতে পারে? এমন কি আমিও না।'

আবার সে শুরু করলো জঘন্য শাপশাপান্ত।

'আবার যখন ও জন্ম নেবে, তখন যেন ওর ওপর অভিশাপ পড়ে। অভিশপ্ত হয়েই যেন সে জন্মায়।'

'হ্যাঁ, অভিশাপ নিয়েই যেন ও জন্মায়, তখন আমি ওর ওপর আমার প্রতিশোধ চরিতার্থ করতে পারবো। শেষ করে দেবো ওকে, নিশ্চিহ্ন করে দেবো।'

এভাবে চললো আরো কিছুক্ষণ। অবশেষে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো সে। ঘন মেঘের মতো কালো চুল ঢেকে ফেললো তার মুখ, বুক। বসে বসে ফোঁপাতে লাগলো সে।

'দু'হাজার বছর,' কান্নাভেজা করুণ স্বরে বললো সে। 'দুই হাজার বছর ধরে আমি অপেক্ষা করে আছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী নিঃশব্দে পার হয়ে গেছে, কিন্তু আমার মনের জ্বালা তো একটুও কমেনি!

'ওহ্, প্রিয়তম! প্রিয়তম! প্রিয়তম! এই বিদেশী কেন এভাবে তোমার কথা আমাকে মনে করিয়ে দিলো? গত পাঁচশো বছরে তো এমন কষ্ট আর পাইনি। যে পাপ আমি করেছিলাম তোমার কাছে, তার প্রায়শ্চিত্ত কি এখনো হয়নি? কেন আমি তোমার সঙ্গেই মরে গেলাম না? আমি তোমাকে মারলাম, আমি কেন মরলাম না? হায়, আমি মরতে পারি না" মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগলো সে।

অনেকক্ষণ পর হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো আবার। দ্রুত হাতে উর্ধ্বাঙ্গের কাপড় ঠিক করে এগিয়ে গেল পাথরের ওপর শোয়ানো মূর্তিটার দিকে।

'ও ক্যালিক্রেটিস!' চিৎকার করে উঠলো সে। নামটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কেঁপে উঠলাম আমি। 'আবার আমি দেখবো তোমার মুখ। জানি আরো কষ্ট পাবো, তবু দেখবো।' কম্পিত হাতে মৃতদেহ ঢেকে রাখা কাপড়ের এক কোনা ধরলো সে। কি মনে হতেই ছেড়ে দিলো আবার।

'তুলবো তোমাকে?' বললো সে। 'আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমি তা পারি।' দু'হাত বাড়িয়ে দিলো সে কাপড়ঢাকা দেহটার ওপর। দু'চোখ ভরা আতঙ্ক নিয়ে আমি পেছন থেকে দেখলাম, কাপড়ের নিচের স্থির মূর্তিটা নড়তে শুরু করেছে।

BanglaBook.org

হঠাৎই হাত দুটো সরিয়ে আনলো সে। নড়াচড়া থেমে গেল মূর্তির।

'কি লাভ?' করুণ হয়ে উঠলো তার গলা। 'জীবন্তের সাদৃশ্য দিতে পারবো তোমাকে, কিন্তু আত্মা তো দিতে পারবো না। আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও তুমি আমাকে চিনতে পারবে না। আমার প্রাণই তোমার ভেতরে ঢুকে তোমাকে সচল করবে। কি লাভ তাতে, ক্যালিক্রেটিস, কি লাভ?'

কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো সে। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো মূর্তিটার পাশে। আবার কাঁদতে শুরু করেছে। আর দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন মনে করলাম না আমি। টলতে টলতে ফিরে চললাম অন্ধকার সুড়ঙ্গ ধরে। ঐ নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের ভেতর দিয়ে কি করে এগোলাম জানি না। শুধু মনে আছে দু'বার আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছি। একবার দুই সুড়ঙ্গের সংযোগস্থলে পৌঁছে, আরেকবার সিঁড়ির মুখে। দ্বিতীয়বার পড়ে যাওয়ার পর আর উঠতে পারলাম না। ওখানেই বসে রইলাম। বেশ অনেকক্ষণ পর সংবিৎ ফিরতে পেছন ফিরে দেখলাম বহুদূরে সুড়ঙ্গের শেষ মাথায় ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে। এবার আর পথ চলতে অসুবিধা হলো না। নিরাপদেই পৌঁছুলাম আমার গুহায়। কোনোমতে গিয়ে শুলাম বিছানায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘুম।

পনেরো

ঘুম ভাঙতেই জবের ওপর চোখ পড়লো আমার। কাপড়-চোপড় সব গোছগাছ করে রেখে হাত-মুখ ধোয়ার জায়গায় পানির পাত্রটার সামনে গিয়ে গজ গজ করছে।

'একটু যদি গরম পানি পাওয়া যেতো এই জংলীর দেশে!'

'কি ব্যাপার, জব?'

'ও, স্যার, আপনি জেগে? আমি ভেবেছিলাম বুঝি ঘুমিয়ে আছেন এখনো।'

'লিও কেমন আছে?'

'একই রকম, স্যার। শিগগির শিগগির কিছু একটা না করতে পারলে ওকে বাঁচানো যাবে বলে মনে হয় না। ঐ জংলী উস্তেন, স্যার, যথেষ্ট করছে ওর জন্যে। সারাক্ষণ আছে ওকে নিয়ে। আমাকে পর্যন্ত কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। আপনি কি এখন উঠবেন, স্যার? ন'টা বেজে গেছে।'

এমনিতেই কাল রাতের ঘটনায় এখনো বিকল হয়ে আছে মন, তার ওপর লিওর এই খবর। ঝটপট উঠে হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় পরে নিলাম। খাওয়ার কুঠুরিতে গিয়ে

BanglaBook.org

অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিছু মুখে দিলাম। তারপর গেলাম লিওর কাছে। উস্তেনকে জিজ্ঞেস করলাম কেমন আছে ও। জবাবে নিঃশব্দে মাথা নেড়ে একটু কাঁদলো মেয়েটা। বিলালি ঢুকলো এই সময়। সে-ও মাথা নাড়লো। বললো, 'রাত নাগাদ মারা যাবে ও।'

'ঈশ্বর না করুন। ওকথা বলবেন না, পিতা,' শঙ্কিত কণ্ঠে বললাম আমি।

'"সে" তোমাকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, বেবুন,' লিওর ঘরের বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বললো বৃদ্ধ। 'কিন্তু সাবধান, পুত্র, কাল তুমি শুয়ে পড়ে সম্মান দেখাওনি তাঁকে। আজ তিনি বড় কামরায় বসবেন। সিংহ আর তোমার ওপর যারা হামলা করেছিলো তাদের বিচার হবে। আজও যেন কালকের মতো কোরো না। এখন এসো, তাড়াতাড়ি।'

বৃদ্ধের পেছন পেছন এগোলাম আমি। বিশাল 'বড় কামরায়' পৌঁছে দেখলাম, অনেক ক'জন আমাহ্যাগার জড়ো হয়েছে সেখানে। দু'একজনের গায়ে লিনেনের আলখাল্লা, বাকিরা কেবল চিতার চামড়া পরে আছে। এই গুহারও দেয়ালে ভাস্কর্য খোদাই করা। এবং প্রতি বিশ বা বাইশ পা পর পর একটা করে মুখ, সমকোণে বেরিয়ে গেছে বাইরের দিকে।

অবশেষে গুহার শেষ প্রান্তে পৌঁছুলাম আমরা। সামনে পাথরের একটা বেদী মতো। কালো কাঠের ওপর হাতির দাঁতের কাজ করা একটা গদিমোড়া আসন তার ওপর। বেদীর দু'পাশে দুটো প্রবেশ পথ। বিলালি জানালো, দুটো পথই দুটো গুহায় গিয়ে শেষ হয়েছে। গুহা দুটো মৃতদেহে পূর্ণ। 'সত্যি কথা বলতে কি,' যোগ করলো সে, 'পুরো পাহাড়টাই মৃতদেহে ভর্তি, এবং প্রায় সবগুলোই এখনো অবিকৃত রয়েছে।'

প্রচুর লোক জড়ো হয়েছে বেদীর সামনে। নারী, পুরুষ দু'রকমই। স্বভাবসুলভ গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে সবাই।

হঠাৎ সমবেত কণ্ঠে একটা গুঞ্জন উঠলো, 'হিয়া! হিয়া!' ('সে! সে!') পরমুহূর্তে সব ক'জন লোক সটান শুয়ে পড়লো মাটিতে। স্থির হয়ে পড়ে রইলো, যেন অজ্ঞাত কোনো কারণে একসাথে মারা গেছে সবাই। আমি কেবল দাঁড়িয়ে রইলাম—একা। এর পরই বাঁ দিকের একটা মুখ দিয়ে সারি বেঁধে একদল লোক ঢুকলো। বেদীর দু'পাশে অবস্থান নিলো তারা। তাদের পেছন পেছন এলো এক কুড়ি বোবা-কালা পুরুষ। তারপর সমান সংখ্যক মহিলা বোবা-কালা, প্রত্যেকের হাতে প্রদীপ। অবশেষে শাদা আলখাল্লায় আবৃত দীর্ঘ এক নারীমূর্তি। 'সে'। বেদীর ওপর উঠে আসনে বসলো আয়শা। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে গ্রীক ভাষায় বললো, 'এখানে এসো, হলি। আমার পায়ের কাছে বোসো। দেখ, যারা তোমাদের হত্যা করতে চেয়েছিলো তাদের কি

BanglaBook.org

বিচার করি।'

মাথা নুইয়ে কুর্নিশ করলাম আমি। কথা মতো বেদীর ওপর উঠে তার পায়ের কাছে বসলাম।

'রাতে ঘুম কেমন হয়েছে, হলি?' জিজ্ঞেস করলো সে।

সত্যি কথাই বললাম, 'খুব ভালো না, আয়শা!'

একটু হাসলো সে। 'আমিও ভালো ঘুমোতে পারিনি কাল রাতে। স্বপ্ন দেখেছি। আমার ধারণা তুমিই স্বপ্নগুলো টেনে এনেছো আমার মনে।'

'কি স্বপ্ন, আয়শা?'

'একজনকে দেখেছি, তাকে আমি ঘৃণা করি; আর একজনকে দেখেছি, তাকে ভালোবাসি।' এরপরই প্রসঙ্গ বদলালো সে। রক্ষীদের দলনেতার দিকে তাকিয়ে আরবীতে নির্দেশ দিলো, 'নিয়ে এসো লোকগুলোকে

মাথা প্রায় মাটিতে ছুঁইয়ে সম্মান জানালো দলনেতা। তারপর অধীনস্তদের নিয়ে বেরিয়ে গেল ডানদিকের একটা পথ দিয়ে।

নীরবতা নেমে এলো গুহায়। কাপড়ে ঢাকা মুখটা হাতে ভর দিয়ে গভীর চিন্তায় ডুবে গেল আয়শা। কিছুক্ষণ পর অনেক মানুষের সম্মিলিত পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল ডান দিকের সেই পথে। একটু পরেই এক এক করে ঢুকতে লাগলো তারা। প্রথমে কয়েকজন রক্ষী। তারপর অপরাধীরা। জনাবিশেক হবে। বিষণ্ন চেহারা প্রত্যেকের। তারপর আরো কয়েকজন রক্ষী। বেদীর সামনে পৌঁছেই দর্শকদের মতো মাটিতে শুয়ে পড়তে গেল অপরাধীরা। কিন্তু 'সে' বাধা দিলো ওদের।

'না,' কোমল গলায় বললো আয়শা। 'দাঁড়িয়ে থাকো। আমি যিনতি করছি, দাঁড়িয়ে থাকো। শিগগিরই হয়তো এমন সময় আসবে যখন শুয়ে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়বে তোমরা।' বলেই খিলখিল করে হেসে উঠলো সে।

বিমর্ষ মুখগুলোয় আতঙ্কের ছায়া পড়লো। সেদিন আমাদের সাথে যে আচরণই করে থাকুক না কেন, এ মুহূর্তে আমি ওদের জন্যে দুঃখ বোধ না করে পারলাম না।

আবার নীরবতা নেমে এসেছে গুহায়। এক এক করে প্রতিটা হতভাগার মুখ দেখছে আয়শা। অবশেষে, প্রায় দু'তিন মিনিট পর কথা বললো সে।

'এদের চেনো, অতিথি?'

'হ্যাঁ, মহামান্য রানী, প্রায় সবাইকে,' জবাব দিলাম আমি। শোনার সঙ্গে সঙ্গে আরো করুণ হয়ে উঠলো লোকগুলোর চেহারা।

'তাহলে বলো ঘটনাটা। যদিও আমি আগেই শুনেছি, তবু আবার শুনবো,

BanglaBook.org

উপস্থিত এরাও শুনবে।'

সংক্ষেপে আমি বললাম সেই বর্বর ভোজের কাহিনী। নিঃশব্দে শুনলো সবাই। আমি শেষ করতেই বিলালিকে ডাকলো আয়শা। যেমন শুয়ে ছিলো তেমনি শুয়ে রইলো বৃদ্ধ। কেবল মাথাটা সামান্য উঁচু করে সমর্থন করলো আমার বক্তব্য। আর কোনো প্রমাণ বা সাক্ষী হাজির করা হলো না।

'আমরা সবাই শুনলাম,' অনেকক্ষণ পর বললো 'সে'। স্পষ্ট করে, মেপে মেপে উচ্চারণ করছে প্রতিটা শব্দ। 'কি বলার আছে তোমাদের, অবাধ্য সন্তানরা? বলো, কেন তোমাদের শাস্তি দেয়া হবে না?'

কিছুক্ষণ কোনো জবাব শোনা গেল না। অবশেষে দশাসই চেহারার এক লোক, মাঝবয়সী, জবাব দিলো। সে জানালো, তারা যে নির্দেশ পেয়েছিলো, তাতে বলা হয়েছিলো, শাদা মানুষদের যেন কিছু না করা হয়। কালো চাকরটা সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। সেজন্যেই প্রথা অনুযায়ী তারা তাকে গরম পাত্র করে খাওয়ার সাহস দেখিয়েছিলো। সে-সময় আমরা বাধা দেয়ায় তারা খেপে গিয়ে আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছিলো। সেজন্যে তারা অত্যন্ত দুঃখিত এবং মর্মাহত। এমনিতে আমাদের কোনো ক্ষতি করার ইচ্ছে তাদের ছিলো না। সবশেষে তাদেরকে এবারের মতো মাফ করে দেয়ার বিনীত আবেদন জানালো লোকটা। অবশ্য তার মুখ দেখেই আমি বুঝলাম ক্ষমা পাবার আশা সে বিশেষ একটা করছে না।

আবার অখণ্ড নীরবতা গুহায়। দর্শকরা মুখ গুঁজে পড়ে আছে। রক্ষীরা দাঁড়িয়ে আছে, নির্বিকার। প্রত্যেকের হাতে বর্শা, ছোরা। আসামীরাও দাঁড়িয়ে আছে মুখ নিচু করে। আর আমাকে পায়ের কাছে নিয়ে বসে আছে আয়শা। মুখ তুলে একবার দেখার চেষ্টা করলাম তার মুখের ভাব। কিন্তু ঘোমটার জন্যে দেখতে পেলাম না কিছু। তবু কেন জানি না মনে হচ্ছে, ভয়ানক কিছু ঘটবে এবার।

'শেয়াল কুকুরের দল,' নিচু গলায় শুরু করলো সে। তারপর ক্রমশ উঁচু গ্রামে চড়তে লাগলো তার গলা। অদ্ভুত এক শক্তির প্রকাশ শুনতে পাচ্ছি সে স্বরে। 'মানুষখেকোর দল, দুটো অপরাধ করেছিস তোরা। প্রথমত, শাদা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও এই বিদেশীদের আক্রমণ করেছিস, দ্বিতীয়ত, এদের চাকরকে হত্যা করেছিস। শুধু এই অপরাধেই তোদের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। সবচেয়ে বড় কথা, আমাকে অমান্য করার সাহস দেখিয়েছিস তোরা। তোদের ধাত্রীপিতা বিলালির মাধ্যমে আমার নির্দেশ পাঠাইনি তোদের কাছে? বলিনি যত্নের সঙ্গে গ্রহণ করতে হবে এই বিদেশীদের? তবু কেন ওদের গায়ে হাত তুলেছিস? ছোটবেলা থেকে তোদের শেখানো হয়নি, "সে"র

BanglaBook.org

আইন অলংঘনীয়? তোরা কি জানিস না, আমার কথাই আইন? আর তা অমান্য করলে পাহাড় ভেঙে পড়তে পারে মাথার ওপর?

'ভালো করেই জানতি তোরা, দুরাচারের দল। তোদের হাড়ে, মজ্জায় দুর্মতি, তাই তোরা আমার আদেশ অমান্য করার সাহস দেখিয়েছিস। এর জন্যে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে তোদের। শাস্তি--গুহায় নিয়ে গিয়ে জল্লাদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে। আগামী কাল সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলবে শাস্তি। তারপরও যারা বেঁচে থাকবে তাদের হত্যা করা হবে।'

থামলো সে। আতঙ্কের একটা গুঞ্জন উঠলো গুহা জুড়ে। অপরাধীরা বুঝতে পেরেছে, নিস্তার নেই। সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কেঁদে কেঁদে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলো তারা। মায়া হলো আমার। আয়শাকে অনুরোধ করলাম, যেন ক্ষমা করা হয় ওদের। অন্তত কম যন্ত্রণাদায়ক কোনো উপায়ে যেন শাস্তি দেয়া হয় লোকগুলোকে। কিন্তু অনমনীয় রইলো সে। গ্রীক ভাষায় বললোঃ

'শোনো, হলি, এ হতে পারে না। এই নেকড়েগুলোকে যদি ক্ষমা করি, তাহলে আর একদিনও এদের ভেতরে নিরাপদ রইবে না তোমাদের প্রাণ। এদের তুমি চেনো না। বাঘের চেয়ে হিংস্র এরা। রক্তের গন্ধ পেলে কিছুতেই মাথা ঠিক রাখতে পারে না। কিভাবে এদের শাসনে রাখি জানো? আমার রক্ষীদল দেখে হয়তো ভাবছো শক্তি দিয়ে। কিন্তু আসলে তা নয়, ভয় দেখিয়েই এদেরকে পথে রেখেছি এখনো। এই বিশটা লোককে যন্ত্রণা দিয়ে মেরে কি লাভ আমার? কিছুই না। তবু আমার হুকুমের কোনো নড়চড় হবে না। কারণ, তাহলেই এরা নরম ভেবে বসবে আমাকে। তারপর আর কিছুতেই এদের বশে রাখা যাবে না। না, হলি, না, মরতেই হবে ওদের, এবং যেভাবে বলেছি সেভাবেই।' তারপর হঠাৎ রক্ষীদের দলনেতার দিকে ফিরে যোগ করলো, 'যেভাবে বলেছি ঠিক সেইভাবেই!'

ষোল

বন্দীদের নিয়ে যাওয়ার পর হাত নাড়লো আয়শা। দর্শকরা উল্টোদিকে ঘুরে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল গুহা ছেড়ে। তাদের রানী আর আমি রইলাম কেবল। রানীর কয়েকজন পরিচারক-পরিচারিকা এবং রক্ষীও রইলো। এই সুযোগ, ভেবে, অসুস্থ লিওকে দেখতে যাওয়ার জন্যে বললাম আয়শাকে। রাজি হলো না সে। বললো, রাতের

BanglaBook.org

আগে নিশ্চয়ই মারা যাবে না ছেলেটা। এ ধরনের রোগে মানুষ মরে হয় রাতে নয় ভোর বেলা। সুতরাং দিনের বাকি সময়টুকু অপেক্ষা করলে খুব একটা অসুবিধা হবে না।

আর কি করতে পারি আমি? বিদায় নেয়ার জন্য উঠলাম। কিন্তু আমাকে যেতে দিলো না আয়শা। বললো, 'এবার তোমাকে বিস্ময়কর কিছু জিনিস দেখাবো, হলি। থাকো আমার সাথে। এই বিশাল গুহার দিকে তাকাও। এমন কিছু আর দেখেছো জীবনে? এখানে যে জাতি বাস করতো তারা হাত দিয়ে খোদাই করেছিলো এসব। কত লোক কত সময় ধরে করেছিলো এ কাজ বলো দেখি?'

'নিঃসন্দেহে হাজার হাজার লোকের হাজার বছরেরও বেশি লেগেছিলো,' জবাব দিলাম আমি।

'ঠিক তাই, হলি। মিসরীয়দের চেয়েও প্রাচীন ছিলো সে জাতি। ওদের ভাষা সামান্য পড়তে পারি আমি। এদিকে এসো, দেখ এখানে কি লিখেছে ওরা।'

বেদীর ওপর যেখানে বসেছিলো আয়শা ঠিক তার পেছনে দেয়ালে খোদাই করা একটা ছবি। হাতির দাঁতের ছড়ি হাতে এক বৃদ্ধ বসে আছে। তার নিচে খোদাই করা কতকগুলো অক্ষর। দেখতে অনেকটা চীনা অক্ষরের মতো। লেখাটা পড়ে অনুবাদ করে শোনালো আয়শাঃ

"রাজকীয় কোর নগরীর পত্তনের চার হাজার দু'শো উনষাটতম বছরে কোর-এর রাজা তিসনো-এর সময় এই গুহার (অথবা সমাধিস্থানের) নির্মাণ কাজ শেষ হয়। এখানকার মানুষ এবং তাদের দাসরা তিন পুরুষ যাবৎ পরিশ্রম করে পরবর্তী বংশধরদের জন্যে এই সমাধিস্থান নির্মাণ করে। স্বর্গের আশীর্বাদ নেমে আসুক তাদের কাজের ওপর এবং পরাক্রমশালী সম্রাট তিসনোর ওপর।"

'দেখেছো, হলি,' বললো আয়শা। 'এই গুহা তৈরির কাজ শেষ হওয়ার চার হাজার বছরেরও বেশি আগে ওরা নগরীর পত্তন করেছিলো। প্রথম যখন আমি এখানে আসি, দু'হাজার বছর আগে, তখনও এ জায়গার অবস্থা এখন যেমন দেখছো, হুবহু তেমন ছিলো। এখন বুঝে দেখ, কত পুরানো নগরটা। এবার চলো, তোমাকে দেখাই, সেই মহান জাতির যখন পতন হলো তখন তাদের অবস্থা কেমন হয়েছিলো।'

গুহার মাঝামাঝি জায়গায় আমাকে নিয়ে গেল আয়শা। মেঝেতে গোল একটা পাথর দেখালো। একই রকম অক্ষরে কি যেন লেখা এটার ওপরেও।

'বলো তো, কি লেখা এতে?' জিজ্ঞেস করলো আয়শা।

'জানি না।'

এবারও লেখাগুলো অনুবাদ করে শোনালো সেঃ

BanglaBook.org

"আমি, জুনিস, কোর-এর প্রধান মন্দিরের একজন পুরোহিত, কোর নগরীর পত্তনের চার হাজার আটশো তিন বছর পর এই কথা লিখছি। কোর-এর পতন হয়েছে। এর বিশাল কামরাগুলোয় আর কোনো ভোজোৎসব হবে না, দুনিয়ার ওপর তার কর্তৃত্ব শেষ, তার নৌবহর দুনিয়ার বন্দরে বন্দরে আর বাণিজ্য করে বেড়াবে না। কোর-এর পতন হয়েছে। এর সুউচ্চ সৌধসমূহ, বন্দরগুলো, খালগুলো সব নেকড়ে, পেঁচা আর বুনো হাঁসের বিচরণভূমি হবে। এককুড়ি পাঁচ চাঁদ আগে একটা মেঘ এসে স্থির হয় কোর-এর আকাশে। সেই মেঘ থেকে নেমে আসে মড়ক। অসহায়ভাবে মরতে থাকে তার অধিবাসীরা। বৃদ্ধ-যুবক, নারী-পুরুষ; ধনী-নির্ধন, রাজকুমার-দাস কেউ বাদ যায়নি। এত প্রচুর সংখ্যায় তারা মরেছে যে, কোর-এর সন্তানদের মৃতদেহ প্রথাসিদ্ধ উপায়ে সংরক্ষণ করাও সম্ভব হয়নি। এই গুহার নিচে যে বিশাল গহ্বর তার ভেতরে ফেলে দেয়া হয় মৃতদেহগুলো। শেষ পর্যন্ত এই মহান জাতির বেঁচে যাওয়া সামান্য কিছু মানুষ কোনোমতে উপকূলে পৌঁছে জাহাজে চাপে, এবং পাল তুলে উত্তর দিকে রওনা হয়ে যায়। আমি, পুরোহিত জুনিস, এই উপাখ্যানের লেখক, একা কেবল বেঁচে আছি এই বিশাল নগরীতে। অন্য কোনো নগরীতে আর কেউ বেঁচে আছে কিনা জানি না। মৃত্যুর আগে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে একথা আমি লিখে রেখে যাচ্ছি, কারণ, রাজকীয় কোর-এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত, এর মন্দিরে উপাসনা করার কেউ নেই, প্রতিটা জায়গা শূন্য; এর রাজপুত্র, সেনাধ্যক্ষ, সওদাগর, সুন্দরী রমণীরা—সবাই হারিয়ে গেছে দুনিয়া থেকে।"

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার বুক চিরে। কি ভয়ঙ্কর ঘটনা। প্রবল পরাক্রমশালী এক রাষ্ট্রের শেষ জীবিত ব্যক্তি লিখে রেখে গেছে এই ইতিহাস। কথাটা মনে হতেই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো আমার শরীর।

'তোমার কি মনে হয়, হলি,' আমার কাঁধে একটা হাত রেখে বললো আয়শা। 'উত্তর দিকে যারা গিয়েছিলো তারাই কি মিসরীয়দের পূর্বপুরুষ?'

'জানি না, আমার শুধু মনে হচ্ছে, পৃথিবীটা খুব পুরানো।'

'পুরানো? হ্যাঁ, তা বটে। যুগে যুগে কত জাতির বিকাশ হয়েছে। একটার চেয়ে অন্যটা উন্নত, শক্তিশালী। একটাকে পরাভূত করে মাথা তুলেছে অন্যটা। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে একটা ছাড়িয়ে গেছে অন্যটাকে। কে জানে, হাজার হাজার বছর আগে দুনিয়ার কোথায় কি ঘটেছে, ভবিষ্যতেই বা কি ঘটবে? যাকগে, চলো, এই লেখায় যে বিশাল গহ্বরের কথা বলা হয়েছে, সেটা দেখাই তোমাকে। জীবনে এমন দৃশ্য আর কখনো দেখোনি তুমি।'

BanglaBook.org

তার পেছন পেছন পাশের একটা প্রবেশ পথ ধরে এগোলাম আমি। কিছুদূর যাওয়ার পর সিঁড়ি। নামতে শুরু করলাম আমরা। অসংখ্য ধাপ সিঁড়িটায়। নামছি তো নামছি। প্রায় ষাট ফুট মতো নেমে যাওয়ার পর শেষ হলো সিঁড়ি। উপর দিকে উঠে যাওয়া অদ্ভুতদর্শন গর্ত বা নল তৈরি করে বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এখানে।

এগিয়ে চললাম আমরা। হঠাৎ শেষ হয়ে গেল পথ। পেছন পেছন আসা কয়েকজন পরিচারিকাকে প্রদীপ উঁচু করে ধরতে বললো সে। তারপর যা দেখলাম, সত্যি সত্যি আগে কখনো তো দেখিইনি, ভবিষ্যতেও সম্ভবত দেখবো না। বিশাল একটা গর্তের কিনারে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। কত নিচে সেটার তলা জানি না। গর্তের কিনারাটা পাথরের নিচু একটা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। প্রদীপটা উঁচু হতেই আলো পড়লো ভেতরে। উঁকি দিতেই শির শির করে উঠলো শরীর। অসংখ্য মানব-কঙ্কালে ঠাসা গর্তটা। এমন ভয়ানক দৃশ্য দেখতে হবে সত্যিই কখনো কল্পনা করিনি। প্রদীপের মৃদু আলোয় দাঁত বের করে যেন ভেংচাচ্ছে শাদা হাড়ের স্তূপ।

'চলুন, আয়শা,' তাড়াতাড়ি বললাম আমি। 'যথেষ্ট দেখা হয়েছে। আর দেখতে চাই না।' ঘুরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যোগ করলাম, 'সেই মহা-মড়কে মরেছিলো যারা তাদের কঙ্কাল, তাই তো?'

'হ্যাঁ। মিসরীয়দের মতো কোর-এর লোকরাও মৃতদেহ সংরক্ষণ করতো। তবে মিসরীয়দের চেয়ে তাদের পদ্ধতি অনেক উন্নত ছিলো। মিসরীয়রা যেখানে মগজ বের করে নিতো, সেখানে কোর-এর ওরা শিরার ভেতর দিয়ে এক ধরনের তরল পদার্থ ঢুকিয়ে দিতো। সেই তরল পদার্থ সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে যুগ যুগ ধরে অবিকৃত রাখতো মৃতদেহ। চলো দেখাবো তোমাকে।'

সেই বিশাল গহ্বর থেকে বেরিয়ে একটা ছোট দরজার মতো প্রবেশপথের সামনে দাঁড়ালো সে। পরিচারিকাদের বাতি হাতে আগে আগে যেতে বললো।

ছোট্ট একটা কুঠুরিতে ঢুকলাম আমরা। দুটো পাথরের চৌকি দু'পাশে। সেগুলোর ওপর শোয়ানো হলদেটে লিনেনে ঢাকা মূর্তি।

একটা চৌকির সামনে দিয়ে দাঁড়ালো আয়শা। আমাকে ডাকলো কাছে।

'কাপড়টা ওঠাও, হলি,' বললো সে।

হাত বাড়ালাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে সরিয়ে আনলাম আবার। সাহস হলো না তোলার—কি দেখবো কে জানে? একটু হেসে আয়শা নিজেই সরিয়ে দিলো কাপড়টা। আরো সূক্ষ্ম একটা কাপড় নিচে। সেটাও সরিয়ে দিলো। তারপর দেখলাম—হাজার হাজার বছরের ভেতর এই প্রথম জীবিত মানুষের দৃষ্টি পড়লো সেই শীতল মৃতদেহের

BanglaBook.org

দিকে, এক মহিলা। বছর পঁয়ত্রিশেক হবে বয়েস; একটু কমও হতে পারে, নিঃসন্দেহে সুন্দরী। এখনো সম্পূর্ণ অবিকৃত রয়েছে তার সৌন্দর্য। শাদা একটা কাপড় পরে আছে। দু'হাতে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে আছে ছোট্ট একটা বাচ্চাকে। অসম্ভব মিষ্টি করুণ একটা দৃশ্য—নির্দ্বিধায় স্বীকার করছি, চোখের পানি ঠেকিয়ে রাখতে পারলাম না আমি। মা ও শিশু শেষ শয্যায় শুয়ে!

কাপড় দিয়ে দেহ দুটো ঢেকে দিলো আয়শা। বেরিয়ে এলাম আমরা গুহা ছেড়ে। তারপর অন্য একটা গুহায় গিয়ে ঢুকলাম। একই ভাবে সংরক্ষণ করা অনেকগুলো মৃতদেহ দেখলাম এখানেও। অবশেষে শেষ সমাধি গুহায় ঢুকলাম আমরা। এখানে একটা পাথরের চৌকিতে দুটো মৃতদেহ শোয়ানো। আমি নিজেই এবার কাপড় সরালাম। বুকে বুকে আলিঙ্গন করে শুয়ে আছে এক যুবক আর এক তরুণী। মেয়েটার মাথা ছেলেটার হাতের ওপর, ছেলেটার ঠোঁট দুটো ছুঁয়ে আছে মেয়েটার ভুরু। ছেলেটার গায়ের লিনেনের কাপড় খুললাম আমি। হৃৎপিণ্ড বরাবর একটা ছোরার—ক্ষত দেখতে পেলাম। মেয়েটার নিটোল একটা স্তনের নিচেও তেমন একটা ক্ষত। উপরে একটা পাথরে খোদাই করা তিনটি শব্দ। আয়শা অনুবাদ করে শোনালো, 'মৃত্যুর মাঝে পরিণীত।'

কারা এই তরুণ-তরুণী? কেন এই করুণ মৃত্যু ওদের? চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করলাম কারণগুলো, কিন্তু কোনো কূল কিনারা পেলাম না। আয়শাকে জিজ্ঞেস করেও যে খুব একটা লাভ হবে তা মনে হলো না। কারণ ও এখানে আসার অনেক আগেই মৃতদেহগুলো এখানে সংরক্ষণ করা হয়েছে।

'আরো দেখবে, বিদেশী অতিথি?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'চাও তো চলো, কোর-এর প্রবল পরাক্রমশালী রাজা তিসনোর সমাধি গুহা দেখাই তোমাকে।'

'না, মহান রানী, যথেষ্ট হয়েছে,' বললাম আমি। 'মৃত্যুর এই রূপ আর সহ্য করতে পারছি না। মানুষের তুচ্ছতা বড্ড বেশি প্রকট হয়ে উঠেছে। আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলুন, আয়শা।'

সতেরো

পরিচারিকারা বাতি হাতে পথ দেখিয়ে চললো। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমরা আয়শার ঘরের সামনে এসে পড়লাম। বিদায় চাইলাম আমি।

BanglaBook.org

'না,' বললো সে। 'এসো আমার সাথে। সত্যি কথা বলতে কি, হলি, তোমার সাথে কথা বলতে খুব ভালো লাগছে আমার। ভেবে দেখ, দু'হাজার বছরেরও বেশি পেরিয়ে গেছে, এইসব ক্রীতদাস ছাড়া কখনো ভদ্রলোকের সাথে কথা বলার সুযোগ পাইনি। অন্য কেউ হলে বুক ফেটে মরে যেতো না? এসো, হলি, বসো কিছুক্ষণ আমার সাথে। আবার আমার সৌন্দর্য দেখাবো তোমাকে।'

সত্যিই আর কিছু না বলে ওপরের আলখাল্লা এবং মুখাবরণ খুলে ফেললো সে। প্রদীপের আলোয় ঝিকমিকিয়ে উঠলো তার কোমরের সোনার সাপটা।

নতুন একটা ভাব খেলা করে বেড়াচ্ছে আয়শার মুখ জুড়ে। স্পষ্ট বুঝতে পারছি, বদলে গেছে তার মনের রং। প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছে সে। মৃদু হেসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিলো আমার ওপর। মাথা নেড়ে সামান্য দোলালো ঘন দীর্ঘ চুলের রাশি। অপূর্ব এক সুগন্ধে ভরে গেল জায়গাটা। চটি পরা নিটোল একটা পা ঠুকলো মেঝেতে। গুন গুন করে গেয়ে উঠলো প্রাচীন একটা গ্রীক বিয়ের গান। সব গাম্ভীর্য খসে পড়েছে। অদ্ভুত এক মিটি মিটি হাসি তার দু'চোখে।

'বসো, হলি। যেখানে ইচ্ছে তোমার। যেখানে বসলে আমাকে ভালো মতো দেখতে পাবে সেখানেই বসো। কিন্তু আবার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, বেশি দেখো না। অক্ষম বাসনায় নিজের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খাও তা চাই না, তোমাকে পছন্দ করি আমি।

'এবার বলো, সত্যিই আমার শুনতে ইচ্ছে করছে, আমি কি সুন্দরী নই? না, অত তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। সবদিক ভালো করে বিবেচনা করো, তারপর বলো। আমার চেহারা, আমার শরীর, আমার লাবণ্য, গায়ের রং, সব বিচার করো। তারপর বলো, এর কণামাত্র সৌন্দর্য আর কোনো নারীর ভেতর দেখেছো? দেখ, আমার কোমর, খুব মোটা মনে হচ্ছে? আসলে মোটেই তা নয়, এই সোনার সাপটার জন্যেই অমন লাগছে। বিশ্বাস না হয় ধরে দেখ। এখানে দু'হাত বেড় দিয়ে ধরো। কি ধরতে পারছো, হলি?'

আর সহ্য করতে পারলাম না আমি। শত হলেও আমি পুরুষ আর সে নারী—নারী চেয়েও বেশি। হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম আমি। করুণ গলায় মিনতি করে বললাম, 'আমি তোমাকে পূজা করবো, আয়শা, আমার অবিনশ্বর আত্মা নিবেদন করবো তোমার উদ্দেশ্যে, আমাকে বিয়ে করো।'

নিঃসন্দেহে উন্মাদ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। সংবিৎ ফিরলো তার খিলখিল হাসি শুনে।

BanglaBook.org

'ওহ্, এত শিগগির, হলি? অবাক লাগছে আমার, ক'মুহূর্তের ভেতর হাঁটু গেড়ে বসালাম তোমাকে! উহ্, কতদিন যে কোনো পুরুষকে এমন ভঙ্গিতে দেখিনি! বিশ্বাস করো, মেয়ে মানুষের কাছে এর চেয়ে তৃপ্তির আর কিছু নেই।

'কিন্তু তুমি, হলি, কি করে পারলে এমন করতে? কি করে পারলে? তোমাকে বলিনি, আমি তোমার জন্যে নই? পৃথিবীতে একজনকেই মাত্র আমি ভালোবাসি, সে তুমি নও। এত পাণ্ডিত্য তোমার, তবু আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি বোকা, মায়া-মরীচিকার পেছনে ছুটছো।' হঠাৎ করেই বদলে গেল তার গলার স্বর, 'আমার চোখের দিকে তাকাবে? চুমু খাবে আমাকে? বেশ তাতে যদি খুশি হও, তাকাও।' ঝুঁকে আমার মুখের সামনে মুখ নিয়ে এলো সে। তাকালো আমার চোখের দিকে। 'হ্যাঁ তাকাও, ইচ্ছে হলে চুমুও খেতে পারো। প্রকৃতির নিয়মকে ধন্যবাদ, হৃদয়ে ছাড়া আর কোথাও চুম্বন কোনো চিহ্ন রেখে যায় না। কিন্তু তুমি যদি আমাকে চুমু দাও, আমি বলছি, নিশ্চয়ই আমার প্রেমে অন্ধ হয়ে তুমি তোমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে খাবে, এবং মরবে!' আর একটু ঝুঁকে এলো সে। কোমল রেশমের মতো চুলগুলোর মৃদু স্পর্শ বুলিয়ে দিলো আমার মুখে। স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গেলাম আমি। আচমকা হাত বাড়িয়ে দিলাম ওকে জড়িয়ে ধরার জন্যে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সোজা হলো সে। আবার বদলে গেছে তার মুখের রং। আবার সেই পুরানো ভাবলেশহীন কাঠিন্য ফিরে এসেছে। সংবিৎ ফিরলো আমার। শির শির করে উঠলো শরীরের ভেতর। এবার নিঃসন্দেহে ভস্ম করে ফেলবে আমাকে!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলো সে। বললো, 'যথেষ্ট নষ্টামি হয়েছে, আর নয়। শোনো, হলি, তুমি ভালো লোক, সৎ, এবারও মাফ করে দিলাম তোমাকে। আগেই বলেছি, আমি তোমার জন্যে নই, তবু কেন আমার দিকে হাত বাড়াচ্ছো? আবার যদি বিরক্ত করো, আমি ঘোমটা টেনে দেবো, আর কখনো আমার মুখ দেখতে পাবে না তুমি।'

উঠে গদিমোড়া আসনটায় বসে পড়লাম আমি, এখনো থর থর করে কাঁপছে শরীর। আয়শা আবার সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

'নাও, কয়েকটা ফল খাও,' বললো সে। 'তারপর সেই হিব্রু মেসায়ার দর্শন সম্পর্কে বলো আমাকে।'

ইতিমধ্যে অনেকটা সামলে নিয়েছি আমি। ধীরে ধীরে বলতে লাগলাম মহান যীশুর দর্শন অর্থাৎ খ্রীষ্ট ধর্ম সম্পর্কে। তারপর আয়শার নিজের জাতি আরবদের ভেতর এক নবী এসেছিলেন, সে কথাও বললাম। মোহাম্মদ তাঁর নাম। নতুন এক বিশ্বাসে মানুষকে দীক্ষিত করেন তিনি।

'আহ্! দুই দুটো নতুন ধর্ম! আমার জানা মতেই সে-যুগে এতগুলো ধর্ম ছিলো,

BanglaBook.org

তারপরেও আরো দুটো। উহ্, এই মানুষ! কেবল পাপ আর পঙ্কিলতার পথে পা বাড়াবে!'

এই সুযোগে আমি জিজ্ঞেস করলাম আয়শার নিজের দর্শন সম্পর্কে।

'আমাদের জাতিও একজন নবী পেয়েছিলো, হলি,' বললো সে। 'তুমি হয়তো বলবে ভণ্ড নবী, কারণ তোমার নিজের নন তিনি। তবু আমাদের কাছে তিনি নবী। সে সময় আমাদের আরবদের অনেক দেব-দেবী ছিলো। একজনের নাম ছিলো আল্লাত, অন্য একজন সাবা, অর্থাৎ স্বর্গের রক্ষক; আল উজ্জা, এবং নিষ্ঠুর মানাহ্—তার উদ্দেশ্যে নরবলি দেয়া হতো। আরো আছে ওয়াদ্দ্, সাওয়া, ইয়াগুথ অর্থাৎ ইয়ামানের যোদ্ধাদের সিংহ; এবং ইয়াউক—মোরাদের অশ্ব; নাস্র—হামিয়ারের ঈগল, এবং আরো অনেক! সব ভাঁওতা, কি করে যে মানুষ এসব বিশ্বাস করতো! আমি যখন জ্ঞান দিয়ে বুঝতে পারলাম এসব মিথ্যা তখন মানুষকে জানালাম সেকথা! কিন্তু ওরা কি করলো? আর একটু হলেই খুন করে ফেলেছিলো আমাকে। কিন্তু, হলি, এমন চুপচাপ বসে আছো কেন তুমি? কোনো কথা বলছো না, আমি একাই বকে চলেছি। বিরক্ত হয়ে উঠেছো আমার ওপর? না কি ভয় পাচ্ছো, আমার দর্শন শেখাতে শুরু করবো তোমাকে? ওহ্ মানুষ! আধ ঘন্টাও হয়নি, হাঁটু গেড়ে বসে শপথ করে বললে, আমাকে ভালোবাসো। আর এখন, আমার কথাটাও বিরক্তিকর লাগছে?'

কি বলবো আমি? কেন যে চুপ করে বসে আছি কি করে বোঝাবো আয়শাকে।

'ও বুঝেছি,' বলে চললো সে। 'সেই অসুস্থ ছেলেটাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা করছো? ঠিক আছে ওকে সারিয়ে তুলবো আমি। ভয় পেও না, কোনোরকম জাদুবিদ্যা প্রয়োগ করবো না। তোমাকে তো আগেই বলেছি, জাদু বলে কিছু নেই পৃথিবীতে। তুমি তাহলে যাও এখন। ওষুধটা তৈরি করতে যতক্ষণ লাগে, তার পরেই আমি আসছি।'

লিওর গুহায় ফিরে এলাম আমি। পাংশু মুখে বসে আছে জব আর উস্তেন। দু'জনের মুখ দেখে লিওর অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পেতে অসুবিধা হলো না। ছুটে গেলাম আমি ওর বিছানার পাশে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, মারা যাচ্ছে আমার লিও। জ্ঞান নেই, অস্বাভাবিক দ্রুত তালে শ্বাস বইছে, ঠোঁট দুটো নড়ছে, থেকে থেকে কেঁপে উঠছে শরীর। ডাক্তারি বিদ্যার যতটুকু জানি তাতে বুঝলাম, পৃথিবীর কোনো কিছু দিয়েই ওকে বাঁচিয়ে রাখা যাবে না। খুব বেশি হলে আর ঘন্টাখানেক টিকবে। উহ্, আমার কি বোধ বুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে, আমার ছেলে মৃত্যু শয্যায় আর আমি কোথাকার এক মেয়ে মানুষের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছিলাম! সত্যি কথা বলতে কি, গত আধঘন্টায় লিওর কথা একবারও মনে পড়েনি আমার। গত বিশ বছর ধরে যাকে ঘিরে আছে আমার জীবন

BanglaBook.org

তাকে আমি হারাতে বসেছি অথচ আমার ভেতর কোনো বিকার নেই! ধিক আমাকে!

জব এবং উস্তেনের দিকে তাকালাম। হতাশ চেহারা দু'জনেরই। ওরাও নিশ্চিত হয়ে গেছে, বাঁচবে না লিও। আমার চোখে চোখ পড়তেই জব শুকনো মুখে বেরিয়ে গেল গুহার বাইরে।

এখন আয়শাই একমাত্র ভরসা—সে যা বলেছে তা যদি গালগপ্প হয়ে থাকে তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। তবে আমার বিশ্বাস হয় না সে ভাঁওতা দিয়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে ডেকে আনা উচিত, না হলে অনেক দেরি হয়ে যাবে হয়তো।

লিওর মুখটা আরেকবার দেখে রওনা হতে যাবো আমি, এমন সময় আতঙ্কিত মুখে, প্রায় ছুটতে ছুটতে ভেতরে ঢুকলো জব।

'ও, স্যার! ভয়ানক কাণ্ড, স্যার!' তড়বড়িয়ে বললো সে। 'কাফন পরা একটা লাশ আসছে এদিকে!'

মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে গেলাম আমি। তারপরই মনে পড়লো, আয়শা আসবে বলছিলো, হয়তো সে-ই তার মুখ ঢাকা আলখাল্লা পরে আসছে। বেশিক্ষণ ভাবতে হলো না এ নিয়ে। কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর দেখলাম, গুহায় ঢুকছে আয়শা।

জব চিৎকার করে উঠলো, 'এই যে, স্যার!' লাফ দিয়ে এক কোনায় সরে গেল সে। আর উস্তেন, সম্ভবত, কে এসেছে বুঝতে পেরে শুয়ে পড়লো মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে।

'ওহ্, একেবারে ঠিক সময়ে এসেছো, আয়শা,' বললাম আমি। 'মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছে গেছে আমার ছেলে।'

'এখনো যখন মরেনি,' কোমল গলায় বললো সে। 'তখন আর কোনো ভয় নেই। ওকে ভালো করে তুলতে পারবো আমি। ঐ লোকটা কি তোমাদের চাকর? আর তোমাদের দেশে কি ওভাবেই চাকররা অতিথিদের স্বাগত জানায়?'

'তোমার পোশাক ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে—কেমন মৃত্যু মৃত্যু একটা চেহারা আছে ওতে।'

হাসলো সে। 'আর মেয়েটা? ওহ্, বুঝেছি, এর কথাই বলছিলে, তাই না? বেশ, ওদের দু'জনকেই যেতে বলো এখান থেকে; তারপর দেখি কি করা যায় তোমার অসুস্থ সিংহকে।'

উস্তেনকে আরবীতে এবং জবকে ইংরেজিতে বললাম ঘর ছেড়ে চলে যেতে। জব খুশি মনে সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালন করলো। কিন্তু উস্তেন নড়লো না।

'কি চান "সে"?' ফিসফিস করে বললো সে। 'স্ত্রী হিসেবে স্বামীর কাছে থাকার পূর্ণ

BanglaBook.org

অধিকার আছে আমার। না, আমি যাবো না, জনাব বেবুন।'

'মেয়েটা যাচ্ছে না কেন, হলি?' গুহার দেয়ালে কয়েকটা ভাস্কর্য দেখতে দেখতে আপন মনে বললো আয়শা।

'লিওকে ছেড়ে যেতে চাইছে না ও।'

চরকির মতো পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়ালো আয়শা। উস্তেনের দিকে হাত তুলে একটা মাত্র শব্দ উচ্চারণ করলোঃ 'যাও!'

তার গলার স্বরে এমন কিছু একটা ছিলো যে আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করার সাহস পেলো না উস্তেন। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে গেল গুহা ছেড়ে।

'এখন বুঝতে পারছো, হলি,' একটু হেসে বললো আয়শা। 'অবাধ্যতার জন্যে জংলীগুলোকে কেন অমন কঠোর শাস্তি দিয়েছিলাম? অবাধ্যতার শাস্তি কি, সকালে যদি না দেখতো, কিছুতেই ও যেতো না এখান থেকে। চলো, দেখি ছেলেটাকে।'

লিওর বিছানার দিকে এগিয়ে গেল সে। দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে আছে লিও। এপাশ থেকে ওর মাথার সোনালি চুলগুলোই কেবল দেখা যাচ্ছে।

'আকার আয়তনে তো বেশ একটা আভিজাত্য আছে ছেলেটার!' বলতে বলতে ওর মুখ দেখার জন্যে ঝুঁকলো আয়শা।

পরমুহূর্তে তার দীর্ঘ ঋজু শরীরটা একটা ধাক্কা খেলো যেন। সবিস্ময়ে দেখলাম আমি টলতে টলতে পিছিয়ে আসছে সে, যেন গুলি করা হয়েছে বা ছুরি মারা হয়েছে ওকে। পিছোতে পিছোতে অবশেষে গুহার দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেল তার। গলা চিরে বেরিয়ে এলো ভয়ানক তীব্র তীক্ষ্ণ এক চিৎকার।

'কি হয়েছে, আয়শা?' চেঁচালাম আমি। 'মরে গেছে?'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বাঘিনীর মতো এক লাফে আমার সামনে এসে দাঁড়ালো সে। সাপের মতো ভয়ানক হিসহিসে এক গলায় বললো, 'কুত্তা! কেন আমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলি এতক্ষণ?' বলতে বলতে এমন হিংস্র ভঙ্গিতে একটা হাত সামনে এগিয়ে দিলো যে, আমার মনে হলো, এই বুঝি ধুলোয় মিশে গেলাম।

'কি?' আতঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কি হয়েছে?'

'ওহ্! এখনো তুমি বুঝতে পারোনি!' একটু শান্ত শোনাচ্ছে আয়শার গলা। শোনো, হলি, শোনোঃ ওখানে—ওখানে শুয়ে আছে—ওখানে শুয়ে আছে আমার হারিয়ে যাওয়া ক্যালিক্রেটিস! আমার হারিয়ে যাওয়া ক্যালিক্রেটিস অবশেষে ফিরে এসেছে আমার কাছে! আমি জানতাম ও আসবে, আমি জানতাম ও আসবে!' কোনো সাধারণ রমণী এই পরিস্থিতিতে যেমন করতো ঠিক তেমন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে হাসতে শুরু

BanglaBook.org

করলো সে। সেই সাথে বিড়বিড় করছে, 'ক্যালিক্রেটিস। ওহ্, ক্যালিক্রেটিস!'

'পাগল,' মনে মনে বললাম আমি। 'মেয়েটা যতক্ষণ এমন করবে ততক্ষণে না মারা যায় লিও!'

'এখনো যদি কিছু না করো, আয়শা,' স্মরণ করিয়ে দেয়ার ভঙ্গিতে বললাম আমি। 'তোমার ক্যালিক্রেটিস কিন্তু ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। এতক্ষণ চলে গেছে কিনা কে জানে?'

'ঠিক,' একটু চমকে বললো সে। 'ওহ্, আরো আগে কেন এলাম না আমি? এখন একদম সময় নেই হাতে, এদিকে থর থর করে কাঁপছে আমার শরীর।' কাপড়ের ভাঁজ থেকে শিশির মতো দেখতে ছোট্ট একটা মাটির পাত্র বের করে এগিয়ে দিলো আমার দিকে। 'এই যে, হলি, এটা নাও। ভেতরের তরল পদার্থটুকু ঢেলে দাও ওর গলায়। এখনো যদি মরে না গিয়ে থাকে, ভালো হয়ে যাবে। জলদি, হলি, জলদি! মারা যাচ্ছে ও!'

কাঠের ছিপি দিয়ে আটকানো পাত্রটার মুখ। দাঁত দিয়ে কামড়ে খুলতে খুলতে লিওর পাশে গেলাম আমি। এক পলক তাকিয়েই বুঝতে পারলাম শেষ হয়ে যাচ্ছে ও। সোনালি মাথাটা আস্তে আস্তে নড়ছে এপাশে ওপাশে। মুখটা সামান্য হাঁ হয়ে আছে। আয়শাকে ডেকে ওর মাথাটা ধরতে বললাম আমি।

এগিয়ে এলো সে। এখনো কাঁপছে থর থর করে। তবু কোনো রকমে করে স্থির করতে পারলো লিওর মাথা। হাঁ করা মুখটা এক হাতে আরেকটু ফাঁক করে শিশির তরল পদার্থটুকু ঢেলে দিলাম ওর গলায়।

একসেকেণ্ড দু'সেকেণ্ড করে সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অলৌকিক কোনো পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি না লিওর ভেতর। সত্যি কথা বলতে কি অলৌকিক ফলাফলই আশা করেছিলাম আমি। তবে হ্যাঁ, একটু আগেও যে মরণ যন্ত্রণা ভোগ করেছিলো লিও, এখন আর তা নেই। প্রথমে মনে হলো, হয়তো মৃত্যুই ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে সেই যন্ত্রণার হাত থেকে। মলিন মুখটা স্থির হয়ে গেছে। দুর্বল হৃৎস্পন্দন আরো দুর্বল হয়েছে। কেবল চোখের পাপড়ি দুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। সন্দেহের দৃষ্টিতে আয়শার দিকে তাকালাম আমি। অন্ধকারে ওর মুখের আবরণটা সরে গেছে। এখনো লিওর মাথা ধরে আছে সে।

দীর্ঘ পাঁচটা মিনিট কেটে গেল। এখনো কোনো পরিবর্তন নেই লিওর। আয়শার মুখ দেখে মনে হলো, সে-ও যেন আশা ছেড়ে দিয়েছে।

'কি হলো? অনেক দেরি হয়ে গেছে?' একটা ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

BanglaBook.org

লিওর মাথা ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢাকলো সে, কোনো জবাব দিলো না। ডুকরে কেঁদে ওঠার ইচ্ছে হচ্ছে আমার। এমন সময় শুনতে পেলাম গভীর একটা শ্বাস নেয়ার শব্দ। চমকে মুখ তুললো আয়শা। আমি ছুটে গেলাম লিওর পাশে। হ্যাঁ প্রাণের চিহ্ন ফুটে উঠতে শুরু করেছে আবার ওর মুখে। বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়, যাকে মৃত ভেবেছিলাম, একটু পরেই পাশ ফিরে শুলো সে।

'দেখেছো!' উৎফুল্ল গলায় ফিসফিস করে উঠলাম আমি।

'দেখেছি,' জবাব দিলো আয়শা। 'এ যাত্রা বেঁচে গেছে ও। ভেবেছিলাম, বোধহয় দেরি করে ফেলেছি—আর এক মুহূর্ত, মাত্র এক মুহূর্ত যদি দেরি হতো, তাহলে হয়তো ঘটেই যেতো সর্বনাশটা।' তারপরই আমাকে অবাক করে দিয়ে হু-হু করে কেঁদে ফেললো সে।

অনেকক্ষণ কাঁদলো আয়শা।

'ক্ষমা করো, হলি,' লিওর সোনালি চুলে হাত বুলাতে বুলাতে অবশেষে বললো সে। 'আমার দুর্বলতা ক্ষমা করো। দেখতে পাচ্ছো, যত যাই হোক, শেষ পর্যন্ত আমি একজন মেয়েমানুষই। এ পর্যন্ত আমার অনেক রূপই তো তুমি দেখেছো। সব কি এই নারীরূপের নিচে চাপা পড়ে যায় না? ভেবেছিলাম, আবার বুঝি হারালাম আমার ফিরে পাওয়া ক্যালিক্রেটিসকে। যা হোক, এখন আর কোনো ভয় নেই। ওষুধ ধরেছে। আগামী বারো ঘন্টা একনাগাড়ে ঘুমোবে, তারপর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবে ও।'

আঠারো

'ওহ্, হো, ভুলেই গেছিলাম,' হঠাৎ বলে উঠলো আয়শা। 'ঐ বেয়াদবটা, উস্তেন, ক্যালিক্রেটিসের কি ও? চাকর? না—?' কেঁপে গেল তার গলা।

কাঁধ ঝাঁকালাম আমি। 'ঠিক জানি না। যতটুকু বুঝতে পেরেছি, আমাহ্যাগারদের প্রথা অনুযায়ী ওর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মেয়েটার।'

মেঘের মতো কালো হয়ে উঠলো আয়শার মুখ। 'সেক্ষেত্রে ওকে মরতে হবে! এবং এখনই।'

'কি অপরাধে?' আতঙ্কিত গলায় জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'ও তো কোনো দোষ করেনি, আয়শা। ছেলেটাকে ভালোবাসে ও, লিও-ও খুশি মনে গ্রহণ করেছে ওর ভালোবাসা। তাহলে ওর অপরাধ কোথায়?'

BanglaBook.org

'সত্যিই তোমার মাথায় ঘিলু বলতে কিছু নেই, হলি। কি ওর অপরাধ? আমি এবং আমার আকাঙ্ক্ষার মাঝখানে বাধা হয়ে আছে, এ-ই ওর অপরাধ, বুঝেছো? মৃত্যু ছাড়া আর কোনো গতি নেই ওর। আমি ওর প্রেমিককে কেড়ে নেবো। তারপরও যদি ও বেঁচে থাকে, আমার ক্যালিক্রেটিস হয়তো ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ভাববে ওর কথা, তা আমি সহ্য করতে পারবো না। আমার প্রেমাস্পদের মন জুড়ে অন্য মেয়ে মানুষ থাকতে পারবে না। আমার সম্পদ আমি একাই ভোগ করবো। সুতরাং মরতেই হবে ওকে।'

'না, না,' চিৎকার করলাম আমি। এ পাপ--জঘন্য পাপ। পাপ থেকে অশুভ ছাড়া আর কিছু কখনো আসে না। তোমার নিজের খাতিরেই বলছি, আয়শা, এ কাজ কোরো না।'

'এটাকে তুমি পাপ বলছো, বোকা মানুষ? তাহলে আমাদের পুরো জীবনই তো পাপ, বেঁচে থাকার জন্যে দিনে দিনে কতকিছুই না আমরা ধ্বংস করেছি, এখনো করছি! পৃথিবীর নিয়মই হলো, শক্তিমান টিকে থাকবে। যারা দুর্বল তারা শেষ হয়ে যাবে, শক্তিমানের খোরাক হবে। হিংস্র কোনো প্রাণী যদি তোমাকে বা তোমার লিওকে গ্রাস করতে আসে তখন তুমি কি করবে? আহা, বেচারার খিদে পেয়েছে, থাক না, ভেবে চুপ করে রইবে, না হত্যা করবে তাকে? আমি কি বলতে চাইছি, বুঝেছো আশা করি?'

আয়শার যুক্তির বিপক্ষে আমি কোনো যুক্তি খুঁজে পেলাম না। কিন্তু এত সহজে উস্তেনকে মরতে দেয়াও যায় না। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। অবশেষে শেষ একটা চেষ্টা করার সিদ্ধান্ত নিলাম।

'আয়শা,' বললাম আমি। 'জানি তোমার সাথে যুক্তিতে পারবো না, তবু বলছি একবার ভেবে দেখ, তুমিই বলেছিলে, প্রত্যেক মানুষের উচিত, ভালো-মন্দ সম্পর্কে তার হৃদয়ের যে শিক্ষা সে অনুযায়ী চলা। জোর করে যার স্থানে তুমি দখল করতে যাচ্ছো, তার জন্যে কোনো দয়া নেই তোমার? তুমিই তো বলেছো, বহু-বহু যুগ পর ফিরে এসেছে তোমার প্রেমাস্পদ, এখন কি ওর ফিরে আসার এই ঘটনাটাকে উদযাপন করবে ওরই প্রেমিকাকে--আচ্ছা প্রেমিকা না বলো, যে ওর প্রাণ বাঁচিয়েছিলো তাকে হত্যা করে? অতীতে একবার এই ক্যালিক্রেটিসের সঙ্গে ভয়ানক আচরণ করেছিলে তুমি, নিজ হাতে ওকে হত্যা করেছিলে কারণ মিসরীয় আমেনার্তাসকে ও ভালোবাসতো।'

কথাটা আমি ঠিক মতো শেষও করতে পারিনি, প্রায় লাফিয়ে উঠলো আয়শা। 'কি করে তুমি জানলে এ কথা, বিদেশী? ঐ নাম তুমি জানলে কি করে? আমি তো তোমাকে বলিনি।' চিৎকার করতে করতে আমার হাত ধরলো সে।

BanglaBook.org

'হয়তো স্বপ্নে দেখেছি,' বললাম আমি। 'কত অদ্ভুত স্বপ্ন যে এই কোর-এর গুহার আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়! বোধহয় স্বপ্নটা সত্যেরই ছায়া ছিলো। সেদিন যে পাগলের মতো কাণ্ড করেছিলে তার ফল কি হয়েছে? দু'হাজার বছরেরও বেশি অপেক্ষা করতে হয়েছে তোমাকে, তাই না? আবারও তেমন কিছু ঘটুক তাই কি তুমি চাও? আমি বলছি, এই নিরপরাধ মেয়েটাকে হত্যা করলে সেই পুরানো ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হবে আবার। যে মেয়েটা ওকে ভালোবাসে তার মৃতদেহের ওপর দিয়ে কি করে তোমাকে গ্রহণ করবে তোমার ক্যালিক্রেটিস?'

'শোনো, হলি, মেয়েটার সাথে সাথে তোমাকেও যদি হত্যা করি, তবু ও আমাকে ভালোবাসবে। কারণ, আমি জানি, আমার অমোঘ আকর্ষণ ও কিছুতেই কাটাতে পারবে না। তা সত্ত্বেও আমার মনে হয়, তোমার কথায় সত্যতা আছে। ঠিক আছে, মেয়েটাকে আমি ছেড়ে দেবো। কিন্তু তার আগে ওর সাথে কথা বলবো আমি। যাও, আমি মত বদলাবার আগেই ডেকে নিয়ে এসো ওকে।' বলেই ও সেই শাদা কাপড়টা টেনে দিলো মুখের ওপর।

যাক, মন্দের ভালো। এতটুকুও যে রাজি হবে আয়শা, তা ভাবিনি। তাড়াতাড়ি গিয়ে ডেকে নিয়ে এলাম উস্তেনকে। গুহায় ঢুকেই আবার আগের মতো হাত আর হাঁটুতে ভর দিলো মেয়েটা।

'উঠে দাঁড়া,' শিতল গলায় আদেশ করলো আয়শা। 'এদিকে আয়!'

উঠে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো উস্তেন। নীরবতা নেমে এলো গুহায়।

'এ কে?' বেশ কিছুক্ষণ পর লিওর দিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলো আয়শা।

'আমার স্বামী,' অস্ফুট গলায় জবাব দিলো উস্তেন।

'কে ওকে দিয়েছে তোর কাছে?'

'আমাদের দেশের প্রথা অনুযায়ী আমি নিজেই ওকে গ্রহণ করেছি, মহারানী।'

'খুব খারাপ কাজ করেছিস তুই—অচেনা অজানা বিদেশীকে গ্রহণ করেছিস। তোদের জাতির লোক নয়, সুতরাং তোদের প্রথা এখানে অচল। সম্ভবত না জেনেই তুই করেছিস এ কাজ। এবং সেজন্যেই এবারের মতো তোকে ছেড়ে দিচ্ছি, নইলে তোর মরণ কেউ ঠেকাতে পারতো না। এখন, যা বলি শোন, এক্ষুণি নিজের দেশে ফিরে যা, জীবনে আর কখনো ওর সাথে কথা বলার বা ওর দিকে তাকানোর সাহস যেন না হয়। ও তোর জন্যে নয়। আবার বলছি, আমার নির্দেশ অমান্য করা মাত্র মরতে হবে তোকে। যা এখন!'

নড়লো না মেয়েটা।

BanglaBook.org

'যা, বলছি!'

আর সহ্য করতে পারলো না উস্তেন। মুখ তুলে তাকালো। 'না, ও "সে", আমি যাবো না। ও আমার স্বামী। আমি ওকে ছেড়ে যাবো না। আমাকে স্বামীত্যাগ করতে বলার কি অধিকার আছে আপনার?'

আয়শার শরীর বেয়ে একটা কাঁপুনি নেমে আসতে দেখলাম। আর আমি শিউরে উঠলাম উস্তেনের ভয়ঙ্করতম পরিণতির কথা ভেবে।

'ধৈর্য ধরো, আয়শা,' ল্যাটিনে বললাম আমি। 'ও যা বলছে, তা স্বাভাবিক।'

'এখনো আমি ধৈর্য হারাইনি,' হিমশীতল গলায় একই ভাষায় জবাব দিলো সে। 'আমি যদি ধৈর্য হারাতাম, এতক্ষণ ওর লাশ পড়ে থাকতো।' তারপর উস্তেনের দিকে ফিরে আরবীতে বললোঃ 'এখনো বলছি, চলে যা, নিজের ধ্বংস যদি না চাস তো চলে যা যেখান থেকে এসেছিস সেখানে!'

'আমি যাবো না। ও আমার!' ফোঁপাতে ফোঁপাতে চিৎকার করলো উস্তেন। 'আমি ওকে গ্রহণ করেছি, ওর প্রাণ বাঁচিয়েছি! ক্ষমতা থাকলে আমাকে ধ্বংস করো, তবু আমার স্বামীকে দেবো না—কক্ষণো না—কক্ষণো না!'

নড়ে উঠতে দেখলাম আয়শার শরীর, এত দ্রুত যে ও কি করলো ঠিক বুঝতে পারলাম না। মনে হলো, হাত দিয়ে হাল্কা একটা চাপড় দিলো মেয়েটার মাথায়। পরমুহূর্তে যা দেখলাম তাতে আতঙ্কে পিছিয়ে আসতে হলো আমাকে। দেখলাম, উস্তেনের ব্রোঞ্জের মতো লালচে চুলে তিনটে আঙুলের দাগ—তুষারের মতো শাদা। দু'হাতে মাথা চেপে ধরেছে মেয়েটা; কেমন যেন ঝিমুনি লাগা ভাব চেহারায়।

'ও ঈশ্বর!' নিজের অজান্তেই শব্দ দুটো বেরিয়ে এলো আমার গলা চিরে। কিন্তু 'সে' সামান্য একটু হাসলো শুধু।

'বোকা মেয়ে,' বললো আয়শা। 'ভেবেছিস তোকে হত্যা করার ক্ষমতা নেই আমার? ওখানে একটা আয়না আছে, দেখ,' লিওর মাথার কাছে ওর দাড়ি কামানোর আয়নাটার দিকে ইশারা করলো সে। 'হলি, ওটা দাও তো ছুঁড়ির হাতে, দেখুক ওর চুলের অবস্থা!'

আয়নাটা তুলে উস্তেনের চোখের সামনে ধরলাম। এক পলক তাকিয়েই ফুঁপিয়ে উঠে মাটিতে বসে পড়লো বেচারা।

'এইবার তুই যাবি,' বললো আয়শা। 'নাকি আবার আঘাত করতে হবে? দেখ, তোর মাথায় ছাপ মেরে দিয়েছি, যতদিন না তোর সব চুল ওরকম শাদা হয়ে যাবে ততদিন তোকে দেখা মাত্র চিনতে পারবো। আর কখনো যদি তোর মুখ আমি দেখি,

BanglaBook.org

মনে রাখিস, তোর হাড়গুলো পর্যন্ত ওরকম শাদা করে ছাড়বো!'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো উস্তেন। মাথায় ভয়ানক শ্বেতচিহ্নটা নিয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বেরিয়ে গেল গুহা ছেড়ে।

'এমন ভয় পাওয়া চেহারা হয়েছে কেন তোমার, হলি?' উস্তেন বেরিয়ে যেতেই জিজ্ঞেস করলো আয়শা। 'তোমাকে তো বলেছি, জাদু-টাদু নিয়ে আমি কারবার করি না। এ হচ্ছে একটা শক্তি, যার সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই তোমার। মেয়েটার মাথায় চিহ্ন দিয়ে দিলাম ওর মনে আতঙ্ক ঢুকিয়ে দেয়ার জন্যে। ইচ্ছে করলেই যে আমি ওকে হত্যা করতে পারি তা বুঝিয়ে দিলাম।

'যাকগে, আমি যাই এখন। কয়েকজন চাকর পাঠিয়ে দিচ্ছি, আমার প্রভু ক্যালিক্রেটিসকে নিয়ে যাবে আমার পাশের কামরায়। এখন থেকে আমি নিজে ওর দেখাশোনা করবো। তুমিও তোমার শ্বেতাঙ্গ চাকরকে নিয়ে চলে এসো ওখানে। কিন্তু সাবধান, ভুলেও যেন ক্যালিক্রেটিসের সামনে উচ্চারণ কোরো না, কি করে তাড়িয়েছি এই মেয়েলোকটাকে। আবার বলছি, সাবধান!'

বেরিয়ে গেল সে গুহা ছেড়ে। হতবুদ্ধির মতো বসে রইলাম আমি। একটু পরেই কয়েকজন বোবা-কালা পরিচারক এসে নিয়ে গেল লিওকে। আমাদের সব জিনিসপত্রও নিয়ে যাওয়া হলো। আয়শার সেই পর্দা ঘেরা কুঠুরির ঠিক পেছনে আমাদের নতুন আবাস নির্দিষ্ট হলো।

রাতটা আমি লিওর নতুন ঘরেই কাটালাম। মড়ার মতো ঘুমোলো ও। আমিও ভালোই ঘুমালাম। যদিও প্রচুর স্বপ্ন দেখলাম, তবু মোটামুটি ঝরঝরে শরীর নিয়ে ঘুম থেকে উঠলাম পরদিন সকালে।

অবশেষে বহু প্রতীক্ষিত সেই মুহূর্তটি এগিয়ে এলো। লিও জাগবে। আয়শা এসে গেছে। যথারীতি অবগুণ্ঠিত মুখ।

'দেখবে, হলি,' লিওর ওপর সামান্য ঝুঁকে বললো সে। 'এক্ষুণি জাগবে ও, সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে। অসুখ পালিয়েছে।'

কথাটা তখনো শেষ করতে পারেনি আয়শা, পাশ ফিরে আড়মোড়া ভাঙলো লিও। দু'হাত সামনে ছড়িয়ে দিয়ে হাই তুললো। তারপর চোখ মেলেই শরীরের ওপর ঝুঁকে পড়া নারীমূর্তিটা দেখলো। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ও টেনে নিলো তাকে। চুমু খেলো। সম্ভবত উস্তেন ভেবেছে আয়শাকে। পরমুহূর্তে আরবীতে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আরে, উস্তেন, ওভাবে মুখ বেঁধেছো কেন? দাঁতে ব্যথা হয়েছে?' তারপর ইংরেজিতে,

BanglaBook.org

'উহ্, কি রাক্ষুসে খিদে পেয়েছে রে, বাবা। জব! খাওয়ার কিছু আছে নাকি?'

'এই যে আমি, মিস্টার লিও,' সন্দেহের চোখে আয়শার দিকে তাকিয়ে বললো জব। 'কথা বোলো না, কথা বোলো না, তুমি অসুস্থ। যথেষ্ট ভুগিয়েছো আমাদের। এবার একটু চুপচাপ বিশ্রাম নাও। আর, এই ভদ্র মহিলা,' আবার আয়শার দিকে তাকালো ও। 'দয়া করে যদি একটু সরেন, তোমার জন্যে স্যুপ নিয়ে আসতে পারি।'

'ভদ্র মহিলা' কথাটা শুনে সচকিত হলো লিও। 'কেন! উস্তেন নয় ও? তাহলে উস্তেন কোথায়?'

এই প্রথম আয়শা কথা বললো ওর সাথে। এবং প্রথম কথাটাই সে মিথ্যে বললো, 'বেড়াতে গেছে উস্তেন। তোমার দেখাশোনার জন্যে আমি এসেছি ওর জায়গায়।'

একই সঙ্গে আয়শার অপূর্ব সুন্দর কণ্ঠস্বর শুনে আর কাফনের মতো পোশাক দেখে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল লিও। কিছু না বলে খেয়ে ফেললো জবের এগিয়ে দেয়া স্যুপটুকু। তারপর পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লো আবার।

সন্ধ্যার সময় দ্বিতীয় বার জাগলো ও। গত ক'দিনে কি কি ঘটেছে জিজ্ঞেস করলো। পরদিন সব বলবো বলে অনেক কষ্টে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিলাম ওকে। পরের বার যখন ঘুম ভাঙলো, দেখলাম প্রায় পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠেছে ও। ওর অসুখের কথা, গত ক'দিনে আমি কি কি করেছি এসব কিছু কিছু বললাম ওকে। আয়শার উপস্থিতির কারণে আয়শা সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে পারলাম না। শুধু বললাম ও এদেশের রানী।

পরদিন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো লিও। বল্লমের খোঁচায় হওয়া ক্ষত পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে। শরীরের শক্তিও প্রায় স্বাভাবিক। সেই সঙ্গে ফিরে এসেছে স্মৃতি। জ্ঞান হারানোর আগ পর্যন্ত যা যা ঘটেছিলো সব মনে পড়ে গেছে। বেচারা উস্তেনের কি হয়েছে জিজ্ঞেস করে করে প্রায় পাগল করে ফেললো আমাকে। প্রতিবারই আমি এড়িয়ে গেলাম প্রশ্নটা। সাহস পেলাম না সত্যি কথা বলার। ইতিমধ্যে আয়শা দ্বিতীয়বারের মতো সতর্ক করেছে আমাকে, যেন উস্তেন সম্পর্কে কিছু না বলি লিওকে।

এদিকে সম্পূর্ণ বদলে গেছে আয়শার আচরণ। ভেবেছিলাম, তার বিশ্বাস অনুযায়ী যে তার পুরানো প্রেমিক তাকে নিজের করে পাওয়ার প্রথম সুযোগটাই সে কাজে লাগাবে। কিন্তু তেমন কিছু করলো না সে। শান্তভাবে সেবা করে যাচ্ছে লিওর। শ্রদ্ধা মেশানো অদ্ভুত এক আচরণ করছে। নম্র বিনয়ী। যথাসম্ভব চেষ্টা করছে লিওর কাছাকাছি থাকার। আর লিওর কৌতূহল ক্রমে দুর্বার হয়ে উঠছে এই রহস্যময়ী রমণী সম্পর্কে—প্রথম দিকে আমার যেমন হয়েছিলো অনেকটা তেমন।

BanglaBook.org

তৃতীয় দিন সকালে পোশাক পরার সময় আবার লিও আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললো উস্তেন কোথায় গেছে, উস্তেন কোথায় গেছে করে। সরাসরি আমি জানিয়ে দিলাম, 'আয়শার কাছে জিজ্ঞেস করো। উস্তেন কোথায় গেছে আমি জানি না।'

নাশতা শেষ করে আয়শার কাছে গেলাম আমরা। যথারীতি সেই পর্দাঘেরা কুঠুরিতে বসে আছে সে। আমরা ঢুকতেই উঠে দাঁড়ালো। দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলো আমাদের—বলা ভালো লিওকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে।

'স্বাগতম, আমার তরুণ অতিথি প্রভু,' অত্যন্ত কোমল, বিনীত গলায় বললো সে। 'তোমাকে সুস্থ দেখে সত্যিই খুব খুশি লাগছে। বিশ্বাস করো, আমি যদি না বাঁচতাম, জীবনে আর কখনো দাঁড়াতে হতো না তোমাকে।'

মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো লিও। তারপর সুস্থ করে তোলার জন্যে ধন্যবাদ জানালো আয়শাকে। যথাসম্ভব চেষ্টা করলো শুদ্ধ সুন্দর আরবী বলতে।

'না না, ধন্যবাদ জানানোর মতো কিছু করিনি আমি,' বললো আয়শা। 'তুমি এসেছো বলেই ধন্য বোধ করছি।'

'হুম, বুড়ো,' আমার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললো লিও। 'ভদ্রমহিলা একটু বেশি ভদ্র মনে হচ্ছে!'

কনুই দিয়ে পাঁজরে খোঁচা মেরে চুপ করতে বললাম ওকে।

'আমার বিশ্বাস,' বলে চললো আয়শা। 'আমার ভৃত্যরা যথাসাধ্য সমাদর করেছে তোমাদের। এখন আমি নিজে কি কিছু করতে পারি?'

'নিশ্চয়ই, মহামান্য, "সে",' তড়বড়িয়ে বললো লিও। 'আমার দেখাশোনা করছিলো যে মেয়েটা, ও কোথায় গেছে, বললে বাধিত হবো।'

'ওহ্, সেই মেয়েটা--হ্যাঁ, আমি ওকে দেখেছিলাম বটে। কিন্তু এখন যে কোথায় আছে বলতে পারি না। জরুরী দরকার, যেতেই হবে, বলে চলে গেছে ও। কোথায়, সে সম্পর্কে কিছু বলে যায়নি। কখন ফিরবে বা আদৌ ফিরবে কিনা তা-ও কিছু জানায়নি। অসুস্থ মানুষের সেবা করা কি চাট্টিখানি কথা? দুদিনেই হয়তো হাঁপিয়ে উঠেছিলো, পালিয়ে বেঁচেছে। এই জংলীগুলো আসলে এমনই।'

গম্ভীর হয়ে গেল লিও। সম্ভবত উস্তেন সম্পর্কে কথাগুলো বিশ্বাস করতে পারছে না।

'আশ্চর্য!' আমার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললো ও। তারপর আয়শার দিকে ফিরে, 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, ঐ মেয়েটা এবং আমি—আঁ—আমাদের ভেতর একটা সম্পর্ক...।'

BanglaBook.org

একটু হাসলো আয়শা—সেই অপূর্ব সঙ্গীতের মতো হাসি। তারপর অন্য কথা বলে ঘুরিয়ে দিলো প্রসঙ্গ।

উনিশ

সেদিনই বিকেলে। আমাদের মনোরঞ্জনের জন্যে এক নাচের আসরের আয়োজন করেছে আয়শা। সকালে আলাপের সময় লিওকে সে জানিয়েছিলো এই অনুষ্ঠানের কথা। বলেছিলো, আশ্চর্য এক দৃশ্য দেখাবে। সে অনুযায়ী এখন আমরা জড়ো হয়েছি আয়শার ঘরে। তার সাথেই যাবো অনুষ্ঠানের জায়গায়।

একটু আগে এসে পড়েছি আমরা। অনুষ্ঠানের আয়োজন এখনো শেষ হয়নি। সময় কাটানোর জন্যে আয়শা তার বীক্ষণকাচের কেরামতি দেখাতে লাগলো জব আর লিওকে। গামলার মতো পাত্রের তরল পদার্থে বাবা, মা, ভাই-বোনদের চেহারা দেখে উত্তেজনায় টগবগ করতে লাগলো জব। লিওকে অবশ্য খুব একটা উত্তেজিত হতে দেখলাম না। এমন কিছু যে দেখতে হবে তা যেন ওর জানাই ছিলো।

প্রায় ঘন্টাখানেক পর আয়শার এক পরিচারিকা এসে জানালো, মাননীয় দর্শকদের জন্যে অপেক্ষা করছে বিলালি। দয়া করে আমরা গেলেই সে শুরু করতে পারে অনুষ্ঠান। শাদা পোশাকের ওপর কালো একটা আলখাল্লা চাপালো আয়শা। তারপর রওনা হলাম আমরা।

নাচ হবে খোলা আকাশের নিচে, বড় গুহার সামনে পাথর বাঁধানো মসৃণ চত্বরে। সেখানে পৌঁছে দেখলাম, গুহামুখ থেকে পনেরো কদম মতো দূরে তিনটে আসন পাতা। হেলান দেয়ার ব্যবস্থা আছে তিনটেতেই। মাঝখানের আসনে বসালো আয়শা। আমি আর লিও দু'পাশের দুটোয়।

বেশ কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল। চুপচাপ বসে আছি আমরা। নর্তক-নর্তকীদের পাত্তা নেই এখনো। সন্ধ্যা হয়েছে বেশ কিছুক্ষণ। চারদিক অন্ধকার। কিন্তু আলোর কোনো বন্দোবস্ত দেখছি না। এই অন্ধকারে ওরা নাচবেই বা কি, আমরা দেখবোই বা কি?

আয়শাকে কথাটা জিজ্ঞেস করলো লিও।

'সময় হলেই দেখতে পাবে,' একটু হেসে জবাব দিলো সে।

সত্যিই দেখলাম আমরা। আয়শা কথাটা বলতে না বলতেই দেখলাম, চারদিক থেকে কালো কালো মূর্তি ছুটে আসছে, বিরাট একেকটা জ্বলন্ত মশালের মতো কি যেন

BanglaBook.org

তাদের প্রত্যেকের হাতে। লিওই প্রথম বুঝতে পারলো, জিনিসগুলো কি।

'ও ঈশ্বর!' বলে উঠলো ও। 'জ্বলন্ত লাশ দেখি ওগুলো!'

ভালো করে তাকালাম আমি। সত্যিই তো! সমাধিগুহা থেকে মমি এনে মশাল বানানো হয়েছে আমাদের বিনোদনের জন্যে!

আমাদের থেকে বিশ কদম মতো সামনে ওরা এক এক করে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো জ্বলন্ত মমিগুলো। ছোটখাটো একটা পাহাড়ের মতো হয়ে উঠলো। শোঁ শোঁ, চড় চড় শব্দ তুলে পুড়ছে মমি। তীব্র আলোয় ভরে গেল পুরো চত্বরটা। হঠাৎ দেখলাম, দীর্ঘদেহী এক লোক মানুষের জ্বলন্ত একটা হাত তুলে নিয়ে দৌড় দিলো অন্ধকারের দিকে—কোনো একটা মমি থেকে খুলে পড়েছিলো হাতটা। কিছুদূর গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। পরমুহূর্তে ফস্ করে জ্বলে উঠলো বিরাট একটা 'প্রদীপ'। প্রদীপটা আর কিছু নয়, মাটিতে পোঁতা খুঁটির সঙ্গে বাঁধা এক মহিলার মমি। দীর্ঘদেহী ছুটে গিয়ে তার চুলে আগুন ধরিয়ে দেয়ায় অমন লকলকিয়ে উঠেছে আগুনের শিখা।

জ্বলন্ত হাতটা দিয়ে কয়েক পা দূরে একই রকম আরেকটা প্রদীপ জ্বাললো সে, তারপর আরেকটা, আরও একটা। এই ভাবে এক এক করে মমি জ্বেলে জ্বেলে তিন দিক থেকে বৃত্তাকারে ঘিরে ফেলা হলো আমাদের।

নিরো নাকি আলকাতরায় ভেজানো জীবিত খ্রীষ্টানদের দেহ জ্বেলে তার বাগান আলোকিত করেছিলো, ঠিক সেরকম একটা দৃশ্য আমাদের সামনে। ভাগ্য ভালো, এখন যে দেহগুলো জ্বলছে সেগুলো জীবিত কারো নয়। তবু আতঙ্কে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম আমি। হোক মমি, মানুষের মতোই তো চেহারা। চোখের সামনে এগুলো পুড়তে দেখলে কেমন লাগে!

মিনিট বিশেকের ভেতর গোড়ালি ছাড়া আর সবটুকু পুড়ে গেল মমিগুলোর। পায়ের জ্বলন্ত অবশেষগুলো সরিয়ে ফেলে নতুন একেকটা মমি এনে বাঁধা হলো একেকটা খুঁটির সাথে। তারপর আগুন ধরিয়ে দেয়া হলো আবার। ফস ফস শব্দ তুলে আকাশে উঠে যেতে লাগলো আগুনের শিখা।

'কেমন লাগছে, হলি?' জিজ্ঞেস করলো আয়শা। 'বলেছিলাম না, আশ্চর্য এক দৃশ্য দেখাবো। এখন দেখছো তো?'

জবাব দেয়ার মতো কোনো কথা খুঁজে পেলাম না আমি। এমন সময় দেখলাম, দুই সারি ছায়ামূর্তি, একটা পুরুষদের অন্যটা মেয়েদের, জ্বলন্ত মমিগুলোকে ঘিরে এগিয়ে আসছে। নারী, পুরুষ দু'দলেরই পরনে চিতা বা হরিণের চামড়া ছাড়া আর কিছুই নেই। জ্বলন্ত মমির বৃত্তটা ঘুরে আমাদের সামনে চলে এলো তারা। তারপর দুই

BanglaBook.org

সারিতে পরস্পরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালো। কয়েক সেকেণ্ড পরেই শুরু হলো নাচ। সে কি নাচ! আমাদের ক্যানক্যানের নারকীয় পৈশাচিক রূপ বলা যেতে পারে। তার বর্ণনা দেয়া অসম্ভব আমার পক্ষে। শুধু এটুকু বলতে পারি, প্রচুর হাত-পা ছোঁড়া আর শরীর দোলানো আছে কিন্তু তাল লয়ের কোনো বালাই প্রায় নেই।

কিছুক্ষণ চললো এরকম। তারপর হঠাৎ মেয়েদের সারি থেকে বিশাল বপুধারী এক মহিলা মাতালের মতো হেলে দুলে এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। কলজে কাঁপানো তীক্ষ্ণস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি একটা কালো ছাগল চাই' কেউ একটা কালো ছাগল দাও আমাকে!' এরপরই মাটিতে শুয়ে পড়ে কালো ছাগলের জন্যে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য নর্তক-নর্তকীরা ঘিরে ধরলো তাকে।

'পেত্নীতে পেয়েছে ওকে,' চিৎকার করে উঠলো একজন। 'কেউ যাও, একটা কালো ছাগল নিয়ে এসো। মা পেত্নী, শান্ত হও! শান্ত হও! এক্ষুণি পাবে তোমার ছাগল। ওরা গেছে আনতে। দয়া করে শান্ত হও, মা পেত্নী!

'কালো ছাগল দিতে হবে আমাকে, অবশ্যই দিতে হবে!' আবার চিৎকার করলো মেয়েলোকটা।

'ঠিক আছে, পেত্নী, এক্ষুণি পাবে তোমার ছাগল, একটু শান্ত হও, তুমি না কতো ভালো পেত্নী!'

সত্যিই যতক্ষণ না একটা শিংওয়ালা কালো ছাগল নিয়ে আসা হলো ততক্ষণ চললো এরকম গড়াগড়ি, চিৎকার আর অনুনয়।

'এনেছো ছাগল?' জিজ্ঞেস করলো বিশাল বপুধারিণী। 'কালো তো? সত্যি কালো তো?'

'হ্যাঁ, মা পেত্নী, রাতের মতো কালো,' তারপর পাশের একজনের দিকে তাকিয়ে, 'তোমার পেছনে রাখো এটা, পেত্নী যেন দেখতে না পায়, ছাগলটার গায়ে একটা শাদা দাগ আছে।' তারপর আবার মোটা মহিলার দিকে ফিরে, 'একটু ধৈর্য ধরো, পেত্নী। এই, গলা কাটো এটার! তশতরি কোথায়?'

মোটা মহিলা এখনো তড়পাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে, 'ছাগল! কালো ছাগল! রক্ত দাও! আমার কালো ছাগলের রক্ত দাও আমাকে! ওহ্, ওহ্! তাড়াতাড়ি দাও! রক্ত! রক্ত!'

এই সময় একটা আতঙ্কিত চিৎকার উঠলো সম্মিলিত কণ্ঠে। হতভাগ্য ছাগলটাকে বলি দেয়া হলো। একটু পরেই এক মহিলা এক তশতরি ভর্তি রক্ত নিয়ে এলো। মোটা মহিলার হাতে দিতেই সে এক চুমুকে গিলে ফেললো রক্তটুকু। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল

BanglaBook.org

তার তড়পানি। উঠে মৃদু একটু হাসলো। তারপর এগিয়ে গেল অন্য নর্তকীদের দিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেল আমাদের আর বৃত্তাকার আগুনের মাঝের জায়গাটুকু।

নৃত্যানুষ্ঠান শেষ ভেবে আয়শাকে জিজ্ঞেস করতে যাবো এবার আমরা উঠতে পারি কিনা, এমন সময় একটা বেবুন লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এলো আমাদের সামনে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে উল্টো দিক থেকে এগিয়ে এলো একটা সিংহ—বলা ভালো, সিংহের চামড়া পরা এক লোক। তারপরই এলো একটা ছাগল। তারপর ষাঁড়ের চামড়া পরা একজন, ষাঁড়ের মুণ্ডু লাগানো তার মাথার সাথে। এরপর আরো ছাগল এবং আরো অন্যান্য জন্তুর সাজে মানুষ। সাপের চামড়া পরে লম্বা লেজ লাগিয়ে একটা মেয়েও এলো। বিচিত্র এক বুনো ভঙ্গিতে লাফাতে লাফাতে যে-যে প্রাণীর সাজ নিয়েছে সে সেই প্রাণীর ডাক ছাড়তে লাগলো।

অনেকক্ষণ ধরে চললো এই 'নাচ'। কিম্ভূতকিমাকার অঙ্গভঙ্গি আর ডাক শুনতে শুনতে পাগল হওয়ার দশা হলো। শেষে বিরক্ত হয়ে আয়শাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি আর লিও যদি উঠে গিয়ে জ্বলন্ত মানব-মশালগুলো পরীক্ষা করে দেখি, তার আপত্তি আছে কিনা। আপত্তি থাকার কোনো সঙ্গত কারণ নেই, সুতরাং রওনা হলাম আমরা।

প্রথম মমিটা দেখা শেষ করে দ্বিতীয়টার দিকে যাচ্ছি আমি আর লিও, এমন সময় চিতার ছদ্মবেশধারী একজন এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। নারীকণ্ঠে ফিস ফিস করে উঠলো চিতাটা, 'এদিকে এসো।'

শোনামাত্র আমরা দু'জনেই চিনতে পারলাম উস্তেনের গলা। একমুহূর্ত দেরি না করে, বা আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করে নির্দ্বিধায় লিও এগিয়ে গেল উস্তেনের দিকে। হঠাৎ করেই আমার পেটের ভেতরটা কেমন যেন শূন্য মনে হতে লাগলো। এরপর কি ঘটবে? চুপচাপ বসে থাকবে আয়শা? প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে পাগল হয়ে উঠবে না?

গুঁড়ি মেরে অন্ধকারের দিকে প্রায় পঞ্চাশ পা এগিয়ে গেল চিতাটা। লিও গেল সঙ্গে। পেছন পেছন আমিও।

'ওহ্!' উস্তেনকে বলতে শুনলাম আমি, 'অবশেষে খুঁজে পেয়েছি তোমাকে! শোনো, আমার সামনে ভয়ানক বিপদ ... মানতেই হবে" তোমার সাথে আমাকে দেখলেই হত্যা করবে। বেবুন নিশ্চয়ই বলেছে তোমাকে, কি ... মেয়েমানুষটা তোমার কাছ থেকে তাড়িয়েছে আমাকে? আমি তোমা...

তুমি আমার প্রভু, তুমি আমার। আমি তোমার প্রাণ বাঁচিয়েছি, এখন কি ... কে

BanglaBook.org

দূরে ঠেলে দেবে, প্রিয়তম?'

'অবশ্যই না,' জোর দিয়ে বললো লিও। 'আমি তো ভেবেই পাচ্ছিলাম না, কোথায় যেতে পারো তুমি। চলো, রানীর কাছে গিয়ে সব বুঝিয়ে বলি আমরা।'

'না, না, ও খুন করবে আমাদের! ওর ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই—বেবুন জানে, ও দেখেছে। আমাদের সামনে এখন একটাই পথ খোলা আছে, জলাভূমি পেরিয়ে পালাতে হবে। না হলে আমাদের দু'জনকেই মরতে হবে ওর হাতে।'

'ঈশ্বরের দোহাই, লিও···,' শুরু করলাম আমি, কিন্তু উস্তেন আমাকে থামিয়ে দিলো।

'না, ওর কথা শুনো না। শিগগির চলো, এখানকার বাতাসে পর্যন্ত মৃত্যুর গন্ধ। এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে কিনা কে জানে!'

খিলখিল একটা হাসির শব্দ হলো পেছনে। চমকে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। শিউরে উঠলাম মনে মনে। হালকা পায়ে কখন যে এসে দাঁড়িয়েছে আয়শা টের পাইনি কেউ। বিলালি আর দুই পরিচারক তার সঙ্গে।

কুড়ি

'বেশ, বেশ! চমৎকার একটা দৃশ্য যাহোক,' কোমল গলায় বললো আয়শা। 'চিতা এবং সিংহ প্রেম করছে!'

'জাহান্নামে যাক!' ইংরেজিতে বলে উঠলো লিও।

'মাথায় সামান্য চিহ্ন দিয়েই তোকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, উস্তেন,' এবার গলা চড়লো আয়শার, 'ভেবেছিলাম এতেই যথেষ্ট হবে। কিন্তু, আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি, আমার কথা অমান্য করার সাহস হবে তোর!'

'আমাকে নিয়ে আর খেলবেন না,' ফুঁপিয়ে উঠলো হতভাগিনী মেয়েটা। 'আমাকে মেরে ফেলুন, সব শেষ হয়ে যাক।'

খল খল করে হেসে উঠলো আয়শা। 'কেন? প্রেমের শখ মিটে গেল এত তাড়াতাড়ি!' বোবা-কালা পরিচারকদের দিকে তাকিয়ে একটা ইশারা করলো সে। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন এগিয়ে গিয়ে ধরলো উস্তেনের দু'হাত। ভয়ঙ্কর এক লাফ দিয়ে লিও ছুটে গেল কাছের পরিচারকটার দিকে। এক ধাক্কায় তাকে ফেলে দিলো মাটিতে। তারপর দাঁড়িয়ে রইলো ঘুসি বাগিয়ে।

BanglaBook.org

আবার হাসলো আয়শা। 'চমৎকার! বুঝতে পেরেছি, অতিথি, বাহু দুটোয় বেশ শক্তি রাখো তুমি। তা আপাতত বেচারাকে ছেড়ে দিলে কেমন হয়? মেয়েটার কোনো ক্ষতি করবে না ওরা। ওকে আমার নিজ ঘরে নিয়ে যাবো। তোমার এত প্রিয় পাত্র যে, আমারও উচিত তার একটু সমাদর করা। নাকি?'

একটু এগিয়ে হাত ধরে এক পাশে টেনে নিয়ে এলাম লিওকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে গুহার দিকে এগোলো আয়শা। আমরাও রওনা হলাম পেছন পেছন।

কিছুক্ষণের ভেতর আয়শার পর্দা ঘেরা কুঠুরিতে পৌঁছে গেলাম আমরা। গদিমোড়া আসনটায় বসলো আয়শা। ইশারায় বিলালি, জব এবং পরিচারক দু'জনকে চলে যেতে বললো। আগে থেকেই সুন্দরী এক পরিচারিকা ছিলো কুঠুরিতে, সে গেল না। আয়শাও কিছু বললো না ওকে।

'বলো, হলি,' শুরু করলো সে। 'কি করে ঘটলো এ ঘটনা। কোত্থেকে এলো মেয়েটা? তোমার অনুরোধেই ওকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম। তারপর তো আর এ তল্লাটে ওর থাকার কথা নয়? জবাব দাও, সত্যি কথা বলবে। এ ব্যাপারে কোনো মিথ্যা আমি সহ্য করবো না।'

'ঘটনাক্রমেই ব্যাপারটা ঘটছে, মহামান্য রানী। আমি এর কিছুই জানতাম না।'

'বেশ, তোমার কথা বিশ্বাস করলাম, হলি। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে? সব দোষ ঐ মেয়েটার।'

'ওর তো কোনো দোষ দেখছি না আমি,' ফেটে পড়লো লিও। 'অন্য কারো বউ নয় ও, এদেশের প্রথা অনুযায়ী আমার সাথে বিয়ে হয়েছে ওর। তাহলে ওর দোষ কোথায়? ও যদি কোনো দোষ করে থাকে, আমিও করেছি। ওকে শাস্তি দিলে আমাকেও দিতে হবে। আর হ্যাঁ, তোমার ঐ বোবা-কালা গুণ্ডাগুলো যদি আর কখনো ওর গায়ে হাত দেয়, সব ক'টাকে আমি যমের বাড়ি পাঠাবো!'

নীরবে শুনলো আয়শা, কোনো মন্তব্য করলো না। তারপর ফিরলো উস্তেনের দিকে।

'কি বলার আছে তোর? খড়কুটোর চেয়েও অধম, আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে এসেছিস! বল্, কেন করেছিস এ কাজ।'

সোজা হয়ে দাঁড়ালো উস্তেন। মাথা থেকে চিতার চামড়া খুলে ছুঁড়ে দিলো এক পাশে। তারপর দৃঢ় গলায় জবাব দিলো, 'কারণ, আমার প্রেম মৃত্যুর চেয়ে অনেক অনেক বেশি শক্তিশালী! আমি এ কাজ করেছি, কারণ ওকে ছাড়া আমার বেঁচে থাকার কোনো অর্থ নেই। তাই আমি ঝুঁকি নিয়েছি। এখন মরলেও কোনো দুঃখ থাকবে না আমার,

BanglaBook.org

অন্তত একবারের জন্যে হলেও ওর মুখ থেকে শুনতে পেয়েছি, ও আমাকে ভালোবাসে।'

রাগে, উত্তেজনায় প্রায় লাফিয়ে উঠলো আয়শা। পরমুহূর্তে সামলে নিয়ে বসে পড়লো আবার।

'আমি কোনো জাদু জানি না,' একই রকম দৃঢ় গলায় স্পষ্ট উচ্চারণে বলে চললো উস্তেন, 'রানী নই আমি, অমরও নই। সাধারণ মেয়েমানুষ আমি, তবু আমি ভালো করেই বুঝেছি তোমার উদ্দেশ্য! তুমি নিজে ভালোবাসো এই লোককে, তাই আমাকে ধ্বংস করে পথের কাঁটা দূর করতে চাও। আমি জানি আমি মরবো, অন্ধকারের অতলে তলিয়ে যাবো, কিন্তু এ-ও জানি, ও আমার, তুমি কখনোই পাবে না ওকে। কখনোই ও স্ত্রী বলে গ্রহণ করবে না…।'

পরমুহূর্তে আতঙ্ক আর প্রতিহিংসা মেশানো একটা আর্তনাদ ভেসে এলো আমার কানে। ঘাড় ফেরাতেই দেখলাম, উঠে দাঁড়িয়েছে আয়শা। থর থর করে কাঁপছে সে। ইশারার ভঙ্গিতে ঝট্ করে একটা হাত বাড়িয়ে দিলো উস্তেনের দিকে। ব্যাস, ঐটুকুই, কিছু বললো না, কোনো শব্দ করলো না, শুধু হাত বাড়িয়ে দিলো মেয়েটার দিকে। এবং তাতেই হতভাগিনী উস্তেন রক্তহিম করা এক চিৎকার করে দু'হাতে মাথা চেপে ধরলো। টলোমলো পায়ে পাক খেলো দুটো, তারপর আছড়ে পড়লো মেঝেতে। আমি, লিও—দু'জনেই ছুটে গেলাম ওর কাছে—নাড়ি ধরেই বুঝতে পারলাম, সঙ্গে সঙ্গে মারা গেছে।

কয়েক মুহূর্ত লিও ঠিক বুঝতে পারলো না কি ঘটেছে। কিন্তু যখন পারলো তখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো ওর চেহারা। দাঁত কড়মড়িয়ে একটা শপথবাক্য উচ্চারণ করে উঠে দাঁড়ালো মৃত উস্তেনের পাশ থেকে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে লাফ দিয়ে এগিয়ে গেল আয়শার দিকে।

'ক্ষমা করো, অতিথি,' কোমল গলায় বললো আয়শা। 'আমার বিচার যদি তোমাকে আহত করে থাকে, ক্ষমা করো আমাকে।'

'ক্ষমা করবো? তোমাকে!' গর্জে উঠলো লিও। 'পিশাচী, খুনী, ক্ষমা করবো তোমাকে! ঈশ্বরের নামে বলছি, সুযোগ পেলেই তোমাকে খুন করবো!'

'না, না,' একই রকম কোমল গলায় বললো আয়শা। 'তুমি বুঝতে পারছো না… সময় হয়েছে, এখন সব জানা দরকার তোমার। তুমি আমার, ক্যালিক্রেটিস! তুমি আমার! দু'হাজার বছর ধরে আমি অপেক্ষা করছি তোমার জন্যে। অবশেষে আমার কাছে ফিরে এসেছো তুমি। কিন্তু ঐ মেয়েটা,' উস্তেনের দিকে ইশারা করলো সে, 'বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো তোমার আর আমার মাঝে। সেজন্যেই ওকে সরিয়ে দিতে

BanglaBook.org

হলো, ক্যালিক্রেটিস!'

'মিথ্যে কথা! আমি ক্যালিক্রেটিস নই, আমি লিও ভিনসি, ক্যালিক্রেটিস আমার পূর্বপুরুষ—অন্তত আমি সেরকমই জানি।'

'ওহ্, তুমি জানো না কি বলছো--তুমিই ক্যালিক্রেটিস, পুনর্জন্ম নিয়ে ফিরে এসেছো আমার কাছে! তুমি আমার প্রিয়তম প্রভু।'

'আমি ক্যালিক্রেটিস নই। আর শুনে রাখো, তোমার মতো পিশাচীর্ প্রভু হওয়ার ইচ্ছেও আমার নেই। তোমার চেয়ে ঐ জংলী মেয়েটা অনেক ভালো ছিলো!'

'একথা বলছো, ক্যালিক্রেটিস! তুমি একথা বলছো? বুঝেছি, অনেক দিন আগের কথা তো, কিছু মনে নেই তোমার। সত্যি বলছি, আমার রূপ যদি একবার দেখ, ভুলতে পারবে না।'

'আমি তোমাকে ঘৃণা করি, খুনী,' দুহাত মুঠো পাকিয়ে উঠলো লিওর। 'তোমার চেহারা দেখার কোনো ইচ্ছেই আমার নেই। তুমি কেমন সুন্দরী, তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি তোমাকে ঘৃণা করি।'

'তবু কিছুক্ষণের ভেতরই তুমি আমার সামনে হামাগুড়ি দেবে, এবং হলফ করে বলবে, আমাকে ভালোবাসো,' বিদ্রূপের হাসি হাসলো আয়শা। এখন আর তেমন কোমল শোনাচ্ছে না তার গলা। 'এসো এক্ষুণি প্রমাণ হয়ে যাক! দেখ!'

এক টানে মুখের আবরণটা খুলে ফেললো সে। কোমরে সাপ জড়ানো, বুকের কাছে অনেকখানি কাটা সেই পোশাকটা কেবল রইলো তার পরনে। একটু এগিয়ে এসে লিওর চোখে চোখে তাকালো সে।

আমি দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে লিওর হাতের মুঠি শিথিল হয়ে গেল। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠলো প্রথমে বিস্ময়, তারপর প্রশংসা, তারপর অদম্য এক কামনা।

'ওহ্, ঈশ্বর!' ঢোক গিললো লিও। 'তুমি কি নারী?'

'সত্যি সত্যিই নারী, এবং তোমার প্রেমিকা, ক্যালিক্রেটিস!' সুগোল বাহু দুটো বাড়িয়ে দিয়ে মিষ্টি করে হাসলো আয়শা।

দেখছে লিও, পৃথিবীর আর সব ভুলে দেখছে, এবং ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে তার দিকে। হঠাৎ করেই চোখ পড়লো উস্তেনের লাশের দিকে। কেঁপে উঠে থেমে গেল ও।

'অসম্ভব!' গর্জে উঠলো লিও। 'তুমি খুনী, ও ভালোবাসতো আমাকে!'

ও নিজেও যে মেয়েটাকে ভালোবাসতো তা ইতিমধ্যে ভুলতে বসেছে লিও।

'ও কিছু না,' মৃদু গলায় বললো আয়শা। রাতের মৃদু বাতাসে গাছের পত্র পল্লব যেমন মর্মরিয়ে ওঠে তেমন শোনালো ওর গলা। 'ও কিছু না। আমি যদি পাপ করে

BanglaBook.org

থাকি, আমার সৌন্দর্য সে দায় বহন করবে। আমি যদি পাপ করে থাকি, তোমার প্রেমের জন্যেই করেছি। তারচেয়ে এসো ওসব পাপ-পুণ্য দূরে সরিয়ে রাখি আমরা,' আবার দু'বাহু বাড়িয়ে দিলো সে। ফিস ফিস করে বললো, 'এসো।'

লিওর দুরবস্থা দেখতে পাচ্ছি আমি। উসখুস করছে বেচারা, ছুটে পালাতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। আয়শার চোখ দুটো যেন লোহার বেড়ির চেয়েও শক্ত করে আটকে রেখেছে ওকে। তার সৌন্দর্য, ইচ্ছাশক্তি এবং আবেগ ওকে মোহাবিষ্ট করে ফেলেছে। কিছুক্ষণ পরেই দেখলাম 'সে'-আয়শা, তার সম্পূর্ণ নিটোল শরীর নিয়ে ধরা দিয়েছে লিওর বাহুবন্ধনে। তার ঠোঁট দুটো সেঁটে গেছে ওর ঠোঁটের সাথে।

কতক্ষণ ওরা এভাবে রইলো আমি বলতে পারবো না। হঠাৎ দেখলাম, সাপের মতো শরীর মুচড়ে লিওর আলিঙ্গন থেকে বেরিয়ে এলো আয়শা। ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো একটু, সেই বিদ্রূপের হাসি।

'কি, বলেছিলাম না, ক্যালিক্রেটিস, কিছুক্ষণের ভেতরেই আমার সামনে হামাগুড়ি দেবে তুমি?'

দুঃখে লজ্জায় দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ বেরোলো লিওর গলা দিয়ে। চেহারা দেখেই বুঝতে পারছি, এমুহূর্তে মাটিতে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে ওর।

আবার হাসলো আয়শা। দ্রুত হাতে মুখের ওপর আবরণ টেনে পরিচারিকার দিকে তাকিয়ে একটা ইশারা করলো। এতক্ষণ অবাক বিস্ময়ে আয়শার আচরণ দেখছিলো সে। ইঙ্গিত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেল কুঠুরি ছেড়ে। দু'জন পুরুষ বোবা-কালাকে নিয়ে ফিরে এলো একটু পরেই। তাদের দিকে তাকিয়ে আরেকটা ইশারা করলো রানী। তিনজনে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে গেল উস্তেনের মৃতদেহ। হৃদয়বিদারক দৃশ্যটা এক পলক দেখলো লিও, তারপর চোখ ঢাকলো দু'হাতে।

অস্বস্তিকর এক নীরবতা নেমে এলো আয়শার পর্দাঘেরা কুঠুরিতে। মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে লিও। আমিও দাঁড়িয়ে আছি হতবাক হয়ে। আয়শাও নির্বাক, নিস্পন্দ।

অনেকক্ষণ পর আবার মুখের ওপর থেকে আবরণ সরালো আয়শা। কোমল গলায় বলতে লাগলো, 'হয়তো আমার কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারছো না, ক্যালিক্রেটিস--- হয়তো ভাবছো, আমি প্রতারণা করছি তোমার সাথে। কিন্তু সত্যি বলছি, ক্যালিক্রেটিস, দু'হাজার বছর ধরে আমি অপেক্ষা করে আছি তোমার জন্যে, তুমি আমার সেই ক্যালিক্রেটিস, নতুন করে জন্ম নিয়ে এসেছো আমার কাছে। বিশ্বাস করো, একটুও বানিয়ে বলছি না আমি।'

একটু থামলো সে, তারপর আবার বললো, 'ঠিক আছে, এখনও যদি বিশ্বাস না

BanglaBook.org

হয়, চলো, প্রমাণ দেখাবো। হলি, তুমিও চলো। তোমরা দু'জনেই একটা করে প্রদীপ নিয়ে এসো আমার সাথে।'

কিছু ভাবলাম না, বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলাম না—না আমি না লিও, দু'জনে দুটো প্রদীপ তুলে নিয়ে চললাম আয়শার পেছন পেছন। পর্দা ঘেরা কুঠুরির শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটা পর্দা উঁচু করলো সে। সরু একটা সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। আয়শার পেছন পেছন নামতে শুরু করলাম আমরা।

নামতে নামতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার খেয়াল করলাম। সিঁড়ির ধাপগুলো কেমন ক্ষয়ে যাওয়া ধরনের। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে যেমন হয় তেমন। সিঁড়ির নিচে পৌঁছে দাঁড়িয়ে পড়লাম আমি। একটু ঝুঁকে পরীক্ষা করলাম ক্ষয়ে যাওয়া ধাপগুলো। ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখলো আয়শা। থেমে দাঁড়ালো সে-ও।

'কার পায়ের আঘাতে অমন ক্ষয়ে গেছে সিঁড়ি, ভেবে অবাক হচ্ছো, হলি?' জিজ্ঞেস করলো সে। 'আমার। আমার এই কোমল পায়ের আঘাতেই এ দশা হয়েছে ওগুলোর! ধাপগুলো যখন নতুন ছিলো তখনকার কথা এখনো মনে আছে আমার। তারপর দু'হাজার বছর প্রতিদিন এই সিঁড়ি বেয়ে নামা-ওঠা করেছি। আমার পাদুকা তিলে তিলে ক্ষয় করে ফেলেছে নিরেট পাথর!'

বলার মতো কিছু খুঁজে পেলাম না আমি। তবে এটুকু বুঝলাম, যা বললো আয়শা, তা সত্যি হতেই পারে।

সিঁড়ির যেখানে শেষ একটা সুড়ঙ্গের শুরু সেখানে। সুড়ঙ্গ ধরে কয়েক পা এগোতেই একটা পর্দাটানা গুহামুখ দেখতে পেলাম। দেখার সঙ্গে সঙ্গে চিনলাম গুহাটা, সে রাতে এখানেই আমি দেখেছিলাম আয়শাকে, লাফিয়ে ওঠা আগুনের সামনে দাঁড়িয়ে অজ্ঞাত কাউকে অভিশাপ দিয়ে চলেছিলো। পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলো আয়শা। প্রদীপ হাতে অনুসরণ করলাম আমি আর লিও। রহস্য উন্মোচনের আর দেরি নেই।

একুশ

'দেখ, কোথায় আমি ঘুমিয়েছি গত দু'হাজার বছর।' লিওর হাত থেকে প্রদীপটা নিয়ে উঁচু করে ধরলো আয়শা। মেঝের ছোট্ট একটা গর্তে পড়লো আলো। সেরাতে এখানেই সেই লাফিয়ে ওঠা আগুন জ্বলতে দেখেছিলাম। আলো পড়লো পাথরের বিছানায় কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা মূর্তিটার ওপর। সেদিন যেমন দেখেছিলাম, আজও তেমনি শুইয়ে রাখা। অন্য পাশের শূন্য বিছানাটা দেখলাম, এখনও তেমন শূন্য পড়ে আছে।

BanglaBook.org

'এখানে,' শূন্য পাথরের ওপর হাত রেখে বলে যেতে লাগলো আয়শা, 'এখানেই আমি ঘুমিয়েছি যুগ যুগ ধরে রাতের পর রাত। আমার প্রিয়তম যেমন নিরেট পাথরের ওপর শুয়ে আছে আমিও তেমনি শুয়েছি, নরম বিছানার কথা ভাবতেও পারিনি। কতটা বিশ্বস্ত থেকেছি তোমার কাছে, ভেবে দেখ, ক্যালিক্রেটিস! তুমিই যে ক্যালিক্রেটিস এখনো বিশ্বাস করতে পারছো না? তাহলে এসো, দেখাই, জীবিত তুমি, মৃত তোমাকে দেখবে। তৈরি তোমরা?'

জবাব দেয়ার মতো কিছু খুঁজে পেলাম না আমরা, বিস্মিত দৃষ্টিতে আমি আর লিও তাকালাম একে অপরের দিকে।

'ভয় পেও না।' কাপড় ঢাকা মূর্তিটার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সে। ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে ধরলো কাপড়ের একটা কোনা।

'ভয় পেও না, ক্যালিক্রেটিস,' আবার বললো সে। 'সত্যিই তুমি বহু বছর আগে এক সময় হেসে খেলে বেরিয়েছো এই পৃথিবীতে, বুক ভরে টেনে নিয়েছো বাতাস। তারপর মরে গিয়েছিলে তুমি, তোমার আত্মা বেরিয়ে এসেছিলো তোমার দেহ ছেড়ে। দু'হাজার বছর পর আবার তুমি জন্ম নিয়ে এসেছো এই পৃথিবীতে।

'দেখ!'

একটানে কাপড়টা সরিয়ে ফেললো আয়শা। প্রদীপের আলো ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়লো দেহটার ওপর। আমি দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে এলাম আতঙ্কে। অবিশ্বাস্য সে দৃশ্য! পাথরের ওপর শুয়ে আছে লিও! —না, শাদা পোশাক পরা একটা মানুষ, হুবহু লিওর মতো দেখতে! লিওর দিকে তাকালাম আমি। আমার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, জীবিত। আবার চোখ গেল পাথরের ওপর শোয়ানো মূর্তিটার দিকে—লিও, শুয়ে আছে, মৃত।

'ঢাকো ওটা!' চিৎকার করে উঠলো লিও। 'এখান থেকে নিয়ে চলো আমাকে!'

'না, ক্যালিক্রেটিস, দাঁড়াও,' আবেদন জানালো আয়শা। 'দাঁড়াও, আরো দেখার আছে। আমার কোনো পাপই তোমার কাছে লুকিয়ে রাখবো না। হলি, মৃত ক্যালিক্রেটিসের বুকের কাপড়টা সরাও তো।'

কম্পিত হাতে আয়শার নির্দেশ পালন করলাম আমি। উন্মুক্ত হয়ে গেল মৃত ক্যালিক্রেটিসের প্রশস্ত বুকটা। আতঙ্কিত চোখে দেখলাম, তার বাঁ পাশে ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর গভীর একটা ক্ষত। বল্লম অথবা ছোরা দিয়ে আঘাত করেছিলো কেউ।

'দেখেছো, ক্যালিক্রেটিস,' বললো আয়শা। 'আমিই তোমাকে হত্যা করেছিলাম। জীবনের বদলে দিয়েছিলাম মৃত্যু। মিশরীয় রাজকন্যা আমেনার্তাস-এর কারণে হত্যা করতে হয়েছিলো তোমাকে, ওকে তুমি ভালোবাসতে, নির্দয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলে

BanglaBook.org

আমার ভালোবাসা। ওকেই আমি মারতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পারিনি, কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমার চেয়ে ওর ক্ষমতা ছিলো বেশি! যা-ই হোক, তুমি ফিরে এসেছো আমার কাছে। এখন আবার কেউ বাধা হয়ে দাঁড়াবে তোমার আমার মাঝে, কিছুতেই তা সহ্য করবো না আমি। শোনো, ক্যালিক্রেটিস,' এখানে এসে কেমন ফিসফিসে আর স্খলিত হয়ে উঠলো আয়শার গলা, 'আমি-আমি তোমাকে জীবন দেবো, অবশ্যই অনন্ত জীবন নয়-অনন্ত জীবন কেউ দিতে পারবে না, আমি যা দেবো তাতে তোমার বর্তমান যৌবন আর চেহারা নিয়ে হাজার হাজার বছর বেঁচে থাকবে। শুধু তা-ই নয়, ধন, সম্পদ, ক্ষমতা-মোটকথা ভোগ করার মতো যাবতীয় জিনিস চলে আসবে তোমার হাতের মুঠোয়। আর একটা কথা, এখন থেকে বিশ্রাম নেবে তুমি, তৈরি হবে সেদিনের জন্যে, যেদিন নব জন্ম হবে তোমার।'

থামলো আয়শা। একটু পরেই আবার অনেকটা আপন মনে বলে উঠলো, 'আমি তো জীবন্তকেই পেয়ে গেছি, মৃতকে আর ধরে রেখে লাভ কি? যে ধুলো থেকে এসেছিলো, তাতেই মিশে যাক!'

অন্য পাথরের তাকটার কাছে চলে গেল সে। বড় একটা মুখ আঁটা দুই হাতলওয়ালাপাত্র তুলে নিয়ে আবার চলে এলো এপাশে। ঝুঁকে আলতো করে চুমু খেলো মৃত লোকটার কপালে। তারপর সাবধানে পাত্রের মুখ খুলে একটু একটু করে মৃত দেহটার ওপর ঢেলে দিতে লাগলো পাত্রের তরল পদার্থ। সঙ্গে সঙ্গে গাঢ় ধোঁয়ার মতো ভাপ উঠতে শুরু করলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পূর্ণ গুহা ভরে গেল ধোঁয়ায়। খুক খুক করে কাশতে শুরু করলাম আমরা, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। বিজ্-জ্-জ্-জ্ একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি কেবল।

কয়েক মিনিট কাটলো এভাবে। একটু একটু করে সরে যাচ্ছে সাদা ধোঁয়া। কিছুক্ষণের ভেতর পরিষ্কার হয়ে গেল গুহা। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, একটু আগেও যেখানে ছিলো ক্যালিক্রেটিসের মৃতদেহ সেখানে এখন খানিকটা সাদা গুঁড়ো ছাড়া আর কিছু নেই।

'ধুলো মিশে গেল ধুলোর সঙ্গে। অতীত হারিয়ে গেল অতীতে!-মৃত ক্যালিক্রেটিস জন্ম নিয়েছে আবার!' আপন মনে কথাগুলো বললো আয়শা। তারপর আমাদের দিকে ফিরে, 'এবার যাও তোমরা। পারলে একটু ঘুমিয়ে নাও। কাল সন্ধ্যায় আমরা রওনা হবো; দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।'

ঘরে ফিরেই কান্নায় ভেঙে পড়লো লিও।

BanglaBook.org

'কি করবো আমি, হোরেস কাকা?' আমার কাঁধে মাথা রেখে বললো সে। 'ওকে মেরে ফেললো, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম! কিছু তো করতে পারলামই না, উপরন্তু পাঁচ মিনিটের ভেতর খুনী মেয়েলোকটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেলাম! এত নীচে নেমে গেছি আমি! উহ্, ঈশ্বর! কিন্তু কি করবো? আমি তো ঠেকাতে পারছি না নিজেকে। পুরোপুরি ওর শক্তির অধীনে চলে গেছি। চুম্বক যেমন টানে লোহাকে, তেমনি ও-ও সারা জীবন পেছন পেছন টেনে নিয়ে বেড়াবে আমাকে। কি করবো আমি, হোরেস কাকা, বলো? আমি ওকে ঘৃণা করি, অন্তর থেকে ঘৃণা করি, তবু কেন মন থেকে তাড়াতে পারছি না ওর চিন্তা?'

কি বলবো আমি? আমারও যে একই অবস্থা! এবং এই প্রথম বারের মতো আমি লিওকে জানালাম সে কথা। দেখলাম, একটুও ঈর্ষাকাতর হলো না লিও, বরং নিজের দুঃখ ভুলে একটু সমবেদনা জানালো আমাকে।

পালানোর কথা ভাবলাম একবার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করে দিলাম সে চিন্তা। সম্ভব নয় পালানো। চেষ্টা করার আগেই টের পেয়ে যাবে আয়শা। তারপর কি ঘটবে ভেবে পেলাম না। তবে এটুকু বুঝলাম, ভয়ানক কিছু-ই ঘটবে।

নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা বিচার করে দেখলাম আমাদের অবস্থা। কিন্তু কোনো থই পেলাম না। আমাদের হাতে কিছুই নেই, সব আয়শার নিয়ন্ত্রণে। সে যা করবে তা-ই হবে। সুতরাং ও নিয়ে আর না ভেবে শুয়ে পড়ার পরামর্শ দিলাম লিওকে। আমিও শুয়ে পড়লাম নিজের বিছানায় গিয়ে।

বাইশ

পরদিন দুপুরের কিছু আগে বিলালি এসে জানালো 'সে' ডেকেছে আমাদের। সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলাম আমরা। যথারীতি দু'জন সুন্দরী পরিচারিকা পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। পরিচারিকা দু'জন বেরিয়ে যেতেই মুখ থেকে আবরণ সরালো আয়শা। এগিয়ে এসে আলিঙ্গন করলো লিওকে। তারপর ওর মাথায় হাত রেখে বললো, 'জানো, ক্যালিক্রেটিস, কখন তুমি সত্যিই আমার হবে? বলছি, শোনো, প্রথমে আমার মতো হতে হবে তোমাকে, অবশ্যই অমর নয়, কারণ আমিও অমর নই। তবে সময় যাতে তার ছাপ এঁকে দিতে না পারে তোমার চেহারায়, শক্তিতে; সে ব্যবস্থা নিতে হবে। তা না হলে কখনোই আমরা মিলিত হতে পারবো না, কারণ তোমার আর আমার ভেতর পার্থক্য রয়েছে। আমার অস্তিত্বের তেজ তোমাকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে ফেলবে।'

BanglaBook.org

থামলো আয়শা। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আবার বলতে লাগলো, 'আজ বিকেলে, সূর্য ডোবার একঘন্টা আগে আমরা রওনা হবো, এবং সবকিছু যদি ঠিক ঠাক থাকে, আমি যদি পথ ভুল না করি–সে সম্ভাবনা অবশ্য খুবই কম, কাল সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাবো জীবনের অগ্নিস্তম্ভের কাছে। সেই আগুনে স্নান করে তুমি পরিশুদ্ধ হবে। তারপর, প্রিয়তম ক্যালিক্রেটিস, তুমি আমার স্বামী হবে, আমি হবো তোমার স্ত্রী।'

বিড়বিড় করে কিছু একটা বলার চেষ্টা করলো লিও। কি তা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ওর দ্বিধা দেখে একটু হাসলো আয়শা।

'আর তোমাকেও, হলি,' বলে চললো সে, 'এই অনুগ্রহ দান করবো আমি। তুমিও স্নান করবে জীবনের আগুনে। তারপর দেখবে, চিরসবুজ হয়ে গেছ তুমি। তোমাকে এ সুযোগ দেবো, কারণ–কারণ তুমি খুশি করতে পেরেছো আমাকে।'

'ধন্যবাদ, আয়শা,' যথাসম্ভব গাম্ভীর্য রক্ষা করে জবাব দিলাম। 'কিন্তু আমি চাই না অমন দীর্ঘ জীবন। আজকের পৃথিবীতে জীবন ধারণ করাটা খুব সুখের ব্যাপার নয়। হানাহানি, মারামারি, দুঃখ–বেদনা, এত বেড়ে গেছে; প্রাণ টিকিয়ে রাখা এত কষ্টকর হয়ে পড়েছে যে, আমার মনে হয় যত তাড়াতাড়ি এখান থেকে বিদায় নেয়া যায় ততই মঙ্গল।'

'দীর্ঘ জীবন এবং অপরিমেয় শক্তি আর সৌন্দর্য পেলে কোনো দুঃখ কষ্টই আর থাকবে না। দুনিয়ার যাবতীয় মহার্ঘ বস্তু তোমার হাতের মুঠোয় এসে যাবে।'

'তাতেই বা কি লাভ, আয়শা? উচ্চাকাঙ্ক্ষা জিনিসটা অসীম একটা মই ছাড়া তো কিছু নয়, উঠে যাও, উঠে যাও, উঠে যাও; তবু শেষ পাবে না কোনো। ফলে তৃপ্তিও ঘুচবে না কোনোদিন। তারচেয়ে আমি যে জীবন নিয়ে জন্মেছি, সে জীবন নিয়েই থাকতে চাই। মৃত্যুর সময় হলে মরে যাবো, দুনিয়ার মানুষ আমাকে মনে রাখলো কি না রাখলো, তাতে কিছুই এসে যায় না।'

'মনে হচ্ছে তুমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছো, দীর্ঘ জীবন চাও না,' একটু হাসলো আয়শা। 'কিন্তু একদিন তুমি আক্ষেপ করবে, হলি, আরেকটু যখন বয়স বাড়বে, দেহের চামড়া হাজার হাজার ভাঁজ পড়ে ঝুলে যাবে, মগজের ক্ষমতা কমে আসবে, মানুষের সাহায্য ছাড়া চলতে পারবে না, তখন–তখন তুমি হায়–হায় করবে, হলি; বলবে, কি সুযোগটা পেয়েও হারিয়েছি।'

কোনো জবাব দিলাম না আমি। লিওর সামনে কি করে আয়শাকে জানাবো, কেন আমি দীর্ঘ জীবন চাই না? যে মুহূর্তে তার রূপ দেখেছি এবং নিঃসংশয়ে জেনেছি কোনোদিনই তাকে পাবো না সে মুহূর্ত থেকে মৃত্যুই হয়ে উঠেছে আমার একমাত্র

BanglaBook.org

কামনা। কি করে এই সত্যি কথাটা স্বীকার করবো আয়শার কাছে?

'যাকগে, তোমার ভালোমন্দ তুমিই বুঝবে,' বলে লিওর দিকে ফিরলো আয়শা। 'প্রিয়তম ক্যালিক্রেটিস, কাল রাতে কি যেন বলছিলে তুমি? মৃত ক্যালিক্রেটিস নাকি তোমার পূর্ব পুরুষ? কি করে, বলো দেখি।'

বললো লিও, কারুকাজ করা রূপোর বাক্সের ভেতর পাওয়া পোড়ামাটির ফলক, তার উপর মিসরীয় রাজকন্যা আমেনার্তাসের লেখা আশ্চর্য আখ্যান, কি করে ওগুলো ওর হাতে পৌঁছেছে সব একে একে বলে গেল।

মনোযোগ দিয়ে শুনলো আয়শা। তারপর বললো, 'হুঁ, এরকমই হয়। ভালোর ভেতর থেকে কখন মন্দ, বা মন্দের ভেতর থেকে কখন যে ভালো বেরিয়ে আসবে কেউ বলতে পারে না। বীজ বোনার সঙ্গে সঙ্গে কি মানুষ বলতে পারে ফল কেমন হবে? দেখ, এই মিসরীয় রাজকন্যা আমেনার্তাস, ঘৃণা করতো আমাকে, আমিও ঘৃণা করতাম ওকে—এখনো করি। সে তার ছেলের উদ্দেশ্যে লিখে রেখে গেছিলো যেন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়। কিন্তু বাস্তবে কি ঘটলো? তার ছেলে পারলো না প্রতিশোধ নিতে। বরং প্রায় দু'হাজার বছর পরে তারই এক উত্তর পুরুষ; তারই লিখে রেখে যাওয়া পথের নিশানা অনুসরণ করে এলো, প্রতিশোধ নিতে নয়, রহস্য উন্মোচন করতে।'

থামলো সে, তারপর আবার শুরু করলো, 'প্রিয়তম ক্যালিক্রেটিস, রহস্য উন্মোচিত হয়েছে,' আবেগে উত্তেজনায় কাঁপছে তার গলা। 'এবার কি প্রতিশোধ নেবে? আমি যে ক্যালিক্রেটিসকে হত্যা করেছিলাম সে তোমার পূর্ব পুরুষ, এক হিসেবে তুমি তার পুত্র, মায়ের আদেশ অনুযায়ী তোমার উচিত আমাকে হত্যা করা। দেখ,' হাঁটু গেড়ে বসে পড়লো আয়শা। বুকের কাপড় টেনে নামিয়ে আনলো নিচে, একটা স্তন সম্পূর্ণ অনাবৃত হয়ে গেল। 'দেখ, ক্যালিক্রেটিস, এখানে—এখানে স্পন্দিত হচ্ছে আমার হৃৎপিণ্ড, আর ঐ যে ওখানে রয়েছে ছুরি, ভারি, লম্বা, ধারালো। ওটা নিয়ে এসো, বিঁধিয়ে দাও এখানে। হত্যা করো আমাকে! অতীতের রায় কার্যকর হোক!'

নিঃশব্দে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো লিও। তারপর এগিয়ে গিয়ে ধরলো ওকে। 'ওঠো আয়শা,' গাঢ় স্বরে বললো লিও। 'ভালো করেই জানো, তোমাকে আঘাত করার সাধ্য আমার নেই। কাল রাতে যাকে তুমি হত্যা করেছো তার খাতিরেও না। পুরোপুরি তোমার শক্তির অধীন আমি, আমি তোমার দাস। কি করে তোমাকে হত্যা করবো?—হয়তো শিগগিরই আমি নিজেকেই হত্যা করবো।'

'এই তো, আমাকে ভালোবাসতে শুরু করেছো, ক্যালিক্রেটিস,' মৃদু হেসে বললো আয়শা। 'ঠিক আছে, এখন যাও তোমরা। যাত্রার জন্যে তৈরি হতে হবে

BanglaBook.org

আমাকে। তোমরাও তৈরি হয়ে নাও। তোমাদের চাকরটাকেও সঙ্গে নিতে পারো। জিনিসপত্র বেশি নেয়ার দরকার নেই। খুব বেশি হলে তিন দিন আমরা বাইরে থাকবো। তারপর এই অভিশপ্ত কোর ছেড়ে রওনা হয়ে যাবো। তোমাদের দেশে বা অন্য কোনো সুন্দর জায়াগায় গিয়ে বসতি করবো আমরা।'

তেইশ

তৈরি হতে খুব বেশিক্ষণ লাগলো না আমাদের। গায়ের কাপড়গুলো বদলে নিলাম, হাতব্যাগে ভরলাম কয়েক জোড়া অতিরিক্ত জুতো, ব্যাস! এ ছাড়া আর যা সঙ্গে নিলাম তা হলো, আমার আর লিওর রিভলভার আর এক্সপ্রেস রাইফেল দুটো। গুলি নিলাম প্রচুর; বলা যায় না কি পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয় আগামী তিন দিনে।

নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট আগে আমরা আয়শার পর্দাঘেরা কুঠুরিতে গেলাম। সে-ও তৈরি। স্বাভাবিক পোশাকের ওপর কালো আলখাল্লা চড়িয়েছে। মুখ যথারীতি ঢাকা।

'তৈরি তোমরা? রওনা হওয়া যায় এখন?' জিজ্ঞেস করলো সে।

'হ্যাঁ, কিন্তু, আয়শা, এখনো আমি বিশ্বাস করতে পারছি না তোমার এই···।'

'আহ্, হলি, তুমি সেই পুরানো দিনের ইহুদীদের মতোই অবিশ্বাসী, অজানা কোনো কিছু বিশ্বাস করতে চাও না। যাক সে, সময় হলেই দেখতে পাবে। এখন চলো নতুন জীবনের পথে রওনা হই আমরা—কোথায় গিয়ে শেষ হবে সে পথ কে জানে?'

'ঠিক, কোথায় গিয়ে শেষ হবে, কে জানে?' প্রতিধ্বনি করলাম আমিও।

বেরিয়ে এলাম আমরা আয়শার কুঠুরি ছেড়ে। বড় গুহার ভেতর দিয়ে বাইরে খোলা আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালাম। একটা মাত্র পাল্কি রাখা গুহার মুখে। ছ'জন বাহক, সবাই বোবা-কালা। লক্ষ করলাম, ওদের সাথে অপেক্ষা করছে আমাদের পুরানো বন্ধু বিলালি। আমাদের সাথে সে-ও যাচ্ছে দেখে বেশ স্বস্তি বোধ করলাম মনে মনে। একটা মাত্র পাল্কি দেখে প্রথমে একটু ভুরু কোঁচকালেও পরে মনে হলো, নিশ্চয়ই কোনো ব্যাপার আছে, যে কারণে আয়শা ঠিক করেছে সে একাই পাল্কিতে যাবে আর বাকিরা যাবে হেঁটে। হেঁটে যেতে হবে ভেবে খুব একটা যে মুষড়ে পড়লাম তা অবশ্য নয়, গত কয়েকদিন শুয়ে বসে থেকে হাত-পায়ে জড়তা এসে গেছে। এখন হাঁটতে ভালোই লাগবে। ঘটনাক্রমে না 'সে'-র নির্দেশে জানি না, গুহামুখের সামনে

BanglaBook.org

চত্বরটা ফাঁকা। বাহক ছ'জন আর বিলালি ছাড়া একটা লোকও নেই। সম্ভবত আয়শা চায়নি, কেউ দেখুক বা জানুক সে বাইরে যাচ্ছে। তার বোবা-কালা পরিচারক-পরিচারিকারা অবশ্য জেনেছে, তবে তাতে কিছু এসে যায় না। ওরা কাউকে কিছু বলতে পারবে না।

কয়েক মিনিটের ভেতর আমরা সবুজ শস্যক্ষেত্র আর সেই শুকিয়ে যাওয়া হ্রদের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললাম। সূর্য এখনো ডোবেনি, তবে শিগগিরই ডুববে। প্রতিদিনের মতো আজও ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আসছে কোর-এর সমভূমি। দূরে প্রাচীন কোর নগরীর ধ্বংসস্তূপ দেখালো আমাদের বিলালি। ধ্বংসস্তূপের বিস্তৃতি আর উচ্চতা দেখেই বুঝতে পারলাম, আসল নগরটা কেমন বিশাল, সুন্দর আর গগনচুম্বী ছিলো। প্রাচীন থিবি বা ব্যাবিলনের কথা মনে পড়ে গেল আমার। ওগুলোর মতোই বর্ধিষ্ণু নগর ছিলো এই কোর-ও। কালের করাল গ্রাসে আজ কি অবস্থা!

সূর্য পুরোপুরি ডুবে যাওয়ার মিনিট দশেক আগে ধ্বংসস্তূপের প্রান্তে পৌঁছুলাম আমরা। প্রায় ষাট ফুট চওড়া পরিখা দিয়ে ঘেরা পোড়ো নগরীটা। পরিখার বেশির ভাগ জায়গা-ই হেজে-মজে গেছে, তবে দু'এক জায়গায় পানি আছে এখনো। পরিখার ওপাশেই পাথরের দেয়াল। জায়গায় জায়গায় ভেঙে পড়েছে। কোর-এর নির্মাতারা ভালোমতোই সুরক্ষিত করেছিলো তাদের নগরীকে।

পাড় ধরে কিছুদূর এগোনোর পর পরিখার এক জায়গায় দেখলাম স্তূপ হয়ে আছে ইট-কাঠ-পাথরের নানা আকারের টুকরো। এক কালে নিশ্চয়ই পুল ছিলো এখানে।

অনেক কষ্টে সেতুটা পেরোলাম আমরা। তারপর দেয়ালের ভাঙা একটা অংশ দিয়ে ঢুকে পড়লাম নগরে।

নগরীর রাজপথ ধরে এগিয়ে চলেছি। এখন অবশ্য আর রাজপথ বলে চেনা যায় না, ঘাস আর ঝোপ-ঝাড়ে ছেয়ে গেছে। দু'পাশের বিশাল বিশাল সৌধগুলো হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পথের ওপর। যেগুলো এখনো দাঁড়িয়ে আছে, দাঁত বের করা মড়ার খুলির চেহারা হয়েছে সেগুলোর। হঠাৎ একটা কথা মনে হতেই অদ্ভুত এক শিহরণ খেলে গেল আমার শরীরে—হাজার হাজার বছরের মধ্যে আমরাই হয়তো প্রথম হাঁটছি এই পথ দিয়ে!

অবশেষে বিরাট এক অট্টালিকার সামনে পৌঁছুলাম আমরা। কমপক্ষে আট একর জমির ওপর মাথা তুলে আছে দালানটা। চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম, এক কালে মন্দির ছিলো। সারি সারি বিশাল স্তম্ভ ধরে রেখেছে ছাদগুলো। অদ্ভুত আকৃতি সে সব স্তম্ভের। নিচের দিক সরু, মাঝখানে মোটা ওপর দিকে আবার সরু হয়ে গেছে ক্রমশ।

BanglaBook.org

আয়শার নির্দেশে বিশাল মন্দিরটার সামনে থেমে দাঁড়ালো আমাদের ছোট্ট মিছিল। পাল্‌কি থেকে নামলো আয়শা।

'নিশ্চিন্তে রাত কাটানোর মতো একটা জায়গা ছিলো এখানে,' লিওর দিকে তাকিয়ে বললো সে। 'এখনও আছে না ভেঙে পড়েছে, কে জানে? দু'হাজার বছর আগের কথা। তুমি আমি আর সেই মিসরীয় কালনাগিনী রাত কাটিয়েছিলাম ওখানে। চলো দেখা যাক।'

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলো সে। আমরাও চললাম পেছন পেছন। অসংখ্য ধাপ সিঁড়িটার। কালের গ্রাসে ক্ষয়ে গেছে কোনো কোনো জায়গা। উঠতে উঠতে হাঁপ ধরে গেল। অবশেষে উপরে পৌঁছুলাম। বাঁ দিকে ঘুরে কিছুটা এগিয়ে গেল আয়শা। উঁকি দিলো অন্ধকারের ভেতর। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে আরো কয়েক পা এগোলো। তারপর ফিরলো আমাদের দিকে।

'আছে এখনো, ভেঙে পড়েনি,' বললো সে। তারপর দুই বেহারাকে ইশারায় বললো সব জিনিসপত্র নিয়ে উঠে আসতে।

জিনিসপত্র নিয়ে আসার পর বাহকদের একজন একটা প্রদীপ জ্বাললো। আমাহ্যাগাররা যখন কোথাও যায়, সঙ্গে সবসময় ছোট্ট একটা পাত্রে খানিকটা আগুন বহন করে। মাঝে মাঝে তাতে জ্বালানী দিয়ে আগুনটা তাজা রাখে। এই আগুনের সাহায্যেই প্রদীপ জ্বাললো লোকটা। প্রদীপ জ্বলে উঠতেই আমরা ঢুকলাম সেখানে। বড় একটা কামরা। মাঝখানে বিরাট একটা পাথরের টেবিল।

ঝট্‌পট্‌ কামরাটা পরিষ্কার করে শোয়ার বন্দোবস্ত করে ফেললাম। সঙ্গে ছিলো ঠাণ্ডা মাংস দিয়ে রাতের খাওয়া সেরে নিলাম আমি লিও আর জব। আয়শা খেল, মদিরার পিঠে আর পানি ছাড়া কিছু খেলো না। একটু পরেই চাঁদ উঠে এলো পাহাড়ের আড়াল থেকে। রূপালি আলোর বন্যায় প্লাবিত হয়ে গেল কোর-এর ধ্বংসস্তূপ।

'আন্দাজ করতে পারো, হলি, এখানে কেন নিয়ে এসেছি তোমাদের?' উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো আয়শা। 'শোনো—কিন্তু ক্যালিক্রেটিস, আশ্চর্য, এখন যেখানে তুমি শুয়ে আছো ঠিক ওখানেই তোমার মৃতদেহ পড়ে ছিলো, সেই কত বছর আগের কথা! আমি একা তোমার ঐ ভারি শরীরটা বয়ে নিয়ে পৌঁছলাম কোর-এর গুহায়। কি যে কষ্ট হয়েছিলো, মনে পড়লে এখনো শিউরে উঠি।' সত্যি সত্যিই কেঁপে উঠলো তার শরীর।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে লিও-ও যেন শিউরে উঠলো একটু। তাড়াতাড়ি উঠে জায়গা বদলে বসলো।

BanglaBook.org

'যাকগে, যা বলছিলাম,' বলে চললো আয়শা, 'তোমাদের এখানে নিয়ে এসেছি কারণ, এমন আশ্চর্য একটা জিনিস দেখাবো, যা কোনো মানুষের চোখ কখনো দেখেনি। আজ পূর্ণিমা, আজই তো দেখার সময়! এই বিশাল মন্দির আর এখানে যাঁর পূজা হতো—দেখবে?'

সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলাম আমরা। বিশাল মন্দিরের বিভিন্ন অংশ ঘুরিয়ে দেখালো আয়শা। আশ্চর্য এক গাম্ভীর্য তার নির্মাণ-শৈলীতে। অদ্ভুত এক অনুভূতিতে ছেয়ে গেল আমাদের মন। সুবিশাল, মহান কোনো কিছুর সামনে দাঁড়ালে যেমন অনুভূতি হয়, মাথা নোয়াতে ইচ্ছে করে, তেমন অনুভূতি। সারি সারি স্তম্ভ, ফাঁকা উঠোন, উঁচু উঁচু বিরাট কক্ষ—সবগুলো ফাঁকা, আর অন্তহীন নিস্তব্ধতা। ফিসফিস করে কথা বলছি আমরা, যেন জোরে বললেই জেগে উঠবে হাজার হাজার বছরের ঘুমন্ত মন্দির।

দেখছি আর দেখছি, কিন্তু তৃপ্ত হচ্ছে না চোখ, যত দেখছি ততই বেড়ে উঠছে দেখার আকাঙ্ক্ষা।

'এসো,' অবশেষে বললো আয়শা। 'আসল জিনিস এখনো দেখা হয়নি।'

সারি সারি থাম ঘেরা দুটো উঠোন পেরিয়ে মন্দিরের কেন্দ্রস্থলে নিয়ে গেল সে আমাদের। লম্বায়-চওড়ায় পঞ্চাশ গজের মতো বর্গাকৃতির একটা চত্বর। এই উঠোনের চারদিকে যে দেয়াল আর থামগুলো তার কারুকাজ আরো সুন্দর, আরো নিখুঁত। যারা এ কাজ করেছে তারা যে বিশ্বের সর্বকালের সেরা শিল্পী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। চত্বরের ঠিক মাঝখানে বিরাট একটা গোলক, কালো পাথর দিয়ে তৈরি। বিশফুট মতো হবে গোলকটার ব্যাস। তার ওপর অপূর্ব ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে ডানাওয়ালা এক মূর্তি। স্বর্গীয় সৌন্দর্য তার চোখে মুখে। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোয় মূর্তিটা দেখে হৃদস্পন্দন বন্ধ হওয়ার অবস্থা হলো আমার।

শ্বেত মর্মরে তৈরি মূর্তিটা এত হাজার বছর পরেও এমন নিখুঁত আর চকচকে রয়েছে যে আমি বিস্মিত না হয়ে পারলাম না। ডানাওয়ালা মূর্তিটা নারীর সামান্য সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। গোটানো-ও নয়, ছড়ানো-ও নয়, মাঝামাঝি অবস্থায় রয়েছে ডানা দুটো। দু'বাহু সামনে বাড়ানো, যেন অতি প্রিয় কোনো কিছুকে আলিঙ্গনের আহ্বান জানাচ্ছে। নিটোল, নিখুঁত মূর্তিটা সম্পূর্ণ নগ্ন—কেবল মুখটা ছাড়া। মুখটা এমন ভাবে তৈরি, দেখে মনে হয় হালকা প্রায় স্বচ্ছ, কিন্তু পুরো স্বচ্ছ নয় এমন কোনো কাপড় দিয়ে ঢাকা। কাপড়টার দুই প্রান্ত ঝুলে আছে দুই স্তনের ওপর।

'কার মূর্তি এটা?' কোনো রকমে ওটার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

BanglaBook.org

'আন্দাজ করতে পারছো না, হলি?' বললো আয়শা। 'তোমার কল্পনাশক্তি তাহলে কোথায়? সত্য দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর ওপর, সন্তানদের ডাকছে তার মুখের আবরণ উন্মোচন করার জন্যে। ভিত্তি প্রস্তরের ওপর কি লেখা রয়েছে দেখ।'

দেখলাম সেই গুহার ভেতর যেমন দেখেছিলাম তেমন চীনা ছাঁদের লেখা। আয়শা অনুবাদ করে শোনালোঃ

"আমার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে আমার মুখের দিকে তাকানোর মতো মানুষ কি নেই পৃথিবীতে? খুবই সুন্দর আমার মুখ। যে আমার মুখাবরণ সরাতে পারবে, আমি তার হবো, এবং আমি তাকে শান্তি দেবো, জ্ঞানী পুণ্যবান সুকুমার সন্তান দেবো।"

'শুনে একটা কণ্ঠস্বর চিৎকার করে উঠলো, "সবাই তোমার পেছন পেছন ছুটছে, তোমাকে কামনা করছে, দেখ! তবু তুমি কুমারী, আজীবন তুমি কুমারী-ই রইবে। কোনো মানবীর গর্ভে এমন কোনো মানুষ জন্মগ্রহণ করেনি যে তোমার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করার পরও বেঁচে থাকবে। একমাত্র মৃত্যুই তোমার মুখাবরণ সরাতে পারবে, হে সত্য!"

'এবং সত্য দু'বাহু বাড়িয়ে দিয়ে কেঁদে উঠলো, কারণ, যারা তার প্রেমাকাঙ্ক্ষী কখনোই তারা জয় করতে পারবে না তাকে, এমন কি তাকাতে পর্যন্ত পারবে না তার মুখোমুখি। বুঝতে পারছো?' বললো আয়শা। 'প্রাচীন কোরবাসীদের দেবী ছিলো সত্য। তার উদ্দেশ্যেই তৈরি করা হয়েছিলো এই মন্দির। ওরা নিঃসংশয়ে বুঝেছিলো, সত্যকে কোনো দিনই পাবে না তবু তারই উপাসনা করে গেছে সারা জীবন।'

'এবং তারপর,' ভারাক্রান্ত গলায় বললাম আমি, 'আজ পর্যন্ত মানুষ খুঁজে চলছে সত্যকে, কিন্তু পায়নি, এই উৎকীর্ণ লিপিতে যেমন বলা হয়েছে, পাবেও না, কারণ একমাত্র মৃত্যুর মাঝেই পাওয়া যায় সত্যকে।'

আবার একটার পর একটা উঠোন পেরিয়ে ফিরে এলাম আমরা। আসার সময় একটা কথাই কেবল মাথার ভেতর ঘুরতে লাগলো আমার, পৃথিবী যে গোল তা অত বছর আগেও কি করে টের পেয়েছিলো কোরবাসীরা! আশ্চর্য! কতটা উন্নত হয়েছিলো ওদের বিজ্ঞান!

চব্বিশ

পরদিন ভোর হওয়ার আগেই বোবা-কালা বাহকরা জাগিয়ে দিলো আমাদের। মন্দিরের

BanglaBook.org

বাইরে উঠোনের উত্তর কোনায় একটা মর্মর বাঁধানো ঝরনা থেকে এখনো পানি বেরোয়। কাপড়-চোপড় পরে সেটার কাছে গিয়ে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম আমরা। ফিরে এসে দেখি যাত্রার জন্যে তৈরি আয়শা। পাল্‌কির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। বিলালি আর দুই বাহক তড়িঘড়ি বয়ে আনছে আমাদের জিনিসপত্র। যথারীতি 'মর্মর সত্যে'র মতো অবগুণ্ঠিত আয়শার মুখ। তবু কেন যেন—হয়তো ওকে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই, আমার মনে হলো একটু বিষণ্ন হয়ে আছে সে।

আমাদের পদশব্দ শুনে মুখ তুলে তাকালো আয়শা। ভদ্রতাসূচক কুশল বিনিময় হলো। রাতে কেমন ঘুমিয়েছে, জিজ্ঞেস করলো লিও।

'খারাপ ক্যালিক্রেটিস,' জবাব দিলো সে, 'ভীষণ খারাপ! সারারাত আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছি। ওগুলোর অর্থ যে কি এখনো বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, অশুভ কিছুর ছায়া পড়েছে আমার ওপর।' একটু থেমে কি যেন ভাবলো আয়শা। তারপর বললো, 'চলো রওনা হওয়া যাক। অনেক দূর যেতে হবে, আর দেরি করা উচিত হবে না।'

পাঁচ মিনিটের ভেতর আবার পথে নামলাম আমরা। কারনগরীর ধ্বংসাবশেষের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললাম। একেবারে সামনের পাল্‌কিতে আয়শা, তারপর বিলালি আর বদলি বাহক দু'জন, তারপর আমি আর লিও এবং একেবারে শেষে জব। কেমন যেন মিইয়ে গেছে বেচারা। আসার আগে অনেক যুক্তি তর্কের জাল বিস্তার করে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলো, ঐ ভয়ানক মেয়ে মানুষটার সঙ্গে যেন না আসি আমরা, কেমন যেন বিপদের গন্ধ পাচ্ছে ওর মন। পাত্তা দিইনি আমরা। বিপদের সম্ভাবনা আছে জানি, কিন্তু তাই বলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবো তেমন লোক নই আমি, লিও তো নয়ই। এখনও বোধহয় সেই বিপদের বিভীষিকা দেখছে জব।

সূর্যের প্রথম রশ্মি পুব আকাশ আলোকিত করে তোলার আগেই নগরের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেলাম আমরা। আবার দেয়াল পেরিয়ে, একটা ভাঙা সেতু পেরিয়ে যখন সমভূমিতে উঠে এলাম তখন রাঙা হয়ে উঠছে পুব দিগন্ত।

প্রায় ঘন্টাখানেক পর সকালের নাশতা সেরে নেয়ার জন্যে এক জায়গায় থামলাম আমরা। দিনের আলো ফুটে ওঠার সাথে সাথে আয়শার মনও ভালো হয়ে উঠেছে। দূরে দাঁড়ানো বিলালির দিকে ইশারা করে সে বললো, 'এই বর্বরগুলো অন্তর থেকে বিশ্বাস করে কোর-এর ওপর নাকি ভূতের আছর আছে। ওদের এই একটা কথা আমি সত্যিই বিশ্বাস করি। ওহ্, এখনো স্পষ্ট দেখতে পাই, ক্যালিক্রেটিস, তুমি আমার পায়ের কাছে পড়ে আছো, প্রাণহীন! নাহ্, আর কখনো এ জায়গায় আসবো না, সত্যিই অশুভ জায়গাটা।'

BanglaBook.org

সামান্য সময়ের মধ্যেই নাশতা সেরে আবার রওনা হলাম আমরা। দুপুর দুটো নাগাদ পৌঁছে গেলাম বিশাল বিস্তৃত এক পাহাড়ী প্রাচীরের কাছে। সম্ভবত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে তৈরি হয়েছে প্রাচীরটা। দেড় থেকে দু'হাজার ফুট উঁচু। প্রাচীরের গোড়ায় থামলাম আমরা।

'এবার শুরু হবে আমাদের আসল যাত্রা,' পাল্‌কি থেকে নেমে বললো আয়শা। 'ওদের এখানে রেখে পায়ে হেঁটে এগোবো আমরা।' তারপর বিলালির দিকে ফিরে যোগ করলো, 'তুমি আর ঐ দাসগুলো থাকবে এখানে। অপেক্ষা করবে আমাদের জন্যে। আগামীকাল দুপুর নাগাদ ফিরে আসবো আমরা—যদি না-ও ফিরি অপেক্ষা করবে।'

বিনীতি ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালো বিলালি, এবং জানালো, তাঁর মহান আদেশ পালিত হবে।

'আর এই লোকটা, হলি,' জবের দিকে ইশারা করে বললো আয়শা, 'ও-ও এখানে থাক। এখন থেকে যে পথে আমরা এগোবো, প্রচণ্ড মানসিক শক্তি আর সাহস না থাকলে খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে।'

জবকে আমি অনুবাদ করে শোনালাম কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে কাঁদো কাঁদো হয়ে উঠলো ওর মুখ। অনুনয় করে বললো, আমরা যেন দয়া করে ওকে ফেলে রেখে না যাই। ইতিমধ্যে যা দেখেছে তার চেয়ে ভীতিজনক কিছু দেখতে হবে তা ওর বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া এই বোবা-কালাদের কাছে রেখে গেলে ওকে হয়তো 'গরম-পাত্র' করে খেয়েই ফেলবে।

আয়শাকে আবার অনুবাদ করে শোনালাম কথাগুলো।

কাঁধ ঝাঁকালো সে। 'ঠিক আছে, আমার কি? আসতে চাইলে আসুক। প্রদীপ আর ওটা বইতে হতো তোমাদের। এখন ও-ই পারবে।' প্রায় ষোল ফুট লম্বা সরু একটা তক্তা দেখালো আয়শা। পাল্‌কির ওপরে বাঁধা ছিলো, একটু আগে খুলে রেখেছে বাহকরা।

তক্তাটা উঁচু করে দেখলাম, অদ্ভুত হালকা, কিন্তু খুবই মজবুত। জবকে দেয়া হলো ওটা বইবার জন্যে, একটা প্রদীপও দেয়া হলো। অন্য প্রদীপটা দড়ি বেঁধে পিঠে ঝুলিয়ে নিলাম আমি, তেলের পাত্রটাও রইলো আমার কাঁধে। সিও নিলো খাবার-দাবার আর ছাগলের চামড়ার এক থলে ভর্তি পানি।

বিলালিকে ডাকলো আয়শা। শ'খানেক গজ দূরে একটা ম্যাগনোলিয়া ঝোপ দেখিয়ে বললো ছয় বেহারাকে নিয়ে সেটার পেছনে গিয়ে বসতে। মাথা নুইয়ে রওনা হলো তারা। বিলালি যাওয়ার আগে আমার হাত দুটো ধরে একটু নেড়ে দিলো। এক

BanglaBook.org

মিনিটেরও কম সময়ের ভেতর ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল লোকগুলো।

আমরা তৈরি কিনা একবার জিজ্ঞেস করে ঘুরে দাঁড়ালো আয়শা। খাড়া উঠে যাওয়া চূড়ার দিকে তার দৃষ্টি।

'নিশ্চয়ই এই খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠতে যাচ্ছি না আমরা, কি বলো, লিও?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

আধা সম্মোহিত, আধা সচেতন অবস্থায় কাঁধ ঝাঁকালো লিও? পরমুহূর্তে চলতে শুরু করলো আয়শা, এবং ঐ খাড়া পাহাড় বেয়েই। উপায়ান্তর না দেখে এগোলাম আমরাও।

সত্যি চমৎকার এক দৃশ্য, কি অনায়াস দক্ষতায় এক পাথর থেকে অন্য পাথরে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে আয়শা। পা টিপে টিপে সাবধানে পেরিয়ে যাচ্ছে কিনারগুলো। নিচে থেকে যা ভেবেছিলাম তত কঠিন নয় পাথরের ধাপ টপকে উঠে যাওয়া। আয়শার মতো অনায়াসে না হলেও মোটামুটি স্বচ্ছন্দেই উঠছি আমরা। সমস্যা যা হচ্ছে তা বেচারা জবের, ষোলফুটি তক্তাটা নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে। ভাগ্য ভালো, ভারি নয় ওটা। ভারি হলে ওটা নিয়ে অনেক আগেই উল্টে পড়তো জব।

প্রায় পঞ্চাশ ফুট মতো ওঠার পর শিলাস্তরের কিনারায় সরু কার্নিসের মতো একটা জায়গায় পৌঁছুলাম আমরা। জায়গাটা এত সরু যে কোনোমতে পা রেখে দাঁড়ানো যায়। পাথরে পিঠ ঠেকিয়ে পা টিপে টিপে পাশে হেঁটে এগোলো আয়শা। তার ভঙ্গি অনুকরণ করে আমরাও এগোলাম। প্রথমে খুব সরু থাকলেও যত এগোতে লাগলাম ততই চওড়া হতে লাগলো কার্নিস। পঞ্চাশ ষাট গজ মতো যাওয়ার পর হঠাৎ একটা গুহার ভেতর গিয়ে শেষ হয়ে গেল কার্নিস। প্রথম দর্শনেই বুঝলাম গুহাটা প্রাকৃতিক।

গুহার মুখে থেমে দাঁড়ালো আয়শা। প্রদীপ দুটো জ্বালতে বললো। আমারটা জ্বেলে তার হাতে দিলাম, আর অন্যটা জবের কাছ থেকে নিয়ে জ্বেলে রাখলাম আমার কাছে।

প্রদীপ হাতে অন্ধকার গুহার ভেতর ঢুকলো আয়শা। অত্যন্ত সতর্কতার সাথে পেছন পেছন এগোলাম আমরা। হাতে আলো থাকলেও গুহার মেঝেটা এমন উঁচু নিচু যে একটু অসাবধান হলেই হোঁচট খেতে হবে।

পাক্কা বিশ মিনিট সময় লাগলো গুহার শেষ মাথায় পৌঁছুতে। অনেকবার বাঁক নিয়ে, চড়াই উৎরাই পেরিয়ে যে পথটুকু অতিক্রম করলাম সবায় তা কমপক্ষে সিকি মাইল হবে। এপাশেও একটা মুখ। মুখের কাছাকাছি আসতেই দমকা বাতাসে নিবে গেল প্রদীপ দুটো।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। গুহার বাইরে আলো প্রায় নেই বললেই চলে। সুতরাং প্রদীপ

BanglaBook.org

নিবে যেতেই অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেলাম আমরা। অস্পষ্ট ভাবে একে অপরের অবয়ব শুধু দেখতে পাচ্ছি। আয়শা তার পেছন পেছন যেতে বললো আমাদের। পা টিপে টিপে, মেঝের উঁচু নিচু ঠাহর করে এগোলাম আমরা। গুহার বাইরে বেরিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম তা এক কথায় অপূর্ব এবং ভীষণ। আমাদের সামনে বিশাল এক গহ্বর। তার এখানে ওখানে ফাটল, জায়গায় জায়গায় উঁচু হয়ে আছে বিরাট বিরাট পাথর। হাজার হাজার বছর আগে ভয়াবহ কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে হয়তো সৃষ্টি হয়েছিলো এই গহ্বর। আমাদের থেকে কত নিচে যে মাটি তা বোঝার কোনো উপায় নেই, অন্ধকারের জন্যে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। গহ্বরের চারদিকের দেয়াল উঁচু হয়ে উঠে গেছে অনেক দূর পর্যন্ত। দেড়-দু'হাজার ফুট হবে। তার ভেতর দিয়ে আকাশ দেখা যায় কি যায় না। সবচেয়ে আশ্চর্য যে ব্যাপারটা তা হলো, গুহামুখের সোজাসুজি সরু একটা সেতু মতো আড়াআড়ি ভাবে এগিয়ে গেছে গহ্বরের ও প্রান্তের দিকে। সেতু না বলে বাঁধ বলাই বোধহয় ভালো। নিরেট পাথর উঁচু হয়ে এসেছে গহ্বরের তলা থেকে। দু'পাশে গভীর খাদ।

'এর ওপর দিয়ে যেতে হবে আমাদের,' বললো আয়শা। 'সাবধান, মাথা ঘুরে বা পা ফসকে পড়ে যেও না যেন; সত্যি কথা বলতে কি, এ গহ্বরের তল নেই কোনো।'

আর কিছু বললো না সে। ভয় পাওয়ারও কোনো সুযোগ দিলো না আমাদের, হাঁটতে শুরু করলো সেই সরু পাথরের ওপর দিয়ে। অগত্যা আমরাও এগোলাম। পেছন পেছন।

কি সুন্দর সাবলীল ভঙ্গিতে হেঁটে চলেছে সে। যে দমকা বাতাসে প্রদীপ নিবে গিয়েছিলো তেমন ঝড়ো বাতাস বইছে এখনো, কিন্তু বিন্দুমাত্র বিব্রত করতে পারছে না আয়শাকে। তীব্র বাতাসের উল্টো দিকে শরীর হেলিয়ে দিয়ে নির্ভয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে।

এদিকে আমরা, বাতাসের ঝাপটা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বসে গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছি। তবু ঠিকমতো তাল রাখতে পারছি না। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি উড়িয়ে নিয়ে গেল। আয়শার পেছনেই আমি, তারপর ভেক্সা হাতে জব, একেবারে পেছনে লিও। যত এগোচ্ছি ততই সরু হচ্ছে ভয়ানক সেতুটা।

মাত্র বিশ পা এগোতেই বেশ কয়েক মিনিট লেগে গেল। তারপর আচমকা আরো তীব্র হয়ে উঠলো বাতাস, যেন ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলবে প্রকাণ্ড গহ্বরটা। তাল রাখার জন্যে আরেকটু হেলে পড়লো আয়শা। হঠাৎ আমি দেখলাম, বাতাস ঢুকে ফুলে উঠলো তার আলখাল্লাটা, তারপরই সেটা আয়শার দেহ ছেড়ে উড়ে চলে গেল হাওয়ার মুখে। আহত

BanglaBook.org

পাখির মতো ঝট্‌পট্‌ করতে করতে ক্রমশ নেমে যেতে লাগলো অন্তহীন গহ্বরের ভেতর। পাথর আঁকড়ে ধরে চারপাশে তাকালাম আমি। সরু সেতুটা, বাতাসের ঝাপটায় না আমাদের ওজনে জানি না, কাঁপছে একটু একটু। শিসের মতো শব্দ তুলে বইছে বাতাস।

'এসো, এসো,' আমাকে থেমে পড়তে দেখে চিৎকার করে উঠলো আয়শা। এখন তার পরনে কেবল শাদা ঝুল পোশাকটা, আধো আলো আধো অন্ধকারে অশরীরী আত্মার মতো লাগছে দেখতে। 'তাড়াতাড়ি এসো, নইলে বাতাস আরো বাড়লে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।'

আবার এগোতে শুরু করলাম আমরা। জন্তুর মতো চার হাত পায়ে ভর দিয়ে কোনো রকমে ইঞ্চি ইঞ্চি করে সামনে যাচ্ছি। চোখ মুখ কুঁচকে তীব্র বাতাসের ঝাপটা সহ্য করছি। আরো কয়েক মিনিট এগোলাম এভাবে। সেতুর প্রান্তে পৌঁছে গেছি। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম, তক্তাটা কেন আনা হয়েছে।

প্রাকৃতিক সেতু বা বাঁধটা যেখানে শেষ হয়েছে তার ওপাশে অনেক নিচ থেকে উঠে এসেছে একটা চূড়া। অনেকটা চোঙের মতো দেখতে। এই চূড়ার ওপর বিরাট একটা পাথর বসানো। অন্তত চল্লিশ ফুট হবে প্রস্থে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় চূড়াটাই হঠাৎ করে ভোঁতা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। কিন্তু আসলে, ওপরের পাথরটা আলগা। এমন মনে হওয়ার কারণ, এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি হাওয়ার ঝাপটায় একটু পর পরই সামান্য নড়ে উঠছে ওটা। এরকম আলগা একটা পাথর কি করে ওখানে এলো আর কি করে ওটা এমন সুন্দর ভারসাম্য বজায় রেখে বসলো কিছুতেই ভেবে পেলাম না। বিশাল চাঙড়টার এদিকের প্রান্ত আর সেতুর মাঝে এগারো কি বারো ফুটের মতো একটা ফাঁক। এই ফাঁকটুকু পার হওয়ার জন্যেই যে তক্তাটা আনা হয়েছে একবার দেখার সঙ্গে সঙ্গেই তা বুঝতে পারলাম।

'এবার একটু অপেক্ষা করতে হবে আমাদের,' বললো আয়শা। 'একটু পরেই আলো পাওয়া যাবে, তারপর আবার রওনা হবো।'

একটু আশ্চর্য হলাম আমি। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখন আবার আলো আসবে কোত্থেকে এই ভয়ানক জায়গায়? বসে বসে ভাবছি একথা, এমন সময় হঠাৎ দূরে অনেক নিচে পাহাড়ের গায়ে একটা ফোকরের ভেতর দিয়ে ছুটে এলো অস্তায়মান সূর্যের এক ঝলক সোনালি রশ্মি। মুহূর্তে আলোকিত হয়ে উঠলো সেতুর প্রান্ত আর ওপাশে পাথরের চাঁইটা।

'তাড়াতাড়ি!' বললো আয়শা, 'তক্তাটা—আলো থাকতে থাকতেই পার হয়ে যেতে

BanglaBook.org

হবে; এক্ষুণি অন্ধকার হয়ে যাবে আবার।'

'ও, স্যার!' আর্তনাদ করে উঠলো জব। 'নিশ্চয়ই এই ঠুনকো জিনিসের ওপর দিয়ে এই ভয়ানক খাদ পেরোনোর কথা বলেনি ও!'

'ঠিক তার উল্টোটা, জব,' বললাম আমি। 'এই ভয়ানক খাদটা পেরোতে হবে আমাদের, এবং এই ঠুনকো তক্তার ওপর দিয়েই।' তক্তাটা এগিয়ে দিতে ইশারা করলাম ওকে।

ও যতটা ভয় পেয়েছে আমি যে তার চেয়ে কম পেয়েছি তা মোটেই নয়। তবু নির্বিকার মুখে তক্তাটা ঠেলে দিলাম আয়শার দিকে। অনায়াস দক্ষতার সাথে সেও ঠেলে দিলো সেটা। ভাবলাম, এখানেই শেষ আমাদের এই অভিযান, এক্ষুণি গভীর খাদের অতলে তলিয়ে যাবে তক্তাটা। কিন্তু না, এক সেকেণ্ড পরেই অবাক হয়ে দেখলাম, ওপাশের চাঙড়টার ওপর গিয়ে বসেছে তক্তার ওমাথা।

'শেষ যেবার এসেছিলাম তারপর অনেক বছর কেটে গেছে,' বললো আয়শা। 'জানি না এখনো পাথরটার ভারসাম্য ঠিক আছে কি না। সুতরাং আমি আগে যাবো।' আর কিছু না বলে হালকা পায়ে তক্তার ওপর দিয়ে হেঁটে গেল আয়শা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই দেখলাম, ওপাশের টলমলে পাথরটার ওপর দাঁড়িয়ে আছে সে।

'হ্যাঁ, ঠিকই আছে,' চিৎকার করলো সে। 'এক এক করে চলে এসো তোমরা। তক্তাটা ভালো মতো ধরে একটু একটু করে এগোবে। তাড়াতাড়ি, হলি। এক্ষুণি আলো চলে যাবে।' দু'জনের ওজনে পাথরের ভারসাম্য যাতে নষ্ট না হয় সেজন্যে ওপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

হাঁটুতে ভর দিয়ে কসরত শুরু করলাম, কিন্তু এক ইঞ্চি এগোতে পারলাম না। সত্যি কথা বলতে কি, এমন আতঙ্কিত জীবনে আর কখনো হইনি আমি।

'কি ব্যাপার, হলি, ভয় পেয়েছো?' অস্থির অথচ কৌতুক মেশানো স্বরে চিৎকার করলো আয়শা। 'তাহলে পিছিয়ে যাও তুমি, ক্যালিক্রেটিসকে আসতে দাও।'

এই কথার পর আর ইতস্তত করা যায় না। এমন একজন মেয়ে মানুষের উপহাসের পাত্র হওয়ার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো। দাঁতে দাঁত চেপে, দুনিয়ার আর সবকিছু ভুলে এগোলাম তক্তার ওপর দিয়ে। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগিয়ে যাচ্ছি। সমস্ত মনোযোগ তক্তা আর তার দু'কিনারের দিকে। আমার ওজনে একটু বেঁকে গেছে তক্তা। হঠাৎ একবার চোখ পড়লো নিচের অন্তহীন গহ্বরের দিকে। ধড়াস করে উঠলো বুকের ভেতর। এলিয়ে আসতে চাইলো শরীর। এমন সময় মনে পড়ে গেল আয়শার বিদ্রূপ মাখা কণ্ঠস্বর। কোথেকে যে শক্তি পেলাম জানি না, পরবর্তী তিন সেকেণ্ডের মাথায়

তক্তার ওপ্রান্তে পৌঁছুলাম আমি।

এবার লিওর পালা। চেহারায় একটু সন্দিগ্ধ ভাব থাকলেও দড়াবাজ সার্কাসওয়ালার মতো অনায়াস ভঙ্গিতে হেঁটে চলে এলো ও এপাশে। আয়শা এগিয়ে গিয়ে ধরলো ওর হাত। তারপর বললো, 'চমৎকার, প্রিয়তম—প্রাচীন গ্রীকদের মতোই সাহস দেখিয়েছো!'

জব কেবল রয়েছে এখন ওপাশে। কোনো রকমে গুঁড়ি মেরে তক্তার ওপর উঠলো ও। তারপরই হাউমাউ করে উঠলো, 'আমি পারবো না, স্যার! পড়ে যাবো, পড়ে যাবো!'

'পারতেই হবে, জব,' দৃঢ় গলায় বললাম আমি। 'পারতেই হবে। খুব সোজা কাজ, মাছি ধরার মতো সোজা।' আমার ধারণা দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটা মাছি ধরা, তবু কেন যে বললাম একথা জানি না। তবে আয়শার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলতে পেরে খুব শান্তি পেলাম মনে মনে।

'পারবো না, স্যার, পারবো না!'

'আসলে আসুক, না হলে মরুক ও! আলো চলে যাচ্ছে, এক্ষুণি অন্ধকার হয়ে যাবে!' বললো আয়শা।

যে ফোকর দিয়ে আলো আসছে, সেটার দিকে তাকালাম আমি। ঠিকই বলেছে আয়শা। ইতিমধ্যে লাল থালার মতো সূর্যটার অর্ধেক চলে গেছে ফোকরের আড়ালে।

'জব,' চিৎকার করলাম আমি। 'ওখানে বসে থাকলে মরা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না তোমার। তাড়াতাড়ি এসো, আলো চলে যাচ্ছে!'

'এসো, জব!' গর্জে উঠলো লিও, 'সাহস আনো বুকে! যত কঠিন ভাবছো আসলে তত কঠিন নয় কাজটা। কত সহজে আমরা চলে এলাম, দেখলে না?'

এবার এগোতে শুরু করলো জব। অনবরত কাঁপা কাঁপা গলায় চিৎকার করছে 'মাগো, গেলাম গো,' আর একটু একটু করে এগোচ্ছে। ক্রমশ আলো কমে আসছে তবু পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, থর থর করে কাঁপছে বেচারা।

মাঝামাঝি জায়গায় এসে হঠাৎ ওর একটা হাঁটু চলে গেল তক্তার বাইরে। ভয়ানক ভাবে ঝাঁকুনি খেলো তক্তাটা। তীব্র একটা আর্তনাদ করে কিনারা আঁকড়ে ধরলো জব। তারপর বসে রইলো স্থির হয়ে। এই সময় সূর্যের শেষ রশ্মিটাও চলে গেল ফোকরের নিচে। আবার অন্ধকার নেমে এলো চারদিকে।

'চলো।' তাড়া লাগালো আয়শা।

'চলে এসো, জব, ঈশ্বরের দোহাই! না হলে তোমাকে ফেলেই চলে যেতে হবে

BanglaBook.org

আমাদের!' আবার চেঁচালাম আমি।

'ও, ঈশ্বর, দয়া করো, দয়া করো!' অন্ধকারের ভেতর থেকে ভেসে এলো জবের গলা। 'ওহ্, তক্তাটা পিছলে যাচ্ছে!' তারপর ভীষণ একটা ধুপধাপ আওয়াজ। জব বোধহয় গেল!

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ওর বাড়িয়ে দেয়া একটা হাত স্পর্শ করলো আমার হাত। খপ করে ধরে ফেলে টানলাম আমি। পরের মুহূর্তে আমার পাশে হুমড়ি খাওয়া অবস্থায় দেখলাম জবকে। কিন্তু তক্তাটা! শক্ত কিছু পিছলে যাওয়ার খসখসে আওয়াজ শুনে বুঝলাম চলে গেল ওটা। কয়েক সেকেণ্ড পর নিচে থেকে ভেসে এলো ঠক করে একটা আওয়াজ।

'হায় হায়! আমরা ফিরবো কি করে!' কোনো মতে উচ্চারণ করলাম আমি।

'জানি না,' জবাব দিলো লিও! 'ভাগ্য ভালো আমরা এপাশে আসার আগেই ওটা পড়ে যায়নি।'

আমার কাছে এগিয়ে এলো আয়শা। 'আমার হাত ধরে এসো।'

পঁচিশ

আয়শার কথা মতো তার হাত ধরলাম আমি। অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কম্পিত বুকে শুধু অনুভব করছি, আমার হাত ধরে টলমলে পাথরটার কিনারে নিয়ে গেল সে। তার কথা মতো পা নামিয়ে দিলাম নিচে। কিন্তু কিছু ঠেকলো না পায়ে।

'পড়ে যাবো তো!' ঢোক গিলে বললাম।

'না, হলি,' বললো আয়শা। 'দু'পা-ই নামিয়ে দাও, বিশ্বাস রাখো আমার ওপর, কিছু হবে না। পড়েই যদি যাবে, তাহলে ওকাজ করতে বলবো কেন তোমাকে? যাও নেমে যাও!'

কোনো উপায়ান্তর না দেখে তা-ই করলাম। শক্ত পাথরের ওপর দিয়ে দু'তিন পা গড়িয়ে যাওয়ার পর আর কোনো অবলম্বন রইলো না আমার। ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হলো, অতল কোনো খাদে পড়ে যাচ্ছি। কিন্তু না, মুহূর্ত পরেই শক্ত পাথরের সাথে পা ঠেকলো আমার। একটুও ব্যথা পেলাম না। স্বাভাবিক ভাবেই দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করে সম্ভব হলো ব্যাপারটা ভাবছি, এমন সময় লিও-ও একই ভঙ্গিতে এসে দাঁড়ালো আমার পাশে।

BanglaBook.org

'কি খবর, বুড়ো!' উৎফুল্ল গলায় বললো ও, 'তুমি আছো এখানে? ব্যাপারটা বেশ জমে উঠেছে, তাই না?'

ঠিক সেই সময়—ভয়ঙ্কর এক আর্তনাদ করে হাজির হলো জব, আমাদের ঠিক ওপরে! ওর সঙ্গে সঙ্গে আমি আর লিও—ও হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেলাম মাটিতে। আমরা উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে আয়শাও এসে পড়লো। প্রদীপ দুটো জ্বালতে বললো সে। ভাগ্য ভালো এখনো অক্ষত আছে ওদুটো। তেলের পাত্রটাও। গুহার মুখে এসে নিবে যেতেই আবার ওগুলো পিঠে ঝুলিয়ে নিয়েছিলাম আমরা।

পকেট থেকে দেশলাই বের করে প্রদীপ দুটো জ্বাললাম আমি। আলো জ্বলে উঠতেই অদ্ভুত একটা দৃশ্য উন্মোচিত হলো আমাদের সামনে। পাথরের একটা কুঠুরিতে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। বর্গাকৃতির, লম্বায় চওড়ায় ফুট দশেক করে হবে। সেই টলমলে পাথরটা ছাদের কাজ করছে। কুঠুরিটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নয়। পেছন দিকে কিছুটা অংশ মানুষের হাতে খোদাই করা।

'যাক!' বললো আয়শা। 'নিরাপদে আসতে পেরেছি শেষ পর্যন্ত। আমি তো ভয় পাচ্ছিলাম, তোমাদের ওজনে খসেই না পড়ে পাথরটা। একটু থেমে জবের দিকে ইশারা করলো সে, 'তোমাদের ঐ উজবুকটা—শূকর ছানা, ঠিকই নাম দিয়েছে ওরা, শুয়োরের মতোই হাঁদা—ফেলে দিয়েছে তক্তাটা। ফেরার পথে খাদ পেরোনো সহজ হবে না। দেখি, ভেবে চিন্তে কিছু একটা বুদ্ধি বের করতে হবে। এখন একটু বিশ্রাম নিয়ে নাও তোমরা। ইচ্ছে হলে ঘুরে ফিরে দেখতে পারো জায়গাটা। এটা কি জানো?'

'না, জবাব দিলাম আমি।

'বললে বিশ্বাস করবে, হলি, এক সময় নিঃসঙ্গ এক লোক বাস করতো এখানে? বারো দিনে একবার সে বেরোতো এখান থেকে। খাবার দানি আর তেল নিয়ে আসতো। লোকেরা অর্ঘ্য হিসেবে নিবেদন করতো। সুড়ঙ্গের মুখে রেখে যেতো সে-সব।'

অবাক চোখে তাকালাম আমরা তার দিকে।

'লোকটা তার নাম দিয়েছিলো নুট,' বলে চললো সে। 'একই সাথে সে ছিলো সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী, এবং দার্শনিক। প্রকৃতির গোপন রহস্যগুলোর কার্যকারণ সূত্র বেশির ভাগই সে আয়ত্ত করেছিলো। তোমাদের যে আগুন দেখাবো, ক্যালিক্রেটিসকে যাতে স্নান করাবো, সেই আগুন তারই আবিষ্কার। কিন্তু সে স্নান করেনি ওতে। তোমার মতো, হলি, এই নুট লোকটাও অনন্ত জীবনের মাঝে কোনো আনন্দ খুঁজে পায়নি। সে বলতো, "মৃত্যুবরণ করবে বলেই মানুষের জন্ম। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে

BanglaBook.org

বাধাগ্রস্ত করার অর্থ হবে অশুভকে ডেকে আনা।" আর তাই সে তার গোপন কথা কারো কাছে প্রকাশ না করে এখানে এসে বাস করতে থাকে। তারপর আমি যখন প্রথম এলাম এদেশে—কি করে এসেছিলাম জানো ক্যালিক্রেটিস? এখন না, অন্য এক সময় বলবো সেই অদ্ভুত কাহিনী। যা বলছিলাম, তারপর আমি যখন এলাম এদেশে, শুনলাম এই জ্ঞানী দার্শনিকের কথা। তাকে খাবার দিতে আসতো যারা তাদের সঙ্গে একদিন চলে এলাম সুড়ঙ্গের মুখে। ওরা চলে যাবার পরও আমি রয়ে গেলাম সেখানে। তারপর নুট যখন এলো সেসব সংগ্রহ করতে, ভুলিয়ে-ভালিয়ে তার সাথে চলে এলাম এখানে। সেদিন ঐ খাদ পেরোতে কি ভয়ই না পেয়েছিলাম। মনে পড়লে এখন হাসি পায়। আমার সৌন্দর্য, চাটুকারিতা এবং মোহিনী শক্তির সবটাই প্রয়োগ করে প্রলুব্ধ করলাম তাকে। শেষ পর্যন্ত সে দেখাতে বাধ্য হলো সেই রহস্যময় আগুন। অবশ্য একথাও জানিয়ে দিলো, কিছুতেই আমাকে ওতে স্নান করতে দেবে না। প্রয়োজন হলে হত্যা করবে আমাকে, তবু না। সে মুহূর্তে আমি মেনে নিয়েছিলাম তার কথা। কারণ দেখতে পাচ্ছিলাম, লোকটা বৃদ্ধ হয়েছে, আর বেশি দিন বাঁচবে না। ও মরলেই আবার আমি আসবো এখানে, এই সংকল্প করে, পৃথিবী, প্রকৃতি এবং জীবন সম্পর্কে আরো যে সব জ্ঞান সে অর্জন করেছিলো তা জেনে নিয়ে ফিরে গেলাম কোর-এ।

'এর ক'দিন পরই তোমার সাথে আমার দেখা হয়, প্রিয়তম ক্যালিক্রেটিস। মিসরীয় সুন্দরী আমেনার্তাসকে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে চলে এসেছিলে এখানে। সেই প্রথম এবং সেই শেষ—ভালোবাসা কাকে বলে জানলাম আমি। সঙ্গে সঙ্গে সংকল্প করলাম, তোমাকে নিয়ে আসবো এখানে এবং প্রাণের উপহার গ্রহণ করবো দু'জনে একসাথে। অনেক চেষ্টা করলাম মিসরীয় মেয়েলোকটাকে রেখে আসার, কিন্তু পারা গেল না। শেষ পর্যন্ত ওকে সহ তোমাকে নিয়ে এলাম এখানে। দেখলাম বৃদ্ধ নুট পড়ে আছে মাটিতে, কিছুক্ষণ আগে মারা গেছে।

'নিশ্চিন্ত মনে তোমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলাম সেখানে। তারপর আমার সমস্ত সাহস এক জায়গায় করে ঢুকে পড়লাম সেই অসীম জীবনের অগ্নিশিখার ভেতর। যখন বেরোলাম তখন হাজার গুণে বেড়ে গেছে আমার সৌন্দর্য। আর জীবন? দেখতেই পাচ্ছো, তারপর দু'হাজার বছরেরও বেশি কেটে গেছে, কিন্তু এক বিন্দু ম্লান হয়নি আমার রূপ-যৌবন।

'তারপর আমি দু'হাত বাড়িয়ে তোমাকে আহ্বান করলাম, ক্যালিক্রেটিস, অনন্ত যৌবনা বধূকে আলিঙ্গন করতে বললাম। কিন্তু, নিশ্চয়ই আমার সৌন্দর্য তোমাকে অন্ধ করে দিয়েছিলো, আমার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তুমি জড়িয়ে ধরলে আমেনার্তাসকে।

BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে কি যে হলো আমার, ঈর্ষা এবং ক্রোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আমার বুকের ভেতর। তোমার হাত থেকে তোমারই বর্শা কেড়ে নিয়ে বিঁধিয়ে দিলাম তোমার বুকে। একবার মাত্র আর্তনাদ করে মারা গেলে তুমি। তখনো জানতে পারিনি, ঐ আগুনে স্নান করে আসার ফলে চোখের চাউনি এবং ইচ্ছাশক্তি দিয়েই হত্যা করার ক্ষমতা অর্জন করেছি আমি।*

'তারপর, আহ্! তোমার মৃত্যুর পর কি কাঁদাটাই না কাঁদলাম –আমি বেঁচে আছি, আর তুমি মরে গেছ, কি করে যে সেদিন সহ্য করেছিলাম সে বেদনা, জানি না। তারপর সেই মিসরীয় মেয়েমানুষটা, তার দেবতাদের দোহাই দিয়ে অভিশাপ দিলো আমাকে। ওসিরিস, আইসিস, নেপথিস, অ্যানুবিস, বিড়ালমুখো মেখেত–সব দেবতার নাম করে জঘন্য ভাষায় শাপশাপান্ত করতে লাগলো। প্রতিহিংসায় কেমন কালো হয়ে উঠেছিলো তার মুখ, যদি দেখতে ! তবে হ্যাঁ, সে আমাকে আঘাত করার কোনো চেষ্টা করেনি, আমিও না। দুজনেরই শোক কিছুটা প্রশমিত হলে, দু'জনে ধরাধরি করে নিয়ে গেলাম তোমার মৃতদেহ। কোর–এ পৌঁছে প্রথম কাজ যেটা করলাম, মিসরীয়টাকে জলা পার করে পাঠিয়ে দিলাম সাগর পাড়ে। ওখান থেকে পারলে দেশে ফিরে যাক, নয়তো মরুক, কিছু এসে যায় না আমার।

'এই হলো কাহিনী, প্রিয়তম, কোনো কিছুই লুকোইনি তোমার কাছে, যা যা ঘটেছিলো সব বললাম। এখন সেই অনন্ত প্রাণের উৎসের কাছে যাবো আমরা, তার আগে বলো, ক্যালিক্রেটিস, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো? এখন তুমি অন্তর থেকে ভালোবাসতে পারবে আমাকে? অনেক পাপ করেছি আমি, তোমাকে হত্যা করেছি, মাত্র দুদিন আগে সেই মেয়েটাকে হত্যা করেছি। কিন্তু কেন, ক্যালিক্রেটিস? আমার অপরাধটাই শুধু দেখবে? কেন করেছি তা দেখবে না? তোমাকে ভালোবাসতে গিয়েই এ পাপ করতে হয়েছে আমাকে। মিসরীয় আমেনার্তাসকে নিয়ে দুনিয়ার যেখানে খুশি

× ক্যালিক্রেটিসের মৃত্যু সম্পর্কে পোড়ামাটির ফলকে লেখা আমেনার্তাসের ভাষ্য আর আয়শার বর্ণনার পার্থক্য লক্ষণীয়। আমেনার্তাস বলছে, 'জাদুর প্রভাবে হত্যা করে তাকে।' কার বক্তব্য যে ঠিক, আমরা যাচাই করার সুযোগ পাইনি। তবে ক্যালিক্রেটিসের মৃতদেহের বুকে গভীর একটা ক্ষতচিহ্ন দেখেছিলাম আমরা, ওটা যদি মৃত্যুর পরে করা হয়ে থাকে তাহলে বলা যায় আয়শার কথাই ঠিক। আরেকটা কথা, 'সে' আর আমেনার্তাস, দুই নারীতে মিলে ক্যালিক্রেটিসের মৃতদেহ কিভাবে খাদের ওপাশে নিয়েছিলো সে রহস্যের সমাধান আমরা করতে পারিনি। হয়তো সেতু আর টলমলে পাথরের মাঝের ফাঁকটা সে সময় এত চওড়া ছিলো না।

–এল. এইচ. এইচ.।

যেতে, এখানে কেন এসেছিলে?

'ক্যালিক্রেটিস, ও ক্যালিক্রেটিস, বলো, ক্ষমা করেছো আমাকে? সারা জীবনে যে পাপ আমি করেছি, তা থেকে পরিত্রাণ পাবার একটাই মাত্র উপায়, তোমার প্রেম, ক্যালিক্রেটিস, একমাত্র তোমার প্রেমই এই পাপের গহ্বর থেকে উদ্ধার করতে পারে আমাকে।'

থামলো সে। দু'চোখে টলটল করছে অশ্রু, এক্ষুণি নেমে আসবে বিশাল দুটো ফোঁটা হয়ে। পরিপূর্ণ অথচ অতি সাধারণ একটা নারীর মতো লাগছে এখন আয়শাকে।

তাড়াতাড়ি লিও গিয়ে ধরলো ওকে। তারপর ওর চোখে চোখ রেখে বললো, 'আয়শা, সত্যিই আমি তোমাকে অন্তর থেকে ভালোবাসি। আর উস্তেনের মৃত্যুর ব্যাপারে, মানুষের পক্ষে যতদূর সম্ভব ততদূর ক্ষমা করেছি তোমাকে। বাকিগুলোর ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। শুধু এটুকু জানি, আমি তোমাকে ভালোবাসি, পৃথিবীর কোনো পুরুষ কোনো নারীকে এত ভালোবাসেনি।'

'এবার দেখ তাহলে,' গর্বের সঙ্গে বললো আয়শা। লিওর একটা হাত নিজের মাথায় রেখে হাঁটু গেড়ে বসলো মাটিতে। 'দেখ, আত্মনিবেদনের প্রতীক হিসেবে আমি হাঁটু গেড়ে বসে মাথা নোয়াচ্ছি আমার প্রভুর সামনে।' তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চুমু খেলো ওর ঠোঁটে। 'দেখ, স্ত্রীর মতো আমি চুমু দিচ্ছি আমার প্রভুকে।'

'এই পবিত্র মুহূর্তে প্রতিজ্ঞা করছি, আর কখনো কোনো পাপ আমি করবো না, সব সময় শুভ-সুন্দরের লালন করবো। প্রতিজ্ঞা করছি, কর্তব্যের সরল পথে সব সময় চলবো আমি। প্রতিজ্ঞা করছি কখনো উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবো না, এবং জ্ঞান ও সত্যই হবে আমার পথের দিশারী। আমি আরো প্রতিজ্ঞা করছি, সারা জীবন আমি তোমাকে ভালোবাসবো, ক্যালিক্রেটিস। প্রতিজ্ঞা করছি—না আর প্রতিজ্ঞা নয়, কোন্ প্রতিজ্ঞাটা বাকি রইলো? শুধু এটুকু জেনে রাখো, আয়শা কখনো মিথ্যা বলে না।'

'আমার প্রতিজ্ঞা শুনলে, হলি, তুমি সাক্ষী, এই শপথের মধ্যে দিয়েই আমার স্বামীর সাথে, আমার ক্যালিক্রেটিসের সাথে বিয়ে হলো আমার। আমার কুমারী জীবন শেষ। ফলাফল যা-ই হোক, ঝড় উঠুক, আলো আসুক, আলো হোক, মন্দ হোক, জীবন আসুক, মৃত্যু আসুক, কিছুই আর করার নেই। কিছুতেই আর ছিন্ন হবে না এ বন্ধন।

'তাহলে চলো এখন,' একটা প্রদীপ তুলে নিয়ে এগোলো সে। আমরাও চললাম পেছন পেছন। কুঠুরির শেষ প্রান্তে পৌঁছে থামলো আয়শা। দুই দেয়াল যেখানে মিশেছে সেখানে সরু এক প্রস্থ সিঁড়ি। নামতে শুরু করলো সে। আমরাও। প্রায় পনেরো ষোলো ধাপ নামার পর দেখলাম বিশাল এক পাথুরে ঢালে গিয়ে শেষ হয়েছে ধাপগুলো। ঢালটা

প্রথমে নিচের দিকে নেমে আবার ওপরের দিকে উঠে এসেছে। অনেকটা ওল্টানো একটা চোঙের মতো। বেশ খাড়া ঢাল, তবে অগম্য নয়। বাতি হাতে নেমে যেতে লাগলাম আমরা।

প্রায় আধ ঘন্টা লাগলো চোঙের সর্বনিম্ন বিন্দুতে পৌছাতে। এবার বোধহয় উল্টো দিকের ঢাল বেয়ে উঠতে হবে। কিন্তু না, আরো কয়েক পা যেতেই একটা সরু এবং নিচু পথ মতো দেখতে পেলাম। গুড়ি মেরে সেটার ভেতর ঢুকলো আয়শা। পেছন পেছন আমরাও। প্রায় গজ পঞ্চাশেক হামাগুড়ি দিয়ে যাওয়ার পর আচমকা প্রশস্ত হয়ে গেল সুড়ঙ্গটা। বিশাল একটা গুহায় আবিষ্কার করলাম নিজেদের। কোর-এর বিরাট বিরাট গুহাগুলো এর তুলনায় কিছুই নয়। কোনো দিকেই দেয়াল বা ছাদ দেখতে পাচ্ছি না। অর্থাৎ ওগুলো এতদূরে যে প্রদীপের আলো পৌছুচ্ছে না সে পর্যন্ত। ভারি বাতাস আর আমাদের পদশব্দের প্রতিধ্বনি শুনে বুঝতে পারছি, ফাঁকা জায়গা নয়, এটা গুহাই।

ভাবলাম এবার বোধহয় থামবে আয়শা। কিন্তু না, নিঃশব্দে এগিয়ে চললো সে। অবশেষে গুহার শেষ মাথায় পৌছুলাম আমরা। আরেকটা মুখ এখানে। সেটা পেরোতেই আগেরটার চেয়ে অনেক ছোট একটা গুহায় এসে পড়লাম। এখানেও থামলো না আয়শা। অবশেষে আরেকটা গুহামুখ নজরে পড়লো আমাদের। তার ওপাশে অস্পষ্ট একটা আলোর আভা।

আলোটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে, খেয়াল করলাম, স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেললো আয়শা। দ্রুতপায়ে এগিয়ে চললো সে। যেটাকে গুহামুখ মনে হয়েছিলো সেটা আসলে একটা সুড়ঙ্গ। এই সুড়ঙ্গের ভেতর দিয়ে যত এগিয়ে যাচ্ছি আলোটা ততই স্পষ্ট এবং শক্তিশালী হয়ে উঠছে, অন্ধকার রাতে বাতিঘর থেকে যেমন ছড়িয়ে পড়ে আলোকরশ্মি অনেকটা তেমন। শুধু তাই নয়, আলোর ঝলকানির সাথে সাথে ভেসে আসছে বজ্রগর্জনের মতো প্রাণকাঁপানো শব্দ। যত এগোচ্ছি শব্দও তত বাড়ছে।

সুড়ঙ্গ শেষ হতে আরেকটা গুহায় এসে পড়লাম আমরা। অনেক উঁচু এটার ছাদ। লম্বায় পঞ্চাশ ফুট মতো, চওড়ায় ত্রিশ ফুট। মিহি শাদা বালি দিয়ে ছাওয়া মেঝে। দেয়ালগুলো আশ্চর্যরকম মসৃণ। মৃদু গোলাপী আলোয় পূর্ণ গুহাটা। অবাক কাণ্ড, একটু আগের সেই উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি বা বাজ পড়ার মতো শব্দ—কিছুই এখন নেই। বিস্মিত চোখে খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি অদ্ভুত গোলাপী আলোর উৎস, এমন সময় হঠাৎ আবার শুরু হলো শব্দটা। প্রথমে যাঁতা ঘোরানোর মতো ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। ক্রমশ বাড়তে বাড়তে বজ্রগর্জনের মতো হয়ে উঠলো। সেই সাথে গুহার ওপ্রান্তে দেখা দিলো উজ্জ্বল আলোর একটা ঘূর্ণায়মান স্তম্ভ। প্রতি মুহূর্তে আরো উজ্জ্বল হচ্ছে। রঙধনুর

BanglaBook.org

মতো অনেক রং তাতে। শেষ পর্যন্ত বিদ্যুৎ চমকের মতো চোখ ধাঁধানো হয়ে উঠলো আলোটা।

কিছুক্ষণ, প্রায় চল্লিশ সেকেণ্ড হবে, রইলো আলো এবং শব্দ। তারপর ধীরে ধীরে কমতে লাগলো। কমতে কমতে একসময় মিলিয়ে গেল শব্দ, আগুনও। আবার আগের সেই গোলাপী আভায় ভরে উঠলো গুহা।

'কাছে যাও, কাছে যাও!' চিৎকার করে বললো আয়শা, উত্তেজনায় কাঁপছে তার গলা। 'দেখেছো, প্রাণের আগুন? এই বিশাল পৃথিবীর বক্ষ বিন্দুতে স্পন্দিত হয়ে চলেছে। এর থেকেই দুনিয়ার যাবতীয় জিনিস শক্তি পেয়েছে, প্রাণ পেয়েছে! কাছে যাও, আরো কাছে! তোমাদের নোংরা, দুর্বল শরীরগুলো পরিশুদ্ধ করে নাও।'

তার পেছন পেছন আমরা এগিয়ে গেলাম গুহার শেষ প্রান্তের দিকে। এই সময় আবার আচমকা শুরু হলো শব্দ সেই সাথে চোখ ধাঁধানো আলো। আমাদের ঠিক সামনে। সত্যি সত্যিই চোখ ধাঁধিয়ে গেল আমাদের, কানে তালা ধরে যাওয়ার অবস্থা। তাড়াতাড়ি দু'হাতে কান চেপে ধরে মুখ গুঁজে বসে পড়লাম আমরা তিনজন। আয়শা কেবল দাঁড়িয়ে রইলো, অচঞ্চল।

একটু পরেই আবার সব চুপচাপ। মাথা তুললাম আমরা।

'সময় হয়েছে, ক্যালিক্রেটিস,' বললো আয়শা। 'এবার তুমি স্নান করবে এই সুমহান অগ্নিশিখায়। সব কাপড়চোপড় খুলে ফেল। শরীরের প্রতিটি বিন্দুতে আগুনের পরশ লাগাতে হবে। নইলে সম্পূর্ণ হবে না তোমার পরিশুদ্ধি। আর হ্যাঁ, জোরে শ্বাস নিয়ে আগুন টেনে নেবে শরীরের ভেতরেও। বুঝেছো, ক্যালিক্রেটিস?'

'বুঝেছি, আয়শা,' জবাব দিলো লিও। 'কিন্তু—আমাকে ভীত, কাপুরুষ ভেবো না, আমার সন্দেহ হচ্ছে, আগুন যে আমাকে ধ্বংস করে ফেলবে না তার নিশ্চয়তা কি? নিজেকে তো হারাবোই, তোমাকেও হারাবো।'

চুপ করে কিছুক্ষণ ভাবলো আয়শা। তারপর বললো, 'হুঁ, সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। ঠিক আছে, আমি যদি প্রথমে গিয়ে দাঁড়াই ওর ভেতরে, এবং অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে আসি, তাহলে কি তোমার সন্দেহ দূর হবে?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিলো লিও। 'অবশ্য তোমার কথায় এমনিতেই আমি ঢুকতে পারি ওতে।'

'আমিও,' বলে উঠলাম আমি!

'কে! হলি!' হেসে উঠলো আয়শা। 'ভেবেছিলাম কিছুতেই তুমি দীর্ঘ জীবন চাইবে না, এখন আবার কি হলো?'

BanglaBook.org

'জানি না। আমি পরখ করতে চাই তোমার এই অনন্ত প্রাণের শিখা। তারপর যদি দীর্ঘজীবী হই তো হবো, না হলেও কিছু এসে যায় না।'

'বেশ, তাহলে তৈরি হও, প্রথমে আমি, তারপর তোমরা।'

ছাব্বিশ

আমি, লিও, আর জব গায়ে গায়ে সেঁটে দাড়িয়ে আছি। আয়শা সম্ভবত মানসিক প্রস্তুতি নিচ্ছে। কারো মুখে কথা নেই।

তারপর, মনে হলো অনেক দূর থেকে ভেসে এলো প্রথম শব্দটা। ক্রমশ বাড়ছে এবং এগিয়ে আসছে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে আয়শা দ্রুতহাতে খুলে ফেললো তার পোশাক। কোমরের দুমাথাওয়ালা সোনার সাপটা একটু উঁচু করে ধরে শরীরে একটা ঝাঁকি দিতেই ঢিলে পোশাকটা পিছলে নেমে গেল পায়ের কাছে। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে আয়শা, সম্পূর্ণ নগ্ন। তার শাদা শরীরের প্রতিটি অংশ দেখতে পাচ্ছি আমরা। একটা মাত্র শব্দে সে সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে পারি আমি—স্বর্গীয়।

বজ্রগর্জনের মতো হয়ে উঠেছে শব্দ। ঘুরতে ঘুরতে মাথা তুলছে বর্ণিল উজ্জ্বল আগুনটা। এগিয়ে এসে লিওর গলা জড়িয়ে ধরলো আয়শা।

'প্রিয়তম, প্রিয়তম!' বিড়বিড় করে বললো সে। 'কোনোদিন কি বুঝবে কতটা ভালোবাসি তোমাকে?' আলতো চুমু খেলো ওর কপালে। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে এগিয়ে গেল আগুনের ভেতর।

বাড়ছেই গুরুগম্ভীর শব্দটা। আগুনও ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছে। সকলকে শিখা ঘিরে ধরলো আয়শাকে। ওর শাদা শরীর আগুনের রঙধনু রঙে রঙিন হয়ে উঠলো। এই দেখতে পাচ্ছি ওর অসম্ভব সুন্দর মুখটা, পরমুহূর্তে হারিয়ে যাচ্ছে আগুনের আড়ালে। ঘুরেফিরে হাত-পা নেড়ে শরীরের সব জায়গায় আগুন স্পর্শ করানোর চেষ্টা করছে সে। কিন্তু আশ্চর্য! কোনো জ্বালা যন্ত্রণা বা কষ্টের ছাপ নেই ওর মুখে বা আচরণে। বরং পরম পরিতৃপ্তির একটা ভঙ্গি আয়শার চেহারায়।

তারপর হঠাৎ, আমি কিছু বুঝে ওঠার আগেই অবর্ণনীয় এক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম ওর মুখে। পরিতৃপ্তির ভাবটা মিলিয়ে গেছে, সেখানে ফুটে উঠেছে শুকনো কাঠোর একটা অভিব্যক্তি। ওর লাবণ্যও কি ম্লান হয়ে গেছে একটু? চোখের অপূর্ব উজ্জ্বলতা মিইয়ে এসেছে। ভুল দেখছি না তো? দু'হাতে চোখ ডললাম আমি। ইতিমধ্যে

BanglaBook.org

শব্দ কমে আসতে শুরু করেছে। আগুনের উজ্জ্বলতাও ক্রমে ম্লান হয়ে আসছে। কয়েক মুহূর্তের ভেতর মিলিয়ে গেল দুটোই।

লিওর সামনে এসে দাঁড়ালো আয়শা। আমার মনে হলো, ঝরনার সেই সাবলীল ছন্দ যেন নেই তার হাঁটায়! দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে গেল লিওকে, কিন্তু ওর হাতের সেই সৌন্দর্য কোথায়? সরু কাঠির মতো হয়ে গেছে। আর তার মুখ—ও, ঈশ্বর!—আমার চোখের সামনে বুড়োটে হয়ে যাচ্ছে আয়শার মুখ! লিও-র চোখে পড়েছে এই পরিবর্তন; ছিটকে দু'পা পেছনে সরে গেল ও।

'কি ব্যাপার, প্রিয়তম ক্যালেক্রেটিস?' বললো আয়শা, কিন্তু কোথায় সেই মধুর সঙ্গীতের মতো কণ্ঠস্বর? কেমন ফ্যাসফেসে কর্কশ শোনালো গলাটা।

'আরে, এ কি—একি?' বিভ্রান্ত ভঙ্গিতে বললো সে। 'এমন ঝিমুনি আসছে কেন? আগুনের গুণ নিশ্চয়ই বদলে যায়নি? ক্যালিক্রেটিস, ও ক্যালিক্রেটিস! আমার চোখে কি হয়েছে? সব কিছু ঝাপসা হয়ে আসছে কেন?' দু'হাতে মাথা আঁকড়ে ধরলো সে। কিন্তু ওহ্—ওহ্—। তার আজানুলম্বিত চুলগুলো খসে পড়েছে মাটিতে। সবগুলো! একটাও নেই মাথায়। কুৎসিত একটা টাক যেন ভেংচাচ্ছে আমাদের।

'ওহ্, দেখুন, স্যার!—দেখুন!—দেখুন!' তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করে উঠলো জব। আতঙ্কে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর চোখ দুটো, ঠোঁটের কোনায় ফেনা জমে গেছে। 'দেখুন!—দেখুন! ও কেমন কুঁচকে যাচ্ছে! বানর হয়ে যাচ্ছে!' আর একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারলো না জব, গোঁ গোঁ করতে করতে পড়ে গেল মাটিতে।

আমার অবস্থাও মোটেই ভালো নয়। চোখের সামনে সেই আয়শার একি চেহারা হলো? এখনো সঙ্কুচিত হচ্ছে ওর দেহ। সোনার সাপটা পিছলে নেমে গেছে সুগঠিত কোমর থেকে। শাদা ত্বকের রঙ বদলে ময়লা ময়লা হলদেটে বাদামী হয়ে গেছে। নিখুঁত হাত দুটোয় হাড় আর চামড়া ছাড়া কিছু নেই। আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না আয়শা। পড়ে গেল মেঝেতে। তারপর রক্তহিম করা তীক্ষ্ণ কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠলো একবার, 'ওহ্!'

ছোট্ট একটা বানরের চেয়ে ছোট হয়ে গেছে আয়শার আকৃতি। মুখটার দিকে তাকালে ভয় করে। শরীরের দিকে তাকালে ঘেন্না লাগে। এই কি সেই দোর্দণ্ড প্রতাপ, অনন্ত যৌবনা আয়শা?

কঙ্কালসার হাত দুটোয় ভর দিয়ে অনেক কষ্টে শেষ বারের মতো উঠে বসলো সে। কচ্ছপের মতো ধীরে ধীরে এপাশে ওপাশে মাথা দোলালো। কিছু দেখতে পাচ্ছে না আয়শা, সাদাটে চোখ দুটোর ওপর ঘষা কাচের মতো একটা পর্দা পড়ে গেছে।

BanglaBook.org

'ক্যালিক্রেটিস,' খসখসে কাঁপা কাঁপা গলায় বললো সে। 'আমাকে ভুলো না, ক্যালিক্রেটিস। আমার লজ্জায় দুঃখবোধ করো। আমি মরবো না, আমি আবার আসবো, অন্তত আর একবার আমি সুন্দর হবো, শপথ করে বলছি! ওহ-হ-হ—' মুখ থুবড়ে পড়ে গেল সে।

কুড়ি শতাব্দী আগে আয়শা যেখানে হত্যা করেছিলো আইসিসের পুরোহিত ক্যালিক্রেটিসকে, ঠিক সেখানেই মারা গেল সে।

তীব্র আতঙ্কের ধাক্কাটা সামলাতে পারলাম না আমরা। প্রথমে লিও পরে আমি পড়ে গেলাম মাটিতে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

এভাবে কতক্ষণ ছিলাম জানি না। যখন চোখ মেললাম, দেখলাম, জব আর লিও তখনও পড়ে আছে মাটিতে। সেই গোলাপী আলোয় তখনো ভরে আছে গুহা। কিছুদূরে বানরের মতো অবয়বটা পড়ে আছে। হায়, এককালে ওটাই ছিলো মহামহিমাময়ী অপরূপা আয়শা!

কেন এমন হলো? রহস্যময় প্রাণদায়ী আগুনের প্রকৃতি কি বদলে গেছে? মাঝে মাঝে ওটা প্রাণের বদলে মৃত্যুর নির্যাস বয়ে আনে? নাকি একবার যে ওতে স্নান করে দ্বিতীয়বার সে ওতে ঢোকার ক্ষমতা হারায়—অর্থাৎ প্রথমবারে যে প্রাণশক্তি পাওয়া যায় দ্বিতীয়বারে তা-ই আবার নষ্ট হয়ে যায়? হতে পারে। এটাই সম্ভব বলে মনে হলো আমার কাছে। সত্যি সত্যি যদি আয়শা ওতে স্নান করেই অন্তত যৌবন লাভ করে থাকে তাহলে এছাড়া আর কোনো কারণ থাকতে পারে না তার অমন পরিণতি হওয়ার।

জ্ঞান ফেরার পর কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে ভাবলাম এসব। তারপর উঠে বসলাম ধীরে ধীরে। স্বাভাবিক শারীরিক শক্তি ফিরে পেতে শুরু করেছি। উঠে প্রথমে যে কাজটা করলাম তা হলো, আয়শার শাদা পোশাকটা কুড়িয়ে নিয়ে ঢেকে দিলাম বানরের মতো দেহটা। পাছে লিও জেগে উঠে ওটা দেখে আবার জ্ঞান হারায় তাই খুব তাড়াতাড়ি করলাম কাজটা।

তারপর আয়শার সুগন্ধি চুলের গোছা ডিঙিয়ে জবের কাছে গেলাম। মুখ মাটিতে দিয়ে পড়ে আছে বেচারা। ঝুঁকে চিৎকার করতেই অদ্ভুত এক ভঙ্গিতে আছড়ে পড়লো ওর একটা হাত। শিরশির করে ঠাণ্ডা একটা স্রোত বয়ে গেল আমার শরীর বেয়ে। তীক্ষ্ণ চোখে তাকালাম ওর মুখের দিকে। এবং একবার দেখেই বুঝে নিলাম যা বোঝার। আমাদের পুরানো বিশ্বস্ত ভৃত্য জব মারা গেছে। আতঙ্কের প্রচণ্ডতা সামলাতে পারেনি বেচারার স্নায়ু। গভীর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার বুক চিরে। কিন্তু এ নিয়ে বেশিক্ষণ

BanglaBook.org

আক্ষেপ করার অবসর পেলাম না। জ্ঞান ফিরেছে লিওর। জবের মৃত্যুসংবাদ দিলাম ওকে। 'ওহ্!' এ ছাড়া আর কিছু বলতে পারলো না সে। আয়শার ভয়ানক পরিণতি দেখে স্নায়ুগুলো কেমন ভোঁতা হয়ে গেছে আমাদের।

উঠে গিয়ে লিওর পরিচর্যায় লাগলাম আমি। জবের মতো ও-ও আতঙ্কে মরে যায়নি দেখে কি স্বস্তি যে পেলাম তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। কিছুক্ষণের ভেতর উঠে বসলো ও। এবং তারপর আরেকটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার আমার নজরে পড়লো। এই ভয়ানক জায়গায় যখন ঢুকি তখনও লিওর কোঁকড়া চুলগুলো সোনালি ছিলো। এখন দেখছি ধীরে ধীরে ছাইরঙা হয়ে যাচ্ছে সেগুলো। আরো কিছুক্ষণ পর তুষারের মতো শাদা হয়ে গেল সব। দেখে মনে হচ্ছে বিশ বছর বেড়ে গেছে ওর বয়েস।

'এবার কি করবো আমরা?' ক্লান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো লিও।

'ভাগার চেষ্টা। অবশ্য তুমি যদি ওর ভেতর যেতে চাও তাহলে আলাদা কথা।' আগুনের স্তম্ভটার দিকে ইশারা করলাম আমি, ইতিমধ্যে আবার উদয় হয়েছে সেটা।

'যদি জানতাম ওর ভেতর ঢুকলে নিশ্চিত মরবো তাহলে সত্যি যেতাম,' একটু হেসে জবাব দিলো লিও। 'আমার দ্বিধাই কাল হয়েছে। আমি যদি ইতস্তত না করতাম তাহলে হয়তো প্রমাণ করার জন্যে ও ঢুকতো না ওতে, এই করুণ পরিণতি-ও হতো না। আমিই দায়ী ওর মৃত্যুর জন্যে। তবে হ্যাঁ, ওর শেষ কথা মনে আছে আমার, আবার ও আসবে। আমি ওকে খুঁজবো। আর বেশি দিন হয়তো বাঁচবো না—কিন্তু যে ক'দিনই বাঁচি, ওর খোঁজেই থাকবো।'

সম্ভবত কথাগুলোর সঠিক অর্থ অনুধাবনে ব্যর্থ হলো আমার মস্তিষ্ক। জবাবে শুধু বললাম, 'চলো, লিও, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যেতে হবে এই ভয়ঙ্কর জায়গা থেকে।'

সাতাস

কোনো ঝামেলা ছাড়াই গুহাগুলো পেরিয়ে এলাম আমি আর লিও। ওল্টানো চোঙের মতো ঢালটার কাছে পৌঁছে দেখা দিলো সমস্যা। একটা নয় দুটো। প্রথমত, কোন্ পথে যাবো; দ্বিতীয়ত, আলোর অভাব। প্রদীপ দুটো এমন টিম টিম করে জ্বলছে যে, সে আলোয় পথ ঠাওরানো দুষ্কর। তিন-চারবার বিভিন্ন দিকে মুখ করে উঠে গেলাম ঢাল বেয়ে, কিন্তু যে সরু সিঁড়ি বেয়ে নেমেছিলাম সেটার খোঁজ পেলাম না। দিশেহারা

BanglaBook.org

অবস্থা। ক্লান্ত হয়ে পড়ছি ক্রমশ। অবশেষে এক জায়গায় বসে তাবার চেষ্টা করলাম নামার সময় কি কি দেখেছিলাম, সেগুলোর চেহারা কেমন। অস্পষ্টভাবে মনে পড়লো কয়েকটা জিনিসের কথা। একটা হলো বিশাল একটা পাথর। কিছুদূর নামার পরই ওটার পাশ কাটিয়ে এসেছিলাম। সেই সাথে এ-ও মনে পড়লো, শেষবার যখন ওঠার চেষ্টা করেছিলাম তখন ওটার পাশ দিয়ে গেছি একবার, তবে সমকোণে। অর্থাৎ এখন যদি আবার ওটার কাছে পৌছতে পারি তাহলে পথ চিনে নিতে পারবো।

উঠলাম আবার। না, এবার আর ভুল হলো না, ঠিক পৌছে গেলাম পাথরটার কাছে। এবং কয়েক মিনিটের ভেতর সেই সরু সিঁড়িটার কাছে। একটু পরেই বৃদ্ধ দার্শনিক নুটের কুঠুরিতে উঠে এলাম আমরা।

কিন্তু এবার কি করবো? তক্তা নেই, খাদ পেরোবো কি করে?

দুটো মাত্র বিকল্প এখন আমাদের সামনেঃ হয় লাফিয়ে পেরুতে হবে ফাঁকা জায়গাটা, নয়তো, এখানেই না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে। পাথর আর সেতুর মাঝের দূরত্ব খুব বেশি না, এগারো কি বারো ফুট হবে। কলেজে থাকতে লিওকে দেখেছি, বিশ ফুট দূরত্ব অনায়াসে লাফিয়ে পার হতে। আমিও কম নই এ ব্যাপারে, বিশ ফুট না হলেও পনেরো ষোলো ফুট সহজেই লাফিয়ে পেরোতে পারি। কিন্তু এখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি সম্পূর্ণ আলাদা। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দু'জন মানুষ; যেখানে লাফাতে হবে সে জায়গাটাও ভয়ঙ্করঃ এক পাশে টলমলে একটা পাথর, অন্য পাশে সরু একটা প্রাকৃতিক সেতু, তার ওপর তীব্র বাতাস। একটু এদিক ওদিক হলেই পড়তে হবে অতল গহ্বরে। তবে এটাও ঠিক এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। অনাহারে মরতে না চাইলে ঝুঁকিটা নিতেই হবে।

লিওকে বললাম কথাটা। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হলো ও। ও-ও বুঝতে পেরেছে আর কোনো পথ নেই। কিন্তু জায়গা মতো যাচ্ছি কিনা অন্ধকারে বুঝবো কি করে? যাওয়ার সময় যেমন ছিলো, এখনো তেমনি অন্ধকার জায়গাটা। অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলাম আপাতত অপেক্ষা করবো। ফোকর গলে আবার যখন অস্তায়মান সূর্যের আলো এসে পড়বে তখন চেষ্টা করবো। ইতিমধ্যে একটু বিশ্রামও নেয়া হয়ে যাবে। এমন সময় খেয়াল করলাম নিবু নিবু অবস্থা একটা প্রদীপের, অন্যটা নিবে গেছে আগেই।

তড়াতাড়ি নুটের কুঠুরি থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পড়লাম বিশাল চৌকাকৃতি পাহাড়ের মাথায় পাথরের চাঁইটার ওপর। নুটের গুহার মেঝে থেকে পাথরটার উপরিভাগের উচ্চতা হবে, খুব বেশি হলে, আট কি ন' ফুট। লাফ দিয়ে দু'হাতে ওটার কিনারা ধরলাম প্রথমে, তারপর আরেক লাফে উঠে গেলাম ওপরে।

BanglaBook.org

আমরা উঠলাম প্রদীপটাও নিবে গেল।

বিশাল পাথরটার ওপর বসে আছি আমরা। সময় বয়ে যাচ্ছে। তীব্র বাতাস শোঁ শোঁ শব্দে বইছে। একটু পর পরই মনে হচ্ছে, এই বুঝি উড়িয়ে নিয়ে গেল। শুয়ে পড়লাম আমি। এবার বাতাসের ঝাপটা তত লাগছে না। একটু পরে লিও-ও আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করলো।

কত ঘন্টা যে এভাবে কেটে গেল জানি না। হঠাৎ, বিন্দুমাত্র পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই লাল আলোর ছুরি ফালা ফালা করে ফেললো অন্ধকার। তড়াক করে উঠে বসলাম আমরা।

এখনই!' বলে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালো লিও।

আমিও উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'কে আগে?'

'তুমি, বুড়ো। পাথরটা যাতে স্থির থাকে সেজন্যে ঐ দিকটায় বসে থাকবো আমি। যতটা সম্ভব দ্রুত দৌড়ে যাবে, আর একটু উঁচু করে লাফ দেয়ার চেষ্টা করবে। বাকিটা ঈশ্বরের হাতে।'

মেনে নিলাম আমি। তারপর এমন একটা কাণ্ড করলাম যা লিও যখন ছোট্ট বাচ্চা ছিলো তখনও করিনি। ঘুরে দাঁড়িয়ে ওকে জড়িয়ে ধরলাম, এবং আলতো করে চুমু খেলাম ওর কপালে। আমি নিশ্চিত ভাবেই ধরে নিয়েছি, ওর সাথে আর দেখা হবে না কোনো দিন।

'তাহলে যাই, লিও,' বললাম আমি। 'আশা করি আবার দেখা হবে আমাদের, সে যেখানেই হোক না কেন।'

পাথরের যেদিকে খাদ তার বিপরীত প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। তেত্রিশ কি চৌত্রিশ ফুট লম্বা পাথরটা। এই দূরত্ব দৌড়ে গিয়ে লাফ দিতে হবে। বাকিটা আমার কপাল। লম্বা করে শ্বাস নিয়ে শুরু করলাম দৌড়। প্রান্তে পৌঁছুলাম, তারপরই ঝাঁপ দিয়ে উঠে গেলাম শূন্যে। এবং সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম, ঠিক মতো হয়নি লাফটা। শূন্যে উড়ন্ত অবস্থায়ই আতঙ্কের একটা স্রোত বয়ে গেল আমার শরীর বেয়ে।

সেকেণ্ডেরও কম সময়ের মধ্যে নেমে এলো আমার শরীর। এবং ঠিকই সেতুর কিনারা স্পর্শ করতে পারলো না আমার পা। নেমে যাচ্ছি খাদের ভেতর। এমন সময় কিনারা ছুঁলো আমার হাত ও দেহের কিছুটা অংশ। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করলাম কিনারাটা। এক হাতে ঠিকই ধরতে পারলাম, অন্যটা গেল ফসকে।

এক হাতে সেতুর কিনারা ধরে ঝুলে আছি আমি। যেখান থেকে লাফিয়ে এসেছি সেদিকে মুখ। ভীষণ বেকায়দা অবস্থা। দু'এক সেকেণ্ডের বেশি থাকতে পারবো না

BanglaBook.org

এভাবে। প্রাণপণে চেষ্টা করলাম অন্য হাতটা দিয়েও কিছু একটা ধরার। ভাগ্য ভালো, সফল হলাম। মাথা বের করা একটা পাথরের টুকরো ধরে ফেলতে পারলাম। কিন্তু যেটাকে এক মুহূর্ত আগে মনে করেছিলাম সৌভাগ্য সেটাই দুর্ভাগ্য হয়ে দেখা দিলো এখন। সরু সেতুটার দু'পাশে দু'হাত দিয়ে ঝুলে আছি আমি। এখনো আমার মুখ সেই পাথরটার দিকে। হাজার চেষ্টা করলেও, ওপরে তো দূরের কথা, এক ইঞ্চিও উঠতে পারবো না। যতক্ষণ হাতে সইবে ঝুলে থাকবো, তারপর পড়ে যাবো।

সেই নিরুপায় মুহূর্তটার অপেক্ষায় আছি, এমন সময় একটা চিৎকার শুনলাম লিওর। পরমুহূর্তে পাথর আর সেতুর মাঝখানের ফাঁকে মাঝ আকাশে দেখলাম ওকে। দু'সেকেণ্ড পর বলিষ্ঠ দুটো হাত ধরলো আমার ডান হাত। এ যাত্রা বেঁচে গেলাম আমি। কয়েক সেকেণ্ড পর অদৃশ্য হয়ে গেল লালচে আলোটা।

প্রায় আধ ঘন্টা মরার মতো শুয়ে রইলাম আমরা সরু জায়গাটায়। কেউ কোনো কথা বললাম না। তারপর উঠে গুড়ি মেরে এগোলাম সুড়ঙ্গের দিকে। বেড়ালের মতো তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে আছি, তবু অত্যন্ত ঝাপসা একটা আভাস ছাড়া পথের কিছু দেখতে পাচ্ছি না। এভাবেই এগিয়ে চললাম, অবশেষে পৌঁছুলাম সুড়ঙ্গের মুখে।

কবরের মতো অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভেতর। আসার সময় আলো থাকা সত্ত্বেও কেমন হোঁচট খেতে হয়েছিলো মনে পড়লো। কিন্তু, কিছু করার নেই, এবারও চার হাত পায়ে ভর দিয়ে অন্ধের মতো এগোলাম। আমাদের একমাত্র অবলম্বন, সুড়ঙ্গের এক পাশের দেয়াল। কতবার যে পাথরের সাথে বাড়ি খেলাম, হুমড়ি খেয়ে পড়লাম গর্তের ভেতর, কোনো হিসেব নেই তার। রক্তাক্ত হয়ে গেল শরীরের বিভিন্ন অংশ। এদিকে প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে দেহের সমস্ত শক্তি। কয়েক পা এগোনোর পরই পাঁচ-দশ মিনিট বিশ্রাম না নিলে চলছে না। আগেরবার বিশ মিনিটে সুড়ঙ্গের এ মাথা থেকে ও মাথায় গিয়েছিলাম, এবার লাগলো কয়েক ঘন্টা। যাহোক শেষ পর্যন্ত ওটা পেরোতে পারলাম আমরা। বাইরে তখন ভোর হচ্ছে।

একই রকম হামাগুড়ি দিয়ে সরু কার্নিসের মতো জায়গাটাও পেরিয়ে এলাম। এবার নামতে হবে। কিন্তু বেঁকে বসতে চাইছে আমাদের শরীর। আর এক ইঞ্চি এগোনোর শক্তিও অবশিষ্ট নেই। লিওর অবস্থা আরো খারাপ, মাথা-ই তুলতে পারছে না বেচারা।

'আরেকটু চেষ্টা করো, লিও,' হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোরকমে বললাম আমি, যতটা না লিওর উদ্দেশ্যে তার চেয়ে বেশি নিজের উদ্দেশ্যেই। 'কোনোমতে ঢালের কাছে পৌঁছুতে পারলেই হয়, বিলালি আছে ওখানে। এসো, হাল ছেড়ে দিও না।'

BanglaBook.org

আমার কথায় একটু যেন আশার আলো দেখলো লিও। উঠে একজন আরেক জনের গায়ে হেলান দিয়ে টলতে টলতে নেমে যেতে লাগলাম। কেমন যেন ঘোর লাগা অবস্থা। কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পারছি না।

কেমন করে নামলাম, গড়িয়ে পড়ে গেলাম না কেন, কিছুই জানি না। হঠাৎ সফেদ বৃদ্ধ বিলালিকে দৌড়ে আসতে দেখে সংবিৎ ফিরলো আমার।

'ওহ্, বেবুন! আমার বেবুন!' চিৎকার করলো সে। 'তুমি আর সিংহ-ই তাহলে? কিন্তু ওর পাকা ধানের মতো চুলগুলো অমন তুষারের মতো শাদা হয়ে গেছে কেন? কোত্থেকে এলে তোমরা? শূকরছানা কোথায়? "সে"-ই বা কোথায়?'

'মরে গেছে, দুজনই মরে গেছে!' হাঁপাতে হাঁপাতে কোনোরকমে জবাব দিলাম আমি। 'কিন্তু ওসব কথা থাক এখন, খাবার-পানি কিছু থাকলে দিন দয়া করে।'

'মরে গেছে!' ঢোক গিলে বললো বৃদ্ধ। 'অসম্ভব! অমর "সে"—মরে গেছে, কি করে তা সম্ভব?'

ইতিমধ্যে আয়শার বাহকরা এগিয়ে এসেছে। সন্তবন্ত ওদের দেখেই সামলে নিলো বিলালি। ইশারায় জানালো, আমাদের বয়ে নিয়ে যেতে হবে ঝোপের আড়ালে। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ পালন করলো তারা।

ঝোপের আড়ালে তখন আগুনের ওপর ঝোল তরকারি রান্না হচ্ছে। বিলালি খাইয়ে দিলো, নিজের হাতে খাওয়ার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই আমাদের গায়ে। কোনোমতে খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়লাম আমরা। তারপর আর কিছু মনে নেই।

আটাশ

পুরো এক দিন, এক রাত ঘুমালাম আমি। জেগে উঠে দেখলাম বিলালি ঝুঁকে আছে আমার মুখের ওপর। লিও এখনো ঘুমোচ্ছে।

অমর 'সে-যাকে-মানতেই-হবে' কি করে মারা গেল, জানতে চাইলো বিলালি। সঙ্গে সঙ্গে এ-ও জানালো, সত্যিই যদি 'সে' মরে গিয়ে থাকে, সমূহ বিপদ আমাদের সামনে। আমাহ্যাগাররা চরম ভাবে খেপে আছে, 'সে' নেই জানতে পারলেই আমাদের—বিশেষ করে লিওকে 'গরম পানি' করে খাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠবে ওরা। ওদের বিশ্বাস, আমাদের কারণেই শাস্তি পেয়েছে ওদের জাতভাইরা।

'যা হোক, ঘটনাটা আগে বলো, শুনি,' বললো সে। 'তারপর দেখবো কি করা

BanglaBook.org

যায়।'

বললাম আমি। অবশ্যই পুরোপুরি নয়, যতটুকু বললে বৃদ্ধের বিশ্বাস হবে সত্যিই আয়শা আগুনে পুড়ে মারা গেছে, এবং তাতে আমাদের কোনো দায় নেই ততটুকু বললাম। কি কষ্ট করে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছি তা-ও বললাম। কিন্তু মুখ দেখেই বুঝলাম, আয়শা মরে গেছে এ কথা বিশ্বাস করেনি সে। তার ব্যাখ্যা হলো, কিছুক্ষণ বা কিছুদিনের জন্যে অদৃশ্য হয়েছে 'সে'। সময় হলেই আবার ফিরে আসবে।

'এবার কি করবে তোমরা, বেবুন?' জানতে চাইলো বিলালি।

'জানি না, পিতা,' আমি বললাম। 'এদেশ থেকে পালাতে পারি না আমরা?'

মাথা নাড়লো বৃদ্ধ। 'কাজটা খুবই কঠিন, পুত্র। কোর-এর ওপর দিয়ে যেতে পারবে না। তোমাদেরকে একা দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়বে পশুগুলো।' তারপর একটু চুপ করে থেকে বললো, 'তবে হ্যাঁ, ঐ পাহাড়ের ওপর দিয়ে একটা পথ আছে। তোমাকে বোধহয় একবার বলেছিলাম পথটার কথা? ও পথে ওরা পশুর পাল নিয়ে যায় চারণভূমিতে। চারণভূমি পেরিয়ে জলার ওপর দিয়ে তিনদিনের পথ। তারপর আর কিছু জানি না আমি। শুনেছি, ওখান থেকে সাত দিনের পথ পেরোলে বিরাট এক নদী পড়ে। ঐ নদী চলে গেছে কালো পানি পর্যন্ত।'

'পিতা,' বললাম আমি। 'আমি একবার প্রাণ বাঁচিয়েছি আপনার, এবার প্রতিদান দিন। এ পথেই নিয়ে চলুন আমাদের। জলাভূমিটা পার করে দিন, বাকিটা আমরাই চলে যেতে পারবো।'

'পুত্র, আমাকে অকৃতজ্ঞ ভেবো না। আমার প্রাণের প্রতিদান আমি দেবো। কাল ভোর নাগাদ তৈরি হয়ে থাকবে। আমি এখন যাচ্ছি, কয়েকটা পালকি জোগাড় করে আনতে পারি কিনা দেখি। আশা করি পারবো, ওদের বলবো, "সে-যাকে-মানতেই-হবে"র নির্দেশ এটা, যে এ নির্দেশ মানবে না সে হায়েনার খাদ্য হবে। এ কথা শুনলে ওরা রাজি না হয়ে পারবে না। জলা পেরোনোর পর দরকার হলে ওদের নিহত করে পালাতে হবে তোমাদের। এখন দেখ, সিংহ বোধহয় জাগলো। তোমরা খাওয়া-দাওয়া করে নাও। আমি যাই।'

চলে গেল বিলালি। দীর্ঘ ঘুম দিয়ে মোটামুটি তাজা হয়ে উঠেছে লিও। দু'জন গোগ্রাসে খেয়ে নিলাম পাঁচ জনের খাবার। তারপর কাছের এক ঝরনায় গিয়ে গোসল করে এলাম। তারপর আবার ঘুম।

একটানা সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুমোলাম। তারপর আবার খেয়ে নিয়ে আবার ঘুম।

ভোর রাত নাগাদ পালকি বেহারা এবং দু'জন পথ প্রদর্শক নিয়ে হাজির হলো

BanglaBook.org

বিলালি।

'"সে'র ভয় দেখানোতে কাজ হয়েছে,' বললো বৃদ্ধ। 'তোমরা তৈরি হয়ে নাও। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়তে হবে। আমিও যাবো তোমাদের সাথে।'

বৃদ্ধের শেষ কথাটায় অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করলাম। যত-ই 'সে'র ভয় দেখানো হোক না কেন, মানুষখেকোগুলোকে বিশ্বাস নেই। বিলালির জন্যে গভীর এক শ্রদ্ধাবোধে পূর্ণ হয়ে গেল অন্তর।

ভোরের প্রথম আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে পাল্‌কিতে চাপলাম আমরা। সমভূমির ওপর দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর শুরু হলো পাহাড়ের উঁচু নিচু ঢাল বেয়ে ওঠা। ঝাঁকুনির চোটে অস্থির হয়ে উঠলাম।

দুপুর নাগাদ পাহাড়টার সমতল চূড়ায় পৌঁছুলাম। এখানে কিছু খেয়ে একটু বিশ্রাম নিয়ে নিলো বাহকরা। আমরাও খাওয়া সেরে নিলাম। তারপর আবার পথ চলা। আগ্নেয়গিরির মতো দেখতে পাহাড়টার ঢাল বেয়ে ক্রমশ নেমে যাচ্ছি জলাভূমির দিকে।

সন্ধ্যার একটু আগে জলাভূমির কিনারে পৌঁছুলাম। রাতটা এখানেই কাটানোর সিদ্ধান্ত নিলো বিলালি। পরদিন সকাল এগারোটা নাগাদ আবার শুরু হলো আমাদের যাত্রা, সেই ভয়ানক জলাভূমির ওপর দিয়ে।

পুরো তিন দিন কাদা আর দুর্গন্ধের ভেতর দিয়ে পাল্‌কি বয়ে নিয়ে গেল বাহকরা। চতুর্থ দিন সকালে আমাদের বিদায় জানালো বিলালি।

'বিদায়, পুত্র বেবুন,' বললো সে। 'বিদায় তোমাকেও, সিংহ। তোমাদের আর কোনো সাহায্য আমি করতে পারবো না। তবে একটা পরামর্শ দি-ই, যদি ভালোয় ভালোয় দেশে ফিরে যেতে পারো, আর কখনো এমন অজানা অচেনা লোকের পথে পা বাড়িও না। পরের বার হয়তো আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না,' একটু থামলো বৃদ্ধ। 'তোমার কথা আমার মাঝে মাঝেই মনে পড়বে, বেবুন, তুমিও সম্ভবত ভুলবে না আমাকে, কারণ আমি বুঝেছি, তুমি কুৎসিত হলেও, মনটা তোমার খাঁটি।'

আর কিছু বললো না বুড়ো। ঘুরে দাঁড়িয়ে চলতে শুরু করলো। অনুসরণ করলো দীর্ঘ বলিষ্ঠ আমাহ্যাগারগুলো। আমরা দেখতে পেলাম, আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে শূন্য পাল্‌কির মিছিলটা। একটু পরেই হারিয়ে গেল একটা বাঁকের আড়ালে।

মাত্র তিন সপ্তাহ আগে কোর-এর জলাভূমিতে ঢুকেছিলাম আমরা। তখন চারজন ছিলাম। তিন সপ্তাহ পর আজ যখন বেরিয়ে এলাম, দুই-এ নেমে এসেছে আমাদের সংখ্যা। মাত্র তিন সপ্তাহে কত কিছু ঘটেছে একবার কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। থই পেলাম না কোনো। মনে হলো, শেষ যখন আমাদের তিমি নৌকাটা দেখেছিলাম, ত্রিশ

বছর পেরিয়ে গেছে তারপর।

'এবার নদীটা খুঁজে বের করতে হবে,' বললাম আমি।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়ালো লিও। গায়ের পোশাক ছাড়া আমাদের সঙ্গে এখন একটা ছোট কম্পাস, দুটো রিভলভার, দুটো এক্সপ্রেস রাইফেল আর শ'দুয়েক গুলি ছাড়া আর কিছু নেই। এখানেই শেষ আমাদের কাহিনী।

এরপর কি করে আমরা ইংল্যাণ্ডে পৌছুলাম সে আর এক ইতিহাস। অমানুষিক পরিশ্রম করে নদীটার কাছে পৌছতে পেরেছিলাম। এ জন্যে বিলালি যেখানে ছেড়ে যায় সেখান থেকে প্রায় একশো সত্তর মাইল দক্ষিণে আসতে হয়েছিল আমাদের। ওখানে জংলী এক উপজাতির হাতে বন্দী হই। লিওর অসম্ভব সুন্দর চেহারা আর তুষারশুভ্র চুল দেখে ওকে অতিপ্রাকৃত কোনো জীব মনে করেছিল ওরা। ছ'মাস পর ওদের হাত থেকে পালাতে পারি আমরা। তারপর সাঁতরে নদী পার হয়ে আরো দক্ষিণে এগোতে থাকি। এক পর্যায়ে অনাহারে মৃত্যু যখন নিশ্চিত তখন এক পর্তুগীজ হাতি শিকারি দেখতে পায় আমাদের। তার সাহায্যে অনেক কষ্ট ও পরিশ্রম করে ডেলাগোয়া উপসাগরে পৌছাই। সেখান থেকে অন্তরীপ ঘুরে চলাচল করে যে স্টীমবোটগুলো তার একটাতে করে ইংল্যাণ্ড। যেদিন রওনা হয়েছিলাম তার ঠিক দু'বছর পর আমরা পা রাখলাম সাউদাম্পটন বন্দরের জেটিতে।

দু'হাজার বছরেরও আগে যে কাহিনীর শুরু তা শেষ হলো এভাবে। কিন্তু সত্যিই কি শেষ হয়েছে? কেন জানি না, আমার কেবলই মনে হয়, না, শেষ হয়নি। দূর ভবিষ্যতের গর্ভে হয়তো এর শেষ লুকিয়ে আছে।

সেই প্রাচীন ক্যালিক্রেটিস কি সত্যিই লিও হয়ে পুনর্জন্ম নিয়েছে পৃথিবীতে? নাকি দু'জনের চেহারার অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখে ভুল করেছিল আয়শা? আরেকটা প্রশ্নঃ পুনর্জন্মের এই নাটকে উস্তেনের ভূমিকা কি? প্রাচীন মিসরীয় রাজকুমারী আমেনার্তাসের সঙ্গে কি কোনো সাদৃশ্য আছে ওর? এসব প্রশ্নের কোনো উত্তর জানা নেই আমার। শুধু এটুকু আমার মনে হয়, লিওর ব্যাপারে কোনো ভুল করেনি ও।

আজকাল প্রায় রাতেই আমি একা বসে বসে ভাবি, এই নাটকের শেষ দৃশ্যের অভিনয় হবে কবে? এবং মিসরীয় রাজকন্যা সুন্দরী আমেনার্তাস কি ভূমিকা নেবে তাতে?

BanglaBook.org